১ম ভাগ　　　　১ম খণ্ড

বেদব্যাস

—০:০—

মাসিক পত্র

বৈশাখ ১২৯৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
উদ্দেশ্য		১
শ্রাদ্ধতত্ত্ব	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি	১
বেদার্থবোধ অতি কঠিন	শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী	৫
আবাহন	প্রকাশক	৯
অনুষ্ঠান	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে	১৪
দেবযান	শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু	৪৭

—০:০—

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

কলিকাতা।

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টিম মেসিন প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও ৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
প্রকাশিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
৪২১
৭৭২

বেদব্যাস।

১ ম খণ্ড, বৈশাখ, ১২৯৩।

উদ্দেশ্য।

হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মহিমাকীর্ত্তনই বেদব্যাসের উদ্দেশ্য। আজ অনেকেই ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য বুঝিবার জন্য উৎসুক। কিন্তু দুঃখ এই, ধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না। অনেকে ভ্রমব্যাখ্যা পড়িয়া বিপথে যাইতেছেন। এ দৃশ্য বড়ই শোচনীয়। মহামহিমাময় পণ্ডিতগণের সাহায্যে শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা বেদব্যাসে যথানিয়মে প্রকাশিত হইবে। দ্বিতীয়ত, স্থূল-চক্ষে স্মৃতিপূরাণ প্রভৃতির বিরোধ যেখানে উপলব্ধি হইবে, সেখানে তাহার বিশদ মীমাংসা থাকিবে। তৃতীয়ত, হিন্দুর চক্ষে রাজনীতির ফলাফল বিচার হইবে। এই কয়টী গভীর গুরুতর বিষয় লইয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। পত্রিকার আকার আপাতত ক্ষুদ্র হইলেও প্রায় প্রতি মাসে ইহাতে অতিরিক্তপত্র থাকিবে।

শ্রাদ্ধতত্ত্ব।*

শ্রাদ্ধবিষয়ক প্রশ্নের সিদ্ধান্তটি অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন। যে বিজ্ঞান দ্বারা দেহস্থ ভৌতিক পদার্থ, ইন্দ্রির, মন ও আত্মা এবং ইহাদের কার্য্যপ্রণালী, পরলোকের অবস্থা ও পুনর্জ্জন্ম, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বাদি অবগত হওয়া যায় তাহাকেই অধ্যাত্মবিজ্ঞান বলে। ইহা শাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত শ্রৌত প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত। শ্রাদ্ধতত্ত্বে সমস্ত অঙ্গই এই অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের উপর সম্যক্ নির্ভর করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। অধ্যাত্মবিজ্ঞান আবার কয়েকটা বিজ্ঞানের এমত অনুগত যে সেই কএকটী বিজ্ঞানের স্থূলতত্ত্ববিষয়েও যিনি অনভিজ্ঞ তিনি অধ্যাত্মবিজ্ঞানে বিশেষ পরিশ্রম করিলেও প্রায় অন্ধ থাকিবেন।

---

* চূড়ামণি মহাশয় স্থানান্তরে থাকায় তাঁহার প্রবন্ধ যথাসময়ে আসিতে বিলম্ব হয়। সেই জন্য তাঁহার বহু পূর্ব্বের লিখিত এই প্রবন্ধটী দেওয়া হয়। এবং অনেক স্থল অস্পষ্ট থাকায় ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধটি একবারেই অগ্রাহ্য হওয়ায় চূড়ামণি মহাশয় আর সংশোধন করিলেন না। সুতরাং দ্বিতীয় সংস্করণেও সেইরূপই প্রকাশিত হইল। বে, সং

সেই বিজ্ঞান কয়েকটা এই—ভৌতিক-বিজ্ঞান, তড়িদ্বিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, ভূত-বিজ্ঞান, শক্তি-বিজ্ঞান, শরীরস্থান বিজ্ঞান, বাগ্বিজ্ঞান। এই কয়েকটী বিজ্ঞানেরই বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধী অধ্যাত্মবিজ্ঞান। তন্মধ্যে আবার ক্রমশঃ পরে উল্লিখিত কয়েকটী ক্রমশঃ পূর্ব্বে উল্লিখিত কয়েকটীর অনুগত অর্থাৎ পূর্ব্বে উল্লিখিত বিজ্ঞানটি জ্ঞাত না থাকিলে পর পর বিজ্ঞানটি বুঝা যায় না। কিন্তু ক্রমশঃ পূর্ব্বোল্লিখিত বিজ্ঞান কয়েকটি জল, বায়ু প্রভৃতি স্থূল বিমিশ্রিত ভৌতিক পদার্থের তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত থাকিলে জলজনক, অম্লজনক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ভূতপদার্থ সকল উত্তমরূপে বিদিত হইতে পারে না। আবার অম্লজনকাদির তত্ত্ব অনবগত থাকিলে মূল-ভূত, গন্ধ, রসাদি, পঞ্চপ্রকার ক্রিয়া পদার্থের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত অল্প সম্ভব। এই প্রকারে পরে উল্লিখিত বিজ্ঞান কয়েকটি পূর্ব্বে লিখিত বিজ্ঞান কয়েকটির সহিত সম্বন্ধ। এজন্ত অধ্যাত্ম বিজ্ঞান দ্বারা নির্ণীত ঈশ্বরতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও পুনর্জ্জন্মাদি বিষয়ের ন্যায় শ্রাদ্ধ তর্পণ বিষয়টিও সাক্ষাৎ ও পরম্পরা ভাবে কতকগুলি বিজ্ঞানের সহিত সংসৃষ্ট।

২য়তঃ। যে যে বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ কেবল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নিবদ্ধ এবং স্বভাবজাত জ্ঞানের অগোচর, তাহা স্বাভাবিক জ্ঞানমাত্রের অনুগামী লোকেরা হৃদয়ে ধারণ করিতে অতি অল্পই সমর্থ হইতে পারেন, সুতরাং তাঁহারা উহা বিশ্বাস করিতে ও আপন আত্মাকে হাস্যাস্পদমনে করিতে পারেন।

মনে করুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিদ্বারা জানা যাইতেছে যে বায়ু স্বভাবতঃ স্থির পদার্থ, কারণ বিশেষদ্বারা উহার চাঞ্চল্য ও গতি হইয়া থাকে। আবার জানা যাইতেছে এই বায়ু প্রত্যেক প্রৌঢ় মানবদেহে ৩৭৫ মণ ভার অর্পণ করিতেছে। কিন্তু যাহারা ভৌতিক বিজ্ঞান অনভিজ্ঞ অথচ নিজের বিশ্বাসকে বলবান প্রমাণ বলিয়া জানে, তাহারা কি যে বায়ুকে জন্মাবধি চঞ্চল দেখিতেছি এবং যে বায়ুর এক রতি পরিমাণ ভারও অনুভব করে না, সেই বায়ুর স্বাভাবিক স্থিরতা ও গুরুত্ব আছে বলিয়া কখন বিশ্বাস করিতে উৎসাহী হয়? বোধ হয় কখনই না। এই প্রকারে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানানভিজ্ঞ অথচ স্বভাবজাত জ্ঞানের অনুগত লোকেরা সমরাত্রিদিব পরিবর্ত্তনের কারণ পৃথিবীর যে ক্রান্তিপাতের কিঞ্চিৎ সরিয়া যাওয়া ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয় সকল কদাচিৎ বুঝিতে পারেন। আবার যাঁহারা শক্তিতত্ত্ব জানেন না এবং আপন

সহজ জ্ঞানকে প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করেন তাঁহারা দৃশ্যতঃ ভ্রমণ দেখিয়া প্রত্যেক স্থূল বস্তুকেই আধারের উপর অবস্থিত দর্শনে পৃথিবীর ভ্রমণ ও শূন্যলোকে অবস্থিতি প্রভৃতি বিষয় বোধ হয় হাস্যজনক মনে করিয়া থাকেন। এই কারণেই তড়িৎদ্বারা বার্ত্তা প্রয়োগাদি দৈবী শক্তির কার্য্য বলিয়া তাদৃশ লোকের বিশ্বাস হইবে আশ্চর্য্য কি?

অতএব যাঁহারা উল্লিখিত কএকটি বিজ্ঞানের সহিত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে মনোনিবেশ করেন নাই, বিশেষত কএকটি নিয়ত বিষয় ভিন্ন সমস্ত বিষয়ই নিজের জ্ঞান মাত্রের অনুগত, অর্থাৎ যাহা আপন সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারেন না তাহাই অগ্রাহ্য করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রাদ্ধ তর্পণ বিষয়ও নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য অগত্যা অবিশ্বাস্য হইবার সম্ভব। ফলতঃ যাঁহারা ঐ সকল বিজ্ঞানের স্থূলাংশ অবগত হইয়াও অধ্যাত্মবিজ্ঞানে সুনিপুণ এবং নিয়ত দুই একটী বিষয় ভিন্ন সহজপ্রত্যয়ের কিঞ্চিন্মাত্র আদর করেন না, তাঁহারা অতি বিশদভাবে শ্রাদ্ধ তর্পণ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার আবিষ্কারক আর্য্য পিতৃপুরুষগণের প্রতি একান্ত ভক্তিযুক্ত হইবেন এবং ঋষিদের আদেশানুসারে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিয়া কৃতকার্য্য হয়েন।

এইক্ষণ প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করা যাউক—

শ্রাদ্ধ ও তর্পণ দ্বারা পিতৃপুরুষ সম্বন্ধে ২টি ও শ্রাদ্ধকর্ত্তার নিজের ২টি কার্য্য সাধিত হয়। আতিবাহিক শরীরে পুষ্টি দ্বারা তৃপ্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি। এই দুইটি পিতৃপুরুষের উপকার। আর শ্রাদ্ধ কর্ত্তার উপকার, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পিতৃপুরুষের তুষ্টি দ্বারা অন্যান্য কল্যাণ। কিন্তু ইহার আনুষঙ্গিক আর আর ফলও আছে।

এইক্ষণ যে প্রকারে এই কার্য্য সাধিত হয় তাহার চিন্তা করা যাইতেছে।

১। আধ্যাত্ম বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, বর্ত্তমান দেহ পরিত্যাগের পর অবিমুক্ত শ্রেণীর আত্মাদিগের অধিকারিতা অনুসারে তিন প্রকার স্থানে গতি হইয়া থাকে। কোন শ্রেণীর আত্মাগণ সূর্য্য বা তৎসদৃশ কোন ভুবনে গমন করেন, কোন শ্রেণীর আত্মাগণ চন্দ্র বা তৎসদৃশ কোন লোকে যান, আর কোন শ্রেণীর আত্মাগণ এই পৃথিবীতেই অবস্থিতি করে। এতদ্বিষয়ে শ্রুতি "তন্ময় চেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো যজমান মিত্যাদি" "তেচন্দ্রসমমতিসম্পদ্যন্তে ইত্যাদি" "অর্থেতয়োঃ পথোর্ণকতয়ো চ ন তানীমান ক্ষুদ্রণ্য সকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যেরং তৃতীয়ং স্থান মিত্যাদি।"

২। আত্মা এ শরীর পরিত্যাগান্তর কেবল সুসংস্কার ও কুসংস্কার স্বরূপ নিজের ধর্ম্মাধর্ম্ম আর আতিবাহিক শরীরটি মাত্র লইয়া অবস্থিতি করে। এতদ্বিষয়ে দর্শন "সংসরতি নিরূপ ভোগং ভাবৈরাধি বাসিতং লিঙ্গং" (সাঙ্খ্য) "তদনন্তর প্রতিপাত্তৌরংহতি সম্পরিষক্তঃ ইত্যাদি" (বেদান্ত দর্শন) ইত্যাদি। "অন্যত্র নিযুক্ত দোহাদ্ধ বর্ণকৃত ত্বিষঃ" (বরাহ পুরাণ) "পিতৃরমাষ্টে দিবিবেচ-মূর্ত্তাঃ" (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) ইত্যাদি। আত্মার এই সু ও কু সংস্কারের আশ্রয়টি ক্রিয়া বা শক্তি পদার্থ স্বরূপ মাত্র। এই সংস্কারাশয়ের সহায় বা আশ্রয়ভূত আতিবাহিক শরীরটি সূক্ষ্ম ভৌতিক পদার্থ দ্বারা বিরচিত। ইহাও উক্ত সূত্রাদিরই তাৎপর্য্য।

৩য়। এই আতিবাহিক শরীরের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম তড়িত শক্তির সম্বন্ধ আছে। তথাচ "জীবন্তে জমা ইদ্ধঃ ইত্যাদি" (শ্রুতি) "অতএব চেষ্টা" ইত্যাদি (দর্শন)।

৪র্থ। এই সূক্ষ্ম আতিবাহিক শরীর, দর্পণে—প্রতিবিম্বিত স্থূলশরীরের আকৃতির ন্যায় সর্ব্বতোভাবে এই স্থূল শরীরের অনুরূপ থাকে। অর্থাৎ স্থূলশরীরে যে প্রকার দীর্ঘ, প্রস্থ, শুক্ল, কৃষ্ণাদি রূপ, দ্বিভুজ, দ্বিনেত্র ও দ্বিকর্ণ, দ্বিপদ ইত্যাদি সমস্ত অবয়ব, আতিবাহিক শরীরেও ঠিক এইরূপ আকৃতি। কিন্তু অস্থি, শিরা, নাড়ী প্রভৃতি কিছুই নাই, রক্তও নাই। আর স্থূলশরীরে যে প্রকার পরস্পর বিভিন্ন অনন্ত প্রকার আকৃতি আতিবাহিক শরীরেও তদ্রূপ।

৫ম। আতিবাহিক শরীর স্ফুরণ ও অস্ফুরণ ধর্ম্মা অর্থাৎ সময় বিশেষে আতিবাহিক শরীরের স্ফুরণ হয় আবার সময় বিশেষে উহার অস্ফুরণ হয়। যখন স্ফুরণ হয় তখন কথঞ্চিৎ চক্ষুর অবস্থা বিষয় দ্বারা লক্ষিত হইতে পারে আর যখন অস্ফুরণ হয় তখন কোন অবস্থায় ও দেখিবার যোগ্য থাকে না। ইহাতে আকুঞ্চন ও প্রসারণ ধর্ম্ম ও বিদ্যমান আছে, ইহা ইচ্ছা হইলে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে পারে।

৬ষ্ঠ। স্থূল ও আতিবাহিক শরীরের স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব মাত্রই ভেদ। স্থূলশরীর যেরূপ ভিত্তি প্রভৃতি স্থূল পদার্থান্তর দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া গমনাদিতে অক্ষম হয় আতিবাহিক শরীর সেরূপ নহে, কোন প্রকার স্থূল পদার্থই আতিবাহিক শরীরের গমনাগমনের বাধা জন্মাইতে পারে না। উহা জল, মৃত্তিকা, কাচ প্রভৃতি সকল প্রকার স্থূল পদার্থ ভেদ করিয়া অনায়াসে

গমনাগমন করিতে পারে। এ বিষয়ের দর্শন "পূর্ব্বোৎপন্ন মসক্তং নিয়তং মহাদাদি সূক্ষ্ম পর্যন্তং" ইত্যাদি। (সাঙ্খ্য)

এ স্থলে এরূপ আপত্তি হইতে পারিবে যখন আতিবাহিক শরীরের আয়তন স্থূল শরীরের ন্যায় বৃহৎ তখন উহা কদাচ প্রস্তরাদির বাধাকে অতিক্রম করিয়া গমনাগমন করিতে পারে এ প্রকার সূক্ষ্মবস্থা কিরূপে সম্ভব? ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা ২। ৩ টা দৃষ্টান্ত মাত্র উত্থাপন করিয়াই নিবৃত্ত হইব। বৃহদাকার দর্পনে যে মনুষ্য শরীরের সমস্ত আকৃতি নিপতীত হয় তাহা যে অভাব পদার্থ নহে—ভাবপদার্থ তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন, ঐ প্রকৃতি যেরূপ কাচ ভেদ করিয়া দর্পণান্তরে বিসর্পিত হইয়া থাকে, অথবা জলাদি স্থিত—অণুবীক্ষণ দ্বারা দর্শনীয় যে অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য কীটানু আছে তাহারা যেরূপ বহুলক্ষ সঙ্খ্যক একত্রিত হইয়া পুঞ্জায়মান হইলেও জলাদির সূক্ষ্ম অবয়বের প্রত্যেক সন্ধি দিয়া প্রত্যেকটা গমনাগমন করিলে পুঞ্জায়মান সকলটিরই অপ্রতিবন্ধকে গমন সম্ভবে। অথবা মনে করিয়া দেখুন যদি আমাদের এতত স্থূল শরীরের প্রত্যেক অবয়ব যদি জলাদির ছিদ্র অপেক্ষায় সূক্ষ্ম হইত, আর যদি আমাদিগের শরীরের অবয়ব সকলের মধ্যে পরস্পর শিরাদির দ্বারা দৃঢ়তর রূপে একতাবন্ধন না থাকিত তবে আমরা এ স্থূল শরীর লইয়াও জল আদির অতিক্রম করিয়া অনায়াসেই উভয় দিকে গমনাগমন করিতে পারিতাম। সেই প্রকার আমাদিগের আতিবাহিক দেহও নির্ব্বিরোধে সকল স্থান দিয়া গমনাগমন করিতে পারে। ইহাতে কোন প্রতিবন্ধক হয় না। আতিবাহিক দেহের অবয়ব প্রত্যবয়ব সকল স্থূল দেহের ন্যায় সুদৃঢ়বন্ধনযুক্ত নহে, অথচ উহাদের পরস্পর আকর্ষণ দ্বারা একতা-পত্তি আছে। যে প্রকার পারদ বা রস প্রভৃতি।

আতিবাহিক দেহে যে হস্ত, পদ, নাসিকা ও কর্ণাদি আছে তাহা ঐ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গেয় ভাব মাত্র বলিলেই উপযুক্ত হয়। অর্থাৎ জিঘৃক্ষাশক্তি বিশিষ্ট হস্তের ভাব, জিগমিষা শক্তি বিশিষ্ট পায়ের ভাব ইত্যাদি।

বেদার্থবোধ অতি কঠিন।

এই পৃথিবীতে দেব ও অসুর উভয় দল চিরদিনই আছে, এই দলদ্বয়ের উন্নতি ও অবনতীও প্রকৃতি-নিয়মাধীন পর্য্যায়ক্রমে চিরঅবশ্যম্ভাবী

এক্ষণে দেবদল দুর্দ্দশাপন্ন, প্রায় সকলেই পলায়ন পরায়ণ যাঁহারা এখনও আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা গুপ্তচর ভাবে "সসেমিরে" করিয়া সভয়ে কালকর্ত্তন করিতেছেন, কেহ কেহ বা নিজের প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়াও চীৎকার ফুৎকার দ্বারা বিপথ প্রজাগণকে স্বদলে আনিতে প্রয়াস পাইতেছেন; কিন্তু সকলই সময় সাপেক্ষ; সময় ফলে মনের ভাব মনেই থাকে, মুখে তাহার বিপরীতই প্রকাশ পায় সুতরাং হিতৈষণাও অহিতৈষণারূপেই প্রতিভাত হয়। পাত্রগুণেও অনেকস্থলে বিপরীতার্থ প্রসব করে। অতএব এসময়ে সময়ের মুখ চাহিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বথা মৌনভাবে কালহরণ করাই উচিত। এই জন্যই কথা কহিবার ইচ্ছা করে না, লেখনীধারণের সাধও ক্রমে ফুরাইতেছে তথাপি গ্রহবৈগুণ্যের নিতান্ত অনিবার্য্যতা নিবন্ধন অদ্য কিঞ্চিৎ আবল্ তাবল বকিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অহো আর্য্য বংশধরগণ! বা হিন্দুবংসগণ! তোমাদের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম "বেদ" ইহা তোমরা অবশ্যই অবগত আছ। এই বেদ হইতেই স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি অসঙ্খ্য শাস্ত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে ইহাও তোমাদের স্বীকার্য্য এবং এই বেদের আলোচনা ব্যতীত আর্য্যদের কি ধর্ম্ম কর্ম্ম কি রীতি নীতি কি শিল্প বিজ্ঞান কিছুই যানা যায় না ইহাও অবোধ্য নহে; তথাপি তোমরা ইহার আলোচনায় কেন না মনোযোগ কর? না— অসুরদলের বেদ সমালোচনা দেখিয়াই আপনাদিগকে অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ ভাবিয়া শান্তিসুখই উপভোগ কর? ভাই! ইহাও কি শুন নাই যে কাজির কাজে হিন্দুর পরব হয় না?

আর এক কথা। বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হইলেই ত অধ্যাপক আবশ্যক এবং অধ্যয়নের পরীক্ষাও আবশ্যক। দেবদ্বেষী অসুরদল ত দেবগুরু বৃহস্পতিগণের অধ্যাপনা লাভে কদাপি সমর্থ নহেন এবং কোন্ বৃহস্পতিই বা কাহাকে পরীক্ষোতীর্ণ করিয়াছেন? এবিষয়েও কিছু অনুসন্ধান করা হইয়াছিল কি?

বেদ এমন বস্তু নহে যে, যে কেহ ইহার অধ্যাপনা করিতে পারেন, ইহা গুরুপরম্পরায় লভ্য, ইহার আভ্যন্তরিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখিতাধ্যয়ন ব্যতীত দীর্ঘকাল মৌখিক উপদেশই বিশেষ আদরনীয়, সেই জন্যই "প্রতিবেদং দ্বাদশাব্দং ব্রহ্মচর্য্যং" (বিতস), "ষট্‌ত্রিংশতাব্দিকং যেইং গুরোস্ত্রৈবেদিকঃ ব্রতসং ইত্যাদি বিধি আছে। অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধে "অনাতং"

বলিলেই আমরা তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি পরং বেদ সম্বন্ধে তাহা নহে; বেদের অধ্যাপক অতি বিরল সুতরাং "বেদ পড়িয়াছি" বলিলেই নিস্তার নাই, গুরুর নামও বলিতে হয়। হায়! বলিতে কষ্ট হয়ঃ— এই বিস্তৃত ভারতবর্ষে আমার অধ্যয়নকালে সামবেদ কৌথুমী শাখার ৫ জন মাত্র আচার্য্য ছিলেন, সেই ৫ জনই গতাসু। এই ৫ জনের ১০।১১ টী মাত্র ছাত্র ছিলেন (তন্মধ্যে সকলেই সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করেন নাই এবং অধিকাংশই অর্থজ্ঞান শূন্য। তাঁহাদের অধিকাংশও এক্ষণে শমন সদনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা কয়েকটী এখনও অসুর কারারুদ্ধ বেদপুরুষের জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে ক্ষণে ক্ষণে অসুরাস্ত্রপাৎ দেখিবার জন্যই যেন জীবিত আছি। এরূপ পরিগণিত অধ্যাপক সংখ্যায় কোন অসুর কোথায় অধ্যয়ন করিলেন এবং কেহই বা তাঁহার পরীক্ষা করিল? এবিষয়ে অনুসন্ধান করা কিছু অসম্ভব নহে। এরূপ অনুসন্ধিৎসাও কখন তোমদের মনে উদিত হইয়াছিল কি?

অসুরদলের প্রাদুর্ভাবেই বেদের স্রোত সকল রুদ্ধ প্রায় হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং এক্ষণে বেদ সলিলে পাপশৈবালের অভাব নাই, কোন কোন অসুর স্থান স্থান হইতে সেই শৈবালাদি তুলিয়া নিজ দাসবর্গের মধ্যে দেখাইতেছেন এবং বাহবা লইতেছেন; কালপ্রভাবে দাসভাবাপন্ন পবিত্র শোণিত আর্য্যপুত্রগণও তদ্দর্শনে গদ গদ চিত্তে প্রভুকে ধন্যবাদ দিতেছেন;—

অসুরাঃ উচুঃ—	দাসাঃ প্রত্যুচুঃ—
(১) তোমাদের এদেশ নহে!	না, কখনই না।
(২) আমারাও যেমন ঔপনিবেশিক তোমরাও তেমনি ঔপনিবেশিক॥	ধন্য আমরা, যেহেতু প্রভুর সমান।
(৩) তোমরা এদেশ বলে লইয়াছিলে!	আপনার লওয়াও অন্যায় নহে!
(৪) তোমাদের পিতৃপুরুষেরা বিজিতেদের প্রতি যতদূর অত্যাচার করিয়াছিলেন, আমরা এখনও ততদূর করি নাই!	যথেষ্ট অনুগ্রহ।
(৫) তোমাদের আদিপুরুষেরা বর্ব্বর!	অবশ্য, তাইত।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সকল অপূর্ব্ব সত্য-পূর্ণ গ্রন্থগুলি যতই কেন না দুর্ম্মূল্য হউক, প্রভুভক্তি পরায়ণ ধীমান্ মহাশয়েরা যেরূপে হউক সংগ্রহ করিবেনই করি-

বেন কিন্তু ইহার প্রতিবাদ গ্রন্থ কেহ সাধিয়া দিলেও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, যদিও কেহ চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া ল'ন কিন্তু মূল্য দানে বড়ই কষ্ট পান (যেহেতু ইহার ফলে রায়বাহাদুর হওয়া যায় না)।

ভাল, ভ্রাতৃগণ! তেঁতুলপাতা ছোট কি মানপাতা ছোট? নির্ণয় করিতে হইলে উভয় পাতাই দেখা কি কর্ত্তব্য নহে; কেবল তিন্তিড়ীপত্রের স্বাদ গ্রহণ করিয়াই কি "ইহা অপেক্ষা বৃহৎপত্র এজগতে হইতেই পারে না" এরূপ সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য? একেইত কালপ্রভাবে বেদ বিদ্যা অতি ক্ষীণা হইয়া আসিয়াছে; যাঁহারা অল্প বিস্তর কিছু কিছু বেদ জানেন তাঁহারা প্রায়ই সমুদ্রপারের সংবাদ রাখেন না কাজেই বাদ প্রতিবাদে কেনইবা অগ্রসর হইবেন? যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাদের সঙ্গফলে কেহ এ সংবাদ পান এবং তাহার প্রতিবাদ করেন, তাহা কি তোমাদের বিবেচনীয় নহে? অন্তত একবার পঠনীয়ও নহে?

বস্তুত বেদ অসভ্যকালের নহে এবং বেদকে তোমরা যত সহজ মনে কর তত সহজও নহে!

"উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্
উত ত্বঃ শৃন্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্।
উতোত্বস্মৈ তন্বং ১ বিসস্রে
জায়েব পত্যে উশতী সুবাসাঃ॥

(ঋঃ সং ৮,২,২৯, ৪)

অর্থাৎ—এই বেদবাক্যকে কেহ দেখিলেই বুঝিতে পারেন না, কেহ শুনিলেও বুঝিতে পারেন না; ঋতুমতী ভার্য্যা, স্বয়ং পতিকে আত্মসমর্পণ করার ন্যায় যখন ইনি স্বয়ং বুঝাদেন (ধরা দেন) তখনই বুঝা যায়।

প্রসঙ্গত ইহা বলাও বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে "বৈদিককালে লিপি ছিল না" এই মতটী† ও এই মন্ত্র দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইতে পারে; তাঁহাদের মতে বেদ বাক্যের শুনাই সঙ্গত হইতে পারে, লিপি ব্যবহার না থাকিলে) দেখা কিরূপে ঘটে! এইজন্যই প্রবাদ আছে "বিভেত্যল্পশ্রুতাদ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি"॥

আবাহন।

আজ আর্য্যভূমে সুলক্ষণের আশায় উৎসাহিত হইয়া আমরা মহাব্রতে দীক্ষিত হইলাম। আর্য্য সন্তান ধর্ম্মতত্ত্বের কথা সমুৎসুক চিত্তে শ্রবণ করিতেছেন, সাগ্রহ অন্তরে সনাতন ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্মের অনুসন্ধান করিতেছেন 'আর্য্য ধর্ম্ম যে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম' 'আর্য্য ধর্ম্মের আশ্রয় বিনা যে আর্য্য সমাজের কল্যাণ নাই' ইহা আর্য্যসন্তান অল্পে অল্পে বুঝিতেছেন। বহুকাল ব্যাপী বিজাতীয় রীতিনীতি বিজাতীয় শিক্ষার বিকার কাটাইয়া উঠিয়া অধঃপতিত হিন্দু জাতি আবার ধর্ম্মমদে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেছেন।

হিন্দু ধর্ম্ম পিপাসা বলবতী হইয়াছে, কিন্তু সে পিপাসা মিটাইবে কে? আর্য্য ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এ কথা কেবল মুখে বলিয়া ফল কি? সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম না করিলে ধর্ম্মানুগত আচরণের অনুষ্ঠান না করিলে, আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা না বুঝিলে কেবল মৌখিক কথায়, ফাঁকা বক্তৃতায় ঘর গড়া ব্যাথায়, আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইতে পারে না, তাহা যত দিন না হইতেছে, ততদিন জীবের মঙ্গল নাই, সমাজের উন্নতি নাই, আমাদের ইহ-পরলোকে নিস্তার নাই।

আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ কি, এ কথায় উত্তর বোধ হয় আজ এই হতভাগ্য দেশে অতি অল্প লোকেই দিতে পারেন। এখন সত্য সত্যই "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"। এ অবস্থার কর্ত্তব্য কি? এক কথা আছে মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"। কিন্তু আজি কার কালে তেমন মহাজন কটা দেখিতে পাই। যিনি শাস্ত্র মানিয়া চলেন, যিনি শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই ত মহাজন, তাঁহার পদানুসরণ করিয়াই ত, চলিতে পারি। কিন্তু তেমন মহাজন আজিকার এ সমাজে কজন আছেন! সমাজের এমনি দুর্দ্দশা যে শাস্ত্র চর্চ্চা বিলুপ্ত হইয়াছে সদ্দৃষ্টান্তের একান্ত অভাব হইয়াছে।

হিন্দুর আচার ব্যবহার, ক্রিয়া অনুষ্ঠান, নিয়ম পদ্ধতি, আজিকার দিনে বোধ হয় সম্যক্ রূপে কোথাও প্রচলিত নাই। বঙ্গে, বেহারে, উড়িষ্যায় দ্রাবিড়ে, মহারাষ্ট্রে গুজরাটে, উত্তর পশ্চিমে, অযোধ্যায় সকল প্রদেশের

হিন্দুসমাজেই ধর্ম্ম কর্ম্ম, অনুষ্ঠানাদি শাস্ত্র হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে আদৌ কোথায় প্রতিপালিত হয় না।

ইহার কারণ কি? সর্ব্বত্রই শাস্ত্রানুশীলনের একান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্রে কোন অনুষ্ঠানের কিরূপ বিধি আছে তাহার অনুসন্ধান আর কেহ বড় করেন না। শাস্ত্রের নামে অশাস্ত্রীয় নানা বিধ অনুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছে, এখন তাহাই ধর্ম্মাচরণ বলিয়া সমাজে পরিগৃহীত হইতেছে। এরূপে ধর্ম্মের নামে, কত অশাস্ত্রীয় অধর্ম্মাচরণ ও আজ সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। সে সকলের মূলোৎপাটন করিয়া সর্ব্বাংশে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রচলিত না করিলে আর্য্যধর্ম্মের গৌরব রক্ষা হইবে না।

কেন এমন হইল? কুসুমে কীট কেন প্রবেশ করিল? পরম পবিত্র সনাতন ধর্ম্মে অধর্ম্মাচার, অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান কেন প্রবিষ্ট হইল? তাহার কারণ আছে। ভারত বিধিবিড়ম্বনায় পরপদানত হইয়া আপনার যথাসর্ব্বস্বের সঙ্গে সঙ্গে বহুতপস্যালব্ধ হৃদয়ের অমূল্য ধন পবিত্র ধর্ম্মবল হারাইয়াছে। দেশের রাজা তখন দেশের ধর্ম্মরক্ষা করিতেন, অধর্ম্মের দমন করিতেন। রাজা, প্রজার ধন প্রাণ ও তদপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ ধর্ম্মের রক্ষক ছিলেন। শাস্ত্রদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী ধর্ম্মজীবী ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রোপদেশ দিতেন, শাস্ত্রের মর্ম্মব্যাখ্যা করিতেন, শাস্ত্রার্থ বিহিত-বিধি বিধানে ব্যবস্থা করিতেন।

তাহাই যখন শ্রবণ শাস্ত্রের গুঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে আর্য্য সমাজ ক্রমে অসমর্থ এবং শৃঙ্খলাভাবে বিলুপ্ত প্রায় হইতেছিল তখনই ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদের সংগ্রহ ও বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে অভিহিত হইয়াছেন। যখন নির্ম্মলা বুদ্ধির অভাবে মনন শাস্ত্র দুরবগাহ অতএব পরিত্যক্ত হইতেছিল তখনই বেদব্যাসের পাতঞ্জল-ভাষ্য ও বেদান্তদর্শন। যখন সময়ের তীব্র স্রোতে মানব ধর্ম্মশাস্ত্র মানবের মন হইতে অল্পে অল্পে স্থানচ্যুত ও অপসারিত হইতেছিল তখনই ব্যাস-সংহিতার উদয়। এইরূপে ভগবান বেদব্যাস শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই ত্রিবিধ শাস্ত্রের সংস্কারক ও প্রণেতা। তৎপরে যখন কালের গতিতে শাস্ত্রাকারে এই ত্রিবিধ শাস্ত্রের উপদেশ অসম্ভাবিত হইয়া উঠিল, তখনই বেদব্যাসের লেখনী হইতে কাব্যাকারে, উপাখ্যানকারে ইতিহাসাকারে সেই শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ-নিঃসৃত হইতে লাগিল এই জন্য পুরাণ ও মহাভারত। অতএব ভগবান বেদব্যাস শাস্ত্রার্থ প্রচারে যত কিছু উপায়াবলম্বন আবশ্যক তাহাই করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু আজ দুরদৃষ্ট বশে হিন্দু সমাজে এ দুয়েরই অভাব হইয়াছে। যিনি এখন আমাদের রাজা দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা, তিনি বিজাতি, বিধর্ম্মী, তাঁহার হস্তে ধর্ম্ম রক্ষার আশা কোথায়। আর সেই ঋষিবংশধর ব্রাহ্মণ সন্তান এখন ক্রমে স্বধর্ম্ম সদাচার ভ্রষ্ট হইয়া, শাস্ত্রানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডালত্বে পরিণত হইয়াছেন। এমন অবস্থায় সমাজে ধর্ম্মলোপ হইবে না ত আর হইবে কোথায়।

কিন্তু আজ, বিধাতার কৃপায়, সেই পবিত্রনামা মহাত্মা আর্য্য ঋষিকুলের পুণ্যবলে, হিন্দুজাতির সনাতন ধর্ম্মে আবার সুমতির লক্ষণ হইতেছে। চারিদিকে ধর্ম্মতত্ত্বের আন্দোলন দেখা যাইতেছে, হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন জন্য হিন্দু সন্তান বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বক্তৃতায়, সংবাদপত্রে, মাসিক পত্রে ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচিত হইতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ বটে।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটা অলক্ষণের কথা আছে। আজ কালকার হিন্দু-ধর্ম্মের আলোচনায়, "ধর্ম্মসংস্কারের" একটা প্রয়াস দেখিতে পাইতেছি। সনাতন ধর্ম্মকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, ছাটিয়া কাটিয়া, মাজিয়া ঘসিয়া নূতন করিয়া যেন গাড়বার চেষ্টা হইতেছে। শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা আমরা দেখিতেছি না, শাস্ত্রের বর্ণগত অপ্রাকৃত অনুবাদ, শাস্ত্রের অযথা সমালোচন, শাস্ত্রের অংশ বিশেষের নিন্দা ও পরিহার, বেদের ভ্রান্তত্ব প্রতিপাদন, বেদের সহিত স্মৃতিসংহিতা দর্শন পুরাণাদির ভ্রান্ত চক্ষে বিরোধ প্রদর্শন প্রভৃতি অনিষ্টাচরণকে আমরা সংস্কার বলিয়া গণ্য করিতে প্রস্তুত নহি।

যেটী যেমন ছিল, ঠিক সেইরূপভাবে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত করার নামই আমরা প্রকৃত সংস্কার বলিয়া বুঝি। সর্ব্বাংশে সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনকে যদি সংস্কার বলিতে হয় তবে আমরা সেরূপ সংস্কারেরই পক্ষপাতী। ধর্ম্মের যেখানে যে অঙ্গের হানি হইয়াছে, সেই অঙ্গ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আর্য্য কুলের চিরাচরিত সনাতন ধর্ম্ম, আর্য্য সমাজে পূর্ণাঙ্গে প্রবর্ত্তিত করাই এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ ও প্রধান কর্ত্তব্য। সেই মহৎ কর্ত্তব্য পালন ব্রতে আজ আমরা ব্রতী। সেই জন্যই বেদব্যাসের উদয়।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মণ্ডলীর সাহায্যে আমরা এই মহাব্রতে দীক্ষিত

হইয়াছি। যাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, যাঁহারা অধ্যাপক, যাঁহারা অধীত শাস্ত্র শাস্ত্রমতে শাস্ত্রোপদেশ দিবার যাঁহাদের অধিকার ও জ্ঞান আছে, যাঁহাদের বিধান লইয়া আজও হিন্দু সমাজ চালিত হইতেছে, কাশী নবদ্বীপ, ভাটপাড়া বিক্রমপুর কলিকাতা প্রভৃতি স্থলের প্রথম শ্রেণীর অধিকাংশ পণ্ডিতগণের সাহায্যে নির্ভর করিয়া আমরা এই কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিলাম। আগামী বারে তাঁহাদের নামাদি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল। নব্যযুবক যে অর্থে সংস্কার শব্দ ব্যবহার করেন, আমরা সেরূপ সংস্কারক নহি। পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া আমরা নূতন করিব না, পুরাতনের পুরাতনত্ব, সনাতন ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করাই আমাদের এই ব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। গুরুর নিকট সেই শাস্ত্রের উপদেশ যেমন পাইয়াছি, তদনুসারে শাস্ত্রমর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব। শাস্ত্র ছাড়িয়া এক পদও আমরা অগ্রসর হইব না; যাহা কিছু শাস্ত্রে আছে, তাহাই ধর্ম্ম, যাহা কিছু শাস্ত্রের অনভিমত তাহাই অধর্ম্ম; আমরা ব্রাহ্মণ সন্তান, গুরু সমীপে যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছি তাহাই প্রদর্শন করা এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। যেখানে যে অনুষ্ঠান শাস্ত্র শাসন হইতে অধুনা পরিচ্যুত পরিভ্রষ্ট ও পৃথগ্‌ভূত হইয়া পড়িয়াছে, শাস্ত্রানুসরণ করিয়া, শাস্ত্রকর্ত্তার পদে প্রণাম করিয়া, দেখাইয়া দিব, বুঝাইব যে তাহাই অধর্ম্ম, তাহাই যথার্থ আর্য্য সন্তানের পক্ষে বিষম সর্ব্বনাশের মূল। আমরা মানব শাস্ত্রের অবমাননা করিয়া শাস্ত্রের অনভিমতে, শাস্ত্রবাদ দিয়া, শাস্ত্রের অতিরিক্ত ধর্ম্ম প্রচার করা আমাদের সাধ্য কি। সেরূপ ধর্ম্ম প্রচারের কথা হইলে আমরা তাহাকে কদাচই আর্য্য ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। শাস্ত্রের একটিমাত্র বর্ণকেও অতিক্রম করিয়া আপনার বুদ্ধিতে ধর্ম্মমত প্রচারে সমুৎসুক, তাঁহার সহিত আমাদের মতৈক্য নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্গের প্রধান প্রধান পণ্ডিত মণ্ডলীর সাহায্যে এই পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। তন্মধ্যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী, শ্রীযুক্ত শশধরতর্কচূড়ামণি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ, ঢাকা কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়লঙ্কার, মেড়তলির শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার প্রধান সহায় ও পৃষ্ঠপোষক থাকিবেন। বঙ্গের খ্যাতনামা যাবতীয় প্রধান

প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণের নিকট এই পত্রিকার এক এক খণ্ড বিনা মূল্যে উপস্থিত হইবে। তাঁহাদের মতামত এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। অধিক কি, এই পত্রিকা বঙ্গীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মুখপাত্র স্বরূপ হইবে। সকলেই স্বীকার করিবেন যে এদেশে এইরূপ একখানি পত্রিকার সম্পূর্ণ অভাব আছে। এখন ভগবানের কৃপায়, আমরা সেই অভাব যাহাতে সর্ব্বাংশে পূর্ণ করিতে পারি, সাধ্যমত সে চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। অনেক পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট আমরা ভরসা পাইয়াছি, অনেকেই প্রবন্ধাদি সাগ্রহচিত্তে ইতিমধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন, সময় ও স্থানাভাবে অতি অল্প সংখ্যক মাত্র এই খণ্ডে প্রকাশিত হইল। ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর আমাদের লক্ষ রক্ষা বিষয় অধিকতর চেষ্টার লক্ষণ পাঠকগণ স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন। ইহা ভিন্ন আমাদের আরও অনেক আশা আছে। সকল কথা এস্থলে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কথার আড়ম্বরে কোন ফল নাই, আমাদের উদ্দেশ্য কি পাঠক কার্য্যতঃ সে পরিচয় ক্রমেই পাইবেন। একটা কথা কেবল বলিতে হইতেছে। ধর্ম্ম ছাড়া হিন্দুর কিছুই নাই। রাজনীতি, সমাজনীতি, আহার বিহার হিন্দুমতে সকলই ধর্ম্মের অনুগত, ধর্ম্মাচরণের নামান্তর মাত্র। আধুনিক রাজনীতির আবর্ত্তে পড়িয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে হিন্দুসন্তানের কোন্ পথে চলা আবশ্যক, হিন্দুর চক্ষে কোন্ ভাবে কি দেখা আবশ্যক, ধর্ম্মের বন্ধনে একত্র সম্বন্ধ হইয়া চেষ্টা না করিলে যে হিন্দুর কোন দিকে মঙ্গলের আশা নাই, এ সকল কথায় আলোচনাও এই পত্রিকার মধ্যে মধ্যে থাকিবে।

এইরূপ আশা ভরসায় বুক বাঁধিয়া, শাস্ত্রগুরু মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পবিত্র নামে এই ক্ষুদ্র পত্রিকার নাম করণ করিয়া তাঁহার চরণে,—পবিত্র ধর্ম্মা, পবিত্র চেতা ঋষি মণ্ডলীর চরণে, কোটি কোটি প্রণাম করিয়া, লোকপালক ভগবান নারায়ণের চরণকমলে চিত্ত সমাধান করিয়া, আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। আমাদের আশা কি সফল হইবে না? হিন্দু সন্তান হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার ব্রতে কি আমাদের সহিত কায়মনোবাক্যে যোগদান করিবেন না?

অনুষ্ঠান।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে হিন্দুধর্ম্মের নিতান্ত দুর্দ্দশা হইয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় এক্ষণে আবার স্বদেশীয়গণের স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের মহাত্মাই ইহার প্রকৃত কারণ। হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। উহা প্রকৃত মানবীয় সনাতন ধর্ম্ম। যতদিন মানবের মানবত্ব থাকিবে তত দিন উহার নাশ হইবে না। অনেক বার হিন্দু ধর্ম্ম যায় যায় হইয়াছে, কিন্তু উহা স্বকীয় পূর্ণ শক্তি প্রভাবে অদ্যাপি অটল ভাবে রহিয়াছে। বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্ট প্রভৃতি বহুতর ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কিন্তু এক কালীন বিনাশ না হইলেও ঐ সকলের অত্যাচারে ইহা কান্তিভ্রষ্ট হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের এরূপ দুরবস্থ হইয়াছে যে এক্ষণে ইহাঁকে চিনিবার যো নাই সে কান্তি নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই, সে লাবণ্য নাই, সে সুন্দর বেশ নাই। নিতান্ত দীন হীনের ন্যায়, আশ্রয় শূন্যের ন্যায়, বিকলাঙ্গের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। নানা বিধ উপধর্ম্ম ইহার সহিত মিলিত হওয়ায় এক্ষণে কোনটী যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম তাহা চিনিয়া লওয়া ভার হইয়াছে। সংস্কৃতশাস্ত্রে অনেক ভেল চলিয়াছে তাই প্রশ্ন উঠে সংস্কৃত ভাষায় যাহা লেখা আছে, তাহাই কি হিন্দুধর্ম্ম? এক্ষণে যেরূপ দেশাচার প্রচলিত তৎসমস্তই কি আমাদের পালনীয়? অবশ্য কখনই না। সকলেই স্বীকার করেন আমরা যে প্রণালীতে চলি সৎসমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে—তদনুসারে চলা আমাদের উচিত নহে। কিন্তু কিরূপে আমরা চলিব? মনুসংহিতাই কি আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক? যদি তাহা হয় তবে তাহার কারণ কি? অন্য সকল শাস্ত্র আমরা উপেক্ষা করিব কেন? ইহার মীমাংসা কে করে? পূর্ব্বে ঋষিগণ শাস্ত্র নির্ণয় করিয়া সংশয় ছেদ করিতেন, রাজা তাহা রাজ্যে প্রচলিত করিতেন। এক্ষণে সে ঋষি বা ঋষিতুল্য শক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ নাই রাজা বিদেশীয় তবে আমাদের এ সংশয় কে নিরাকৃত করিবে? কিরূপে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিত হইবে? হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ কেবল এই কথা প্রতিপন্ন করিলেই ত আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। কিরূপে চলিলে হিন্দুধর্ম্ম অনুসারে চলা হয় তাহা স্থির হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ দেখা যাইতেছে এক্ষণে

মানবের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইয়াছে। পূর্ব্বকালের নিয়ম এক্ষণে চলা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে আজি যদি মানবধর্ম্ম আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র হয় তাহা হইলে উহা কখনই কার্য্যকারী হইবে ইহা আর আশা হয় না। কেননা এক্ষণে সে ব্রাহ্মণ নাই, সে ক্ষত্রিয় নাই, সে বৈশ্য নাই, সে শূদ্র নাই। মনু লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ বেদ জানে না তাহাকে নিমন্ত্রণ করিবে না; সৎপ্রতিগ্রহ ব্যতিরেকে অন্য প্রকার দান গ্রহণ করিবে না। এখন কি ঐ নিয়ম চলিতে পারে? তাহা হইলে কি কেহ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে পারে না কাহারও নিকট শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়? বঙ্গে ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আদৌ নাই, * সমগ্র ভারতবর্ষে কয়জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আছেন। এই অসংখ্য ব্রাহ্মণ এক্ষণে কোন্ জাতির অন্তর্গত হইবেন? যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বাটীতে চাকরি করেন বা ভাত রাঁধেন তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণের সম্মান পাইবেন? না তাঁহাদিগকে এক্ষণে বেদ পাঠ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে? যদি তাহাও অসম্ভব বলিয়া বোধ করা যায়। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি কোথায়? এখন যে রাজা বিদেশীয়; রাজকার্য্য ও যুদ্ধ ভিন্ন যদি ক্ষত্রিয় অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে না পারে তবে ক্ষত্রিয় এখন কি করিবে? নিতান্ত নিম্ন সৈনিকপদ ভিন্ন যে গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কার্য্য এদেশীয়দিগকে দেন না। তবে ক্ষত্রিয়ের উপায় কি? তাহার পর বৈশ্য কি করিবে? বাণিজ্যে নানারূপ অন্তরায় উপস্থিত, এবং কৃষি নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর ও মুসলমানের কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং সামান্য বেনেটী দোকান ও যৎকিঞ্চিত অন্তর্বাণিজ্য ভিন্ন বৈশ্যের আর কোন রূপ জীবিকা থাকিতেছে না। তাহাও বিদেশীয়-বাণিজ্য ও শিল্পের বিস্তার হইয়া নিতান্ত হীনাবস্থা হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব কালীন শূদ্রের এখন এককালীন অস্তিত্ব নাই। তবে কে সেবাপরায়ণ হইবে? এক্ষণে বর্ণসঙ্করোৎপন্ন জাতি সকলই শূদ্রবৎ গণ্য হইয়া থাকে। কায়স্থ পর্য্যন্ত সমস্ত জাতিই বর্ণশঙ্করের অন্তর্গত। তাহাদের প্রত্যেকেরই শাস্ত্র-সম্মত জাতীয় নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি আছে। কায়স্থ বহুকাল হইতে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত থাকিয়াও শূদ্রমধ্যে গণ্য রহিয়াছেন। কিন্তু কি প্রকারে তাঁহারা প্রভূত শক্তি ও গুণ সম্পন্ন হইয়া নিতান্ত নির্গুণ ব্রাহ্মণাদির সেবা পরায়ণ হইবেন এইরূপে দেখা যায় যে, এক্ষণে সমাজের অবস্থা ও মানবের শক্তি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বঙ্গে ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নাই ব্রাহ্মণের পরেই শূদ্র অর্থাৎ

বঙ্গে কেবল একটী মাত্র উচ্চজাতি ব্রাহ্মণ আর সমস্তই হীন, এরূপ শ্রেণী বিভাগ কি কখন হইতে পারে? অল্প অল্প করিয়াই মানব পরস্পর উন্নত বা অবনত। পশুতে মানবে যে ভয়ানক প্রভেদ মানব মধ্যেও সেরূপ প্রভেদ, থাকিতে পারে বটে, কিন্তু মধ্যে অনেক সম্বন্ধ রক্ষক মানব থাকিবে। অর্থাৎ একজন মহাপণ্ডিত ও একজন মুটের মধ্যে ভয়ানক প্রভেদ বটে কিন্তু ঐ মুটে ও মহাপণ্ডিতের মধ্যে এমত অনেক লোক আছে যে তাহারা পর পর ঐ মহাপণ্ডিত হইতে অল্পে অল্পে হইয়া মুটের সহিত মিলিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণের পরেই শূদ্র হইলে মহাপণ্ডিতের পরেই মুটের অবস্থা ন্যায় অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে সুতরাং সমতা বা ক্রম রাখিবার জন্য হয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কতকগুলিকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে হইবে। না হয় শূদ্রদিগের মধ্যে হইতে কতকগুলিকে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় হইতে হইবে। নচেৎ ক্রমোন্নতি বা ক্রমাবনত রূপ স্বাভাবিক নিয়ম কিরূপে রক্ষিত হয়; সুতরাং অস্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। সুতরাং মানব ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে চলিতে হইলে এক্ষণকার কাল ও অবস্থা ভাবিয়া শাস্ত্রকে সহজ করিয়া সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, না হয় মানবের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কিন্তু মানবের অবস্থা পরিবর্ত্তন নিতান্ত সহজ নহে। মানবের প্রকৃতির পরিবর্ত্তনানুসারে সকল সময়ে একরূপ ধর্ম্ম চলে না। কেননা মনু বলিয়াছেন,

তপঃ পরং কৃতে যুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুঃ দানমেকং কলৌযুগে ॥

এই জন্য ঋষি বলিয়াছেন

তপস্যা সত্য যুগের ধর্ম্ম, জ্ঞান ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম, যজ্ঞ দ্বাপরের ধর্ম্ম এবং দান কলিযুগের ধর্ম্ম।

ঋষিগণ কালের শক্তি ও অবস্থা অনুসারেই মানবের ধর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়াছেন ও তদনুসারে পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদি ঋষিতুল্য শক্তিশালী লোক এখন থাকিতেন, তাহা হইলে এই দুঃসময় আবার ধর্ম্মব্যাখ্যা হইত কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ এখন আমাদের মধ্যে সেরূপ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি নাই হিন্দুরাজা নাই, তবে এখন উপায় কি? হিন্দুধর্ম্ম কি থাকিবে না যখন বুঝা যাইতেছে যে, এখন হিন্দুগণ যে নিয়মে চলিতেছে সৎসমস্ত প্রকৃত নহে, যখন দেখা যাইতেছে মনু প্রভৃতির শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান সমাজের

উপযোগী নয়, ও যখন দেখা যাইতেছে ঋষি ও রাজা নাই, যে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মাববোধ করিয়া সমাজকে ধর্ম্মের উপযোগী করিতে পারেন, তখন হিন্দু ধর্ম্মের অস্তিত্ব কি প্রকারে থাকিবে? অনেকে আজ কাল এইরূপ সন্দেহ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের স্থায়িত্বের প্রতি সন্দেহ করেন ও ম্লেচ্ছাচারকে কালের উপযোগী বিবেচনা করিয়া তদবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়েন। আমাদিগের বোধ হয় তাঁহাদের এ কথা নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক। কেন না যদিও উপযুক্ত পণ্ডিত নাই, স্বদেশীয় রাজা নাই, কিন্তু তথাপি ঋষিদিগের গ্রন্থ আছে, ও রাজস্থানীয় সমাজ আছে। আমাদের মতে সমস্ত সন্দেহ দূরে ফেলিয়া যদি সমগ্র পণ্ডিত সমাজ মিলিত হইয়া দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া শাস্ত্র অটুট রাখিয়া শাস্ত্র ও শাস্ত্র কর্ত্তার উদ্দেশ্য সকল মনোযোগ পূর্ব্বক বুঝিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে অবশ্যই আমাদের কর্ত্তব্য স্থির হইবে। সমস্ত সমাজ ও সমস্ত পণ্ডিত মণ্ডলী মিলিয়া যে বিধি ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবেন। সেইরূপে সমস্ত সমাজকে চলিতে হইবে। যিনি নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে না চলিবেন তাঁহাকে সমাজ উপযুক্ত দণ্ড দিবেন তাহা হইলে রাজশক্তির কার্য্যও হইবে। তাহা হইলেই অচিরে মেঘান্তরিত সূর্য্যেরন্যায় নির্ম্মল সনাতন আর্য্য সমাজ নবচ্ছটায় উদিত হইয়া পূর্ব্ববৎ নিজগৌরব বিস্তার করিবে।

দেবযান।

(আতিবাহিকী দেবতা)

সত্বগুণ বা শুভপ্রাণ যোগে জীবের যত প্রকার ঊর্দ্ধসদ্গতি হয় তাহাকে শাস্ত্রে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। চন্দ্রোপলক্ষিত পিতৃ-লোক, সূর্য্যোপলক্ষিত দেবলোক, এবং ব্রহ্মার অধিকারভূত হিরণ্যগর্ব্ভাখ্য প্রাণায়াতন সূক্ষ্ম সৌরমণ্ডলোপলক্ষিত অমৃতাখ্য ঊর্দ্ধলোক।

ব্রহ্মার অধিকারভূত যে ঊর্দ্ধলোক, মহল্লোকাবধি সত্যলোক পর্য্যন্ত তাহার অন্তর্গত। তদ্ভিন্ন পিতৃলোক ও দেবলোকও ঊর্দ্ধলোক শব্দের বাচ্য। সুতরাং সংক্ষেপতঃ ঊর্দ্ধলোক এই তিন প্রকার। সর্ব্বোর্দ্ধ অথবা ব্রহ্মলোক মধ্যম দেবলোক, এবং তদপেক্ষা হীন পিতৃলোক।

শাস্ত্রে ঐ ত্রিবিধ স্বর্গকেও পুনশ্চ সংক্ষিপ্ত করিয়া দুইটী মাত্র স্বর্গলোকের

উল্লেখ করিয়াছেন। যথা পিতৃলোক, এবং দেবলোক। দেবস্বর্গাবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পঞ্চবিধ আনন্দ স্থান দেবলোক বলিয়া সামান্যতঃ উক্ত হইয়াছে। ফলতঃ পিতৃলোক, দেবলোক, ও ব্রহ্মলোক, এই তিন শ্রেণীই বিশেষ বিখ্যাত।

পিতৃক্রিয়া দেবযজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম, এবং সগুণ ব্রহ্মোপাসনা-রূপ যোগ ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি বিদ্যা এই ত্রিবিধ আচরণ দ্বারা জীবের অন্তরে সত্ত্ব গুণের বা সাত্ত্বিক প্রাণের তারতম্য সম্পাদিত হয়। তৎপ্রভাবে মৃত্যুকালে জীবের অন্তঃকরণে ঐ ত্রিবিধ স্বর্গপথ উদঘাটিত হয়।

চন্দ্রোপলক্ষিত যে স্বর্গ তাহারই নাম পিতৃলোক। সত্ত্বগুণের যে ধাতু পিতৃস্বর্গের নেতা, তাহাকে দক্ষিণ-মার্গ, দক্ষিণায়ন-মার্গ, ধূম-মার্গ, কৃষ্ণমার্গ, পিতৃযান প্রভৃতি কহে। অধিকন্তু তাহা ঈড়ানাড়ি অথবা শরীরস্থ গঙ্গানদী বলিয়া কথিত হয়।

উক্ত পিতৃযান মার্গকে যে ঈড়ানাড়ি বলে তাহার প্রমাণ (উত্তরগীতা ২ অঃ ১২।) "ঈড়াচ বামনিশ্বাস সোমমণ্ডল গোচরা। পিতৃযানমিতিজ্ঞেয়া বামমাশ্রিত তিষ্ঠতি।" নরদেহের বামাংশে ঈড়ানাম্নী নাড়ি আছে। তাহা বামনিশ্বাস স্বরূপা। তাহা চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় অল্প প্রকাশ বিশিষ্ট। সেই নাড়িকে পিতৃযান বলিয়া জানিবে।

ইষ্টাপূর্ত্তক্রিয়ার দ্বারা যে সকল কর্ম্মযোগীর চিত্ত পিতৃলোকে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয়, তাঁহাদের ঐ নাড়ী দীপ্তি পায়। তাহা স্বর্গপথ স্বরূপে পিতৃলোকস্থান চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত আয়ত। সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ন আশ্রয় করিলে যেমন পৃথিবীর উত্তরভাগে তাঁহার অল্পপ্রভা প্রকাশ পায়, জ্ঞানরূপ সূর্য্যের সম্যক্ জ্যোতি—অভাবে কর্ম্মীগণের সূক্ষ্ম দেহে তদ্রূপ সামান্য সুকৃতিরূপ জ্যোতিমাত্র উদিত হয়। এই সুকৃতি মুক্তিজনক নহে, কিন্তু কর্ম্মীগণের প্রার্থনার অনুরূপ সাংসারিক সৌভাগ্য জনক। চন্দ্রগ্রহই, অন্ন, অমৃতরূপ প্রাণ ও মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অতএব অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় ঐশ্বর্য্য-কামী ইষ্টাপূর্ত্তাদি ক্রিয়াশীল জীবগণ স্ব স্ব তাদৃপ সুকৃতির অনুরূপ চন্দ্রগ্রহের অধিকার ভূত পিতৃস্বর্গ, বা ইন্দ্রস্বর্গে স্থান লাভ করেন। ঐ সমস্ত স্বর্গলোক দিবাকর ও চন্দ্রভুক্ত দক্ষিণায়ান উৎপাদক নক্ষত্রলোকের মধ্যেই অবস্থিতি করে। এই নিমিত্ত তাহা চন্দ্রোপলক্ষিত দক্ষিণায়নমার্গ অথবা দক্ষিমার্গ বলিয়া উক্ত হয়।

সত্ত্বগুণের যেরূপ ধাতু, দেবস্বর্গের নেতা, তাহাকে উত্তরমার্গ উত্তরায়ন-মার্গ,—অগ্নিমার্গ, জ্যোতিঃমার্গ, সূর্য্যদ্বার, শুক্লমার্গ, অর্চ্চিরাদি—মার্গ, দেবযান প্রভৃতি কহে। অধিকন্তু তাহা পিঙ্গলানাড়ি অথবা যমুনানদী বলিয়া উক্ত হয়।

শেষোক্ত উক্তির প্রমাণ (উত্তর গীঃ ২।১১) যথা—"দক্ষিণা পিঙ্গলানাড়ি বহ্নিমণ্ডল গোচরা। দেবযানমিতি জ্ঞেয়া পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী॥" দেহের দক্ষিণাংশে দক্ষিণ নিশ্বাস স্বরূপা বহ্নিমণ্ডল গোচরা পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী পিঙ্গলানাম্নী নাড়ি আছে। তাহাকে দেবযান অর্থাৎ দেবস্বর্গে যাইবার পথ বলিয়া জানিবে।

দেবযজ্ঞাদি মহা মহা পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা যে সকল মহাত্মাগণের চিত্ত দেব-লোকে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয়, তাঁহাদের অন্তরে ঐ নাড়ি দীপ্তি পায় তাহা স্বর্গপথ স্বরূপে সূর্য্যপ্রভা সমুজ্জ্বলিত সুরলোক পর্য্যন্ত আয়ত। তাহাতে মহা দীপ্তিমান উত্তরায়নমার্গ, বা উত্তরমার্গ কহে।

সত্ত্বগুণের যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাতু ব্রহ্মস্বর্গের নেতা তাহাকেও প্রাগুক্ত প্রকারে উত্তর বা অর্চ্চিরাদি মার্গ কহে। কিন্তু তাৎপর্য্যের ভেদ আছে। যে সকল ব্যক্তি উক্ত উভয় প্রকার পিতৃ এবং দৈবকর্ম্মে আসক্তচিত্ত নহেন কিন্তু যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মোপাসনারূপ শাণ্ডিল্য প্রভৃতি বিদ্যার দ্বারা অথবা হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়ক বিদ্যা, যোগাচরণ ও তপস্যা দ্বারা স্ব স্ব চিত্ত-ক্ষেত্রকে নির্ম্মল করিয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞান-জ্যোতিঃ কর্ম্ম-নিষ্পন্ন আলোকা-পেক্ষা প্রখর। এইজন্য মার্গস্থানে পূর্ব্ববৎ উত্তরমার্গ ব্যবহার করিয়াও শাস্ত্রে নাড়ি উপলক্ষে বিশেষতা দর্শাইয়াছেন।

উত্তর গীতায় (২।১৪—১৫) "দীর্ঘাস্থি মূর্দ্ধি পর্য্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতে কথ্যতে তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মনাড়িতি সূরিভিঃ॥ ঈড়া পিঙ্গলায়ামধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী। সর্ব্বপ্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বগং সর্ব্বতোমুখং॥" জীবের মূলা-ধার অবধি মস্তক পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ অস্থি আছে তাহার নাম মেরুদণ্ড অথবা ব্রহ্মাণ্ড। তাহার মধ্য দিয়া যে সূক্ষ্ম নাড়ি প্রবাহিত হয় তাহারই নাম সুষুম্না। তাহাকে বুধগণ ব্রহ্মনাড়িও কহিয়া থাকেন। তাহারই নামান্তর জ্ঞাননাড়ি। তাহা ঈড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্ত্তী এবং যেমন ব্রহ্মলোক হইতে সকল লোকমণ্ডল নিস্সৃত হইয়াছে সেইরূপ জীবের পক্ষে ঐ নাড়ি অপর সমস্ত নাড়ির সঙ্গম স্থল। শাস্ত্রে এই জ্ঞানরূপিণী নাড়িকে সরস্বতী বলেন।

(যথা জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্রে ১০) ঈড়া ভগবতী গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনানদী। ঈড়াপিঙ্গলয়োর মধ্যে সুষুম্নাচ সরস্বতী ॥" ঈড়া নাড়ি গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা, এবং তদুভয়ের মধ্য প্রবাহিতা সুষুম্না সরস্বতীনদী। এই সরস্বতী-নদী সূর্য্য ধাতু সম্পন্ন জ্ঞান ধারা মাত্র। ইহার নামান্তর 'ভারতী'। তিনি সূর্য্যেরই ধাতু এই কথা জ্ঞাপনের নিমিত্ত তিনি 'ভরত' নামক আদিত্যের পত্নী বলিয়া কথিতা হইয়াছেন। (ঋঃ সং ২।১৮) সুষুম্না নাড়ির অর্থও সূর্য্যের জ্ঞানধাতু-সম্পন্ন আধ্যাত্মিক নাড়ি।

সগুণ ব্রহ্মোপাসক ও যোগীগণের পক্ষে সুষুম্না নাড়ি মহর্লোকাবধি সত্য লোকের সোপান স্বরূপ। "সুষুম্না ভানুমার্গেণ ব্রহ্ম দ্বারা বধিস্থিতা।" (যোগস্বরোদয়ঃ) সুষুম্নানাড়ি সূর্য্যরশ্মি-সম্পন্ন তেজোপথ দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত স্থিতি করে। উহা জীবদেহে যেমন মূলাধারাবধি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত আছে, সগুণ ব্রহ্মোপাসক ও যোগীগণের পক্ষে উহা মৃত্যু সময়ে সেইরূপ তাঁহাদের অন্তঃকরণাবধি মহর্লোকাদি ভেদপূর্ব্বক সত্যার্থ্য ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্ত সুপ্রকাশিত হয়। *

* পিতৃযান, দেবযান এবং দেবযানের ঊর্দ্ধকক্ষাস্বরূপ ব্রহ্মভুবন যেমন মানবের দেহেতে আছে সেইরূপ স্বর্গেতেও আছে আবার সেইরূপ সর্ব্ব-বর্ষোত্তম ভারতবর্ষেও আছে। দেহেতে সেগুলি নাড়ি বা ধাতুস্বরূপ; স্বর্গেতে সেগুলি স্বর্গলোক বা সুকৃতি-ভোগের স্থানস্বরূপ, এবং ভারত পুণ্যক্ষেত্রে কতিপয় তীর্থস্থান সেই সমস্ত ধাতু এবং স্বর্গলোকের অংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। দেহেতে—ঈড়ানাড়িই গঙ্গানদী অথচ পিতৃযান রূপস্বর্গ—ইহাই শরীরস্থ চন্দ্রলোক। পিঙ্গলা নাড়িই যমুনানদী অথচ দেবযানরূপ স্বর্গ—ইহাই শরীরস্থ বহ্নিলোক। সুষুম্না নাড়িই সরস্বতী নদী অথচ ব্রহ্মলোক—ইহাই শরীরস্থ আদিত্য লক্ষণ স্বর্গ, ইহাকেও দেবযান কহা গিয়া থাকে। স্বর্গেতে—চন্দ্রলোকেই পিতৃস্বর্গ, তাহা দক্ষিণমার্গে। সূর্য্য-প্রভাসম্পন্ন অর্চ্চির ভুবন সমূহ, দেবযান। তন্মধ্যে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত উত্তর স্বর্গকে দেবলোক এবং তদূর্দ্ধ উত্তর স্বর্গ সমূহকে ব্রহ্মভুবন কহে। ব্রহ্ম-ভুবন সমূহই মহা দীপ্তিমান আদিত্য লক্ষণ-স্বর্গধাম। তন্মধ্যে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোক উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধ। বিষ্ণুপদ, গোলক, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মলোকেরই কক্ষ্যবিশেষ বা নামান্তর মাত্র। অপরঞ্চ উহা শিবলোক বলিয়াও উক্ত হয়। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে

ঐরূপে প্রকাশিত উক্তনাড়ি আশ্চর্য্য গতিশক্তিবিশিষ্ট মানস্বরূপে বা পথ স্বরূপে প্রকটিত হয়। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে যে, উহা বিদ্যুৎশক্তিমাত্র। মৃত ব্যক্তির আত্মার সম্মুখে তাহা সুচারুরূপে আবির্ভূত হয়। দেহ পরিত্যাগ কালে জীবাত্মা তৎপ্রভাবে মহানন্দে স্বীয়গম্যস্থানকে জ্ঞান নেত্রের সম্মুখে শোভনরূপে সুপ্রকাশিত দেখেন, এবং চিরপ্রবাসী ব্যক্তির পিতৃ-নিকেতন দর্শনে যেমন আনন্দ হয় সেইরূপ আনন্দে স্বর্গভুবন গমনে প্রস্তুত হন। উক্ত তাড়িতপন্থার এই প্রভাব। ফলতঃ উহা সামান্য পথের ন্যায় নহে। উহা জীবেরই কর্ম্মবশতঃ তদীয় সূক্ষ্ম দেহাবস্থিত বিদ্যুতীয় শক্তি মাত্র। তাঁহার তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মলোক হইতে তাহার আকর্ষণ হইয়া থাকে।

মহর্ষি বেদব্যাস শারীরকে (৪।৩।৪—৬) মীমাংসা করিয়াছেন "আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ" অর্চ্চিরাদি পদার্থ সকল সামান্য পথ স্বরূপ বা ভোগস্থান নহে। উহা আতিবাহিক মাত্র। অর্থাৎ জীবকে উহা মৃত্যুকালে সর্ব্ব-ঊর্দ্ধ উত্তর-স্বর্গ পর্য্যন্ত বহন করে। কেন না তৎকালে জীবের কর্ম্মোপ-যোগী স্থূলদেহ থাকে না সুতরাং জীব স্বয়ং তখন চলৎশক্তি রহিত। এজন্য পরসূত্রে কহিলেন, "উভয় ব্যামোহাত্তৎসিদ্ধেঃ।" যদি বল অর্চ্চিরাদি মার্গের চৈতন্য নাই এবং জীবও তখন চলৎশক্তিহীন, তবে কিরূপে গমন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়? সেজন্য কহিলেন যে, অর্চ্চিরাদির চৈতন্য নাই বলিয়া যে তদ্দ্বারা পরলোকগামী আত্মার চালন হইতে পারে না এমত নহে। তাহার চেতনবৎ কার্য্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। অগ্নিনিত্ত কৌশীতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে তাঁহাকে 'বিদ্যুৎপুরুষ' এবং ছান্দোগ্যে 'অমানব পুরুষ' বলিয়াছেন। তদুপলক্ষে পরসূত্রে কহিতেছেন "বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ।" বিদ্যুৎলোকস্থিত যে অমানব পুরুষ তিনি বিদ্যুৎলোকের ঊর্দ্ধ ব্রহ্ম-লোক

গয়াধামই পিতৃস্বর্গ ও বিষ্ণুপদের অংশে প্রতিষ্ঠিত। তাহাই পিতৃযান। সরস্বতী নদীতীরস্থ দেবনির্ম্মিত দেশ সমূহই দেবস্বর্গের অংশে এবং তদন্তর্গত ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ বা নৈমিষারণ্যই ব্রহ্মলোকের অংশে প্রতিষ্ঠিত। এতদুভয়ই দেবযান। গোকুলই গোলকের অংশসম্ভূত। এইরূপে প্রয়োগাদি অপর সমস্ত তীর্থ স্থানেই কোন না কোন স্বর্গের এবং কোন না কোন শারী-রিক শুভ্রধাতুর অংশ বিরাজ করিতেছে। এই জন্য এই পুণ্যভূমি ভারত-বর্ষই স্বর্গাপবর্গের দ্বার স্বরূপ। আমাদের স্থান সঙ্কীর্ণ বিধায় এ সব কথার বিস্তারিত বিবরণে ক্ষান্ত হইলাম।

পর্য্যন্ত জীবকে লইয়া যান। বেদে এইরূপ শ্রুতি আছে। এতাবতা অর্চ্চিরাদি সামন্য পথ জ্ঞাপক নহে; কিন্তু বিদ্যুৎশক্তি-সম্পন্ন আতিবাহিকী দেবতাবাচক।

উপরি-উক্ত সূত্রত্রয় ও তল্লক্ষিত বেদবাক্য উপলক্ষ করিয়া আচার্য্যেরা বিচার করিয়াছেন যে, শাস্ত্রে (ছাঃ ৫ প্রপাঃ ১০) অর্চ্চিরাদি অর্থাৎ উত্তরায়ন-মার্গের যেরূপ ক্রম দিয়াছেন তাহাতে সহসা তাহাকে লৌকিক পথের ন্যায় পথ বলিয়াই অনুমান হইতে পারে। ছান্দোগ্যে আছে যে, অর্চ্চিরাদিমার্গ-গামী জীব "প্রথমতঃ তেজ পথকে প্রাপ্ত হয়েন, পশ্চাৎ দিবা, পশ্চাৎ পৌর্ণমাসী, পশ্চাৎ ছয় মাস উত্তরায়ন, পশ্চাৎ সম্বৎসর, পশ্চাৎ সূর্য্যের দ্বারা যান।" ইত্যাদি। এইরূপ উক্তিতে কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে' ঐ পথটি লৌকিক পথের তুল্য। যেমন গ্রাম হইতে নির্গত হইয়া নদী দিয়া কিছু দূর যাওয়া গেল। তাহার পর পর্ব্বতে আরোহণ করা গেল। তাহার পর ঘোষ পল্লিতে- উপস্থিত হওয়া গেল। অর্চ্চির-মার্গও সেইরূপ। কেন না জীব দেহত্যাগ করিয়া প্রথমে তেজপথে কিছু দূর গমন করিলেন। পশ্চাৎ দিবা পৌর্ণমাসী, উত্তরায়ণ প্রভৃতি দিয়া সূর্য্যদ্বারে উত্তীর্ণ হইলেন। পশ্চাৎ তড়িত, বরুণ প্রজাপতি ইত্যাদি লোক ভ্রমণ করিয়া, এবং তথাকার ভোগাদি সম্ভোগ পূর্ব্বক অবশেষে গম্য স্থানে উপনীত হইলেন। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত এই। "তৎপুরোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তীত্যন্তে শ্রূয়মানস্যামানবস্য বিদ্যুৎ-পুরুষস্য নেতৃত্ববগমাৎ। নৎ সাহচর্য্যেণার্চ্চিরাদয়োপি আতিবাহিকী দেবতা ইত্যবগম্যতে। যত্তু নির্দ্দেশ সাম্যমুক্তং তৎ অতিবাহিকদেবতাস্বপি সমানং। লোকশব্দস্তু উপাসকানাং তত্র ভোগাভাবেপ্যতিবাহিক দেবানাং ভোগমপেক্ষ্যোপ পদ্যন্তে তস্মাদাতিবাহিকঃ অর্চ্চিরাদয়ঃ।" এই সিদ্ধান্তের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, সেই অমানব বিদ্যুৎ-পুরুষ-মৃত্যুর পরে উপাসককে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। তৎপক্ষে উক্ত পুরুষের নেতৃত্ব আছে। অর্চ্চিরাদির চৈতন্য না থাকিলেও বিদ্যুৎ-পুরুষের সাহচর্য্য-বশতঃ তাহা দেববৎ হইতেছে। উক্ত মার্গমধ্যে বরুণ-লোক বিদ্যুৎ-লোক ইত্যাদি যে সমস্ত লোক কথিত হইয়াছে তাহা অর্চ্চিরাদির মধ্যগত; কিন্তু উপাসকগণের ভোগভূমি নহে। সুতরাং অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকী দেবতা—অর্থাৎ বহন করিবার বিদ্যুতীয়শক্তি মাত্র।

অর্চ্চিরাদিমার্গ কেবল ব্রহ্মচারী, যোগী প্রভৃতি সগুণ ব্রহ্মোপাসকের সূক্ষ্ম-শারীরিক শুভধাতু মাত্র। তাহা বিদ্যুৎ-শক্তিসম্পন্ন মুহূর্ত্তগামী তেজোমার্গ বিশেষ। তাহা সহস্র নিরাকার হইলেও জ্ঞানালোক-সম্পাদিত সূক্ষ্মদেহের অঙ্গস্বরূপ—নাড়িস্বরূপ। সূক্ষ্মদেহ ভৌতিক দ্রব্যধাতুর সারাংশবিশিষ্ট। সুতরাং ঐ নাড়ি অথবা অর্চ্চিরাদি মার্গও তদ্রূপ সারাংশবিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। তাহা আধ্যাত্মিক-তাড়িত-শক্তিযুক্ত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঐ শক্তি- উপাসককে মৃত্যুকালে উত্তর স্বর্গে বহন করে। উত্তর-মার্গস্থ সর্ব্বোর্দ্ধ স্বর্গ স্বরূপ ব্রহ্মলোক হইতে তাহার প্রবাহ আগমন করে। এই মার্গের উত্তর প্রান্তে বিদ্যুতীয় স্রোতের উৎসস্বরূপ বিদ্যুৎ-লোক আছে। তদূর্দ্ধ উত্তর-প্রান্তবর্ত্তী বরুণ লোকের সহিত তাহার নিকট সম্বন্ধ। কৌশীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে উক্ত সম্বন্ধের উল্লেখ আছে। মহর্ষিব্যাসদেব তত্তুপলক্ষে (শারীরকে ৪।৩।৩) এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। "তড়িতে হি বিবরণ সম্বন্ধাৎ" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কৌশীতকীর উক্তি অনুসারে তড়িত-লোক উত্তর আকাশে অবস্থিতি করে। তাহার ঊর্দ্ধ উত্তরাংশে বরুণ লোক সন্নিবিষ্ট। এই বরুণলোকস্থ জলের সহিত সম্বন্ধ জন্য তাড়িত-লোক হইতে আধ্যাত্মিক বিদ্যুৎ প্রতিফলিত হয়। সেই প্রতিফলিত অমানব বিদ্যুৎ-পুরুষ উপাসককে উত্তরমার্গে বহন করে। তাহারই প্রভাবে অর্চ্চিরাদিমার্গ সম্পূর্ণ হয়। ঐ সূত্রোপলক্ষে (শাঃ অধিঃ ৪।৩।৩) আচার্য্য-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "সম্বন্ধ-বশাৎ ব্যবস্থাপ্যতে। বিদ্যুৎপূর্ব্বক বৃষ্টি-গত নিরস্য বরুণোধিপতিরিতি বিদ্যুৎবরষয়ো সম্বন্ধ॥" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিদ্যুৎ ও বরুণে একটি সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধবশতঃ সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, বিদ্যুৎ-পূর্ব্বক যে বৃষ্টি হয়, বরুণই তাহার অধিপতি। কেন না জলের সম্বন্ধ ব্যতীত বিদ্যুৎ প্রকাশমান হয় না। অতএব বিদ্যুৎ ও বরুণে নিকট সম্বন্ধ। ভাবার্থ এই যে, সামান্য বিদ্যুৎ যেমন জলসংযোগে অর্থাৎ মেঘ ও বৃষ্টিদ্বারা গগন মণ্ডল আর্দ্র হইলে প্রতিফতিল হয়, তাহার ন্যায় ঐ আধ্যাত্মিক স্বর্গীয় বিদ্যুৎ-শক্তি ও স্বর্গীয় জলসংযোগে প্রবাহিত হয়। সেই স্বর্গীয় জলবিশিষ্ট বরুণ-লোক পুরাণ-শাস্ত্রে স্বর্গগঙ্গা—মন্দাকিনী নামে কথিত হয়। "ক্ষীরতুল্য জলাশশ্বদতুত্তঙ্গতরঙ্গিণা। বৈকুণ্ঠাদব্রহ্ম লোকঞ্চ ততঃ স্বর্গং সমাগতা॥" (ব্রঃ বৈঃ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ৩৪ অঃ।) ক্ষীরতুল্যজলা চিরপ্রবাহবতী, উত্তুঙ্গ তরঙ্গিণী মন্দাকিনী বৈকুণ্ঠ

ও ব্রহ্মলোক হইতে স্বর্গভুবনে সমাগত হইয়াছেন। ব্রহ্মলোকও বৈকুণ্ঠের নামান্তর বিষ্ণুপদ। বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইতে ঐ সর্ব্বপাপ হরা গঙ্গা প্রসারিত হইয়াছেন বলিয়া তিনি বিষ্ণু পাদোদ্ভবা বলিয়া কথিতা হন। উক্ত বিষ্ণুপাদপান্তবর্ত্তিনী জ্ঞানপ্রবাহা বিমলা গঙ্গা সলিল-স্পর্শে ব্রহ্মলোক হইতে প্রবাহিত আধ্যাত্ম-বিদ্যুৎ পন্থা উপাসকের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়, এবং তাহাই তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে বহন করে। উত্তরমার্গগামী উপাসকের মঙ্গলার্থে পরমেশ্বরের নিয়মে এইরূপ তাড়িত পন্থা বিরচিত হইয়া আছে। ফলতঃ উপাসনা ও যোগাচারই ঐ তাড়িতাকর্ষণের হেতু। তপস্যা প্রভাবে ব্রহ্ম নাড়ি প্রস্তুত হইলেই মৃত্যুসময়ে বরুণ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বিদ্যুৎ-দেবতা আসিয়া সেই নাড়ির যোগে সূক্ষ্ম শরীরের সহিত উপাসককে মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত করেন। পুরাণশাস্ত্রে এই অমানব চিদ্যুৎস্বরূপ নেতৃপুরুষকে "বিষ্ণুদূত", "শিবদূত" ইত্যাদি শব্দে কহেন। উপাসকও মৃত্যুকালে উপাসনা ও তপস্যার প্রভাবে স্বীয় শুভাবহ ধাতুর আবির্ভাব স্বরূপে সেই দেবপুরুষের মূর্ত্তি দেখিয়া থাকেন। সূক্ষ্ম দেহের আশ্চর্য্য প্রভাব, এবং তপস্যার চমৎকার শক্তি।

সূক্ষ্ম দেহের এই সকল অলৌকিক প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বকালে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, একই প্রকার নাড়ি দ্বারা পাপী, পুণ্যবান্ ও উপাসক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জীবের পরলোক নিঃসরণ হয় কি না? এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য মহর্ষি বেদব্যাস শরীরকে [৪।২।১৭] মীমাংসা করিয়াছেন যে, "তদোকোগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশতদ্বারোবিদ্যা সামর্থ্যৎ তচ্ছেষগতানুস্মৃতি যোগাচ্চর্হাদানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উপাসক যৎকালে কলেবর ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত প্রজ্বলিত হয়। সেই তেজ হইতে যে কোন নাড়ির দ্বার অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ নাসা বদন প্রভৃতি রন্ধ্র প্রকাশ পায়, সেই নাড়িরূপ পথ দিয়া জীবের নিঃসরণ হয়। সেই মনোহর পথই স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। জীবের হৃদয়ে তৎ প্রকাশ মাত্রে জীব কলেবর ত্যাগের যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া স্বর্গীয় আনন্দ ভোগে প্রবৃত্ত হন। ফলে সকল জীবের যে সমান গতি, হয় তাহা নহে। কোন জীব ঈড়া নাড়ির দ্বারস্বরূপ বাম নাসারন্ধ্র দ্বারা, কোন জীব পিঙ্গলার দ্বারস্বরূপ দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা, কোন জীব বা অপরাপর দ্বার যোগে উৎক্রমণ করেন।

[ক্রমশঃ]

ভাগ

বেদব্যাস

২য় খণ্ড

মাসিক পত্র

জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩

বিষয়		পৃষ্ঠা
ছাত্র ও শিক্ষক	শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ	২৫
নব্য হিন্দু	শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার	২৮
উন্নতি কি অবনতি	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি	৩৩
সুখ ও ধর্ম্ম	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ	৩৯
মনুসংহিতা	সম্পাদক	৪২
দেবযান	শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু	৪৭

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম মেসিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও ৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলি...

শ্রীভূধর চট্টো...

প্র...

৺

বেদব্যাস।

১ম ভাগ। ১২৯৩ সাল। ২য় খণ্ড।

ছাত্র ও শিক্ষক।

প্রথম প্রস্তাব।

স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজের প্রতি আমাদিগের নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এরূপ শোচনীয় ঔদাস্য ও অনাস্থার ভাব কি কারণে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইলে তাঁহাদিগের শিক্ষার বিষয়, শিক্ষার প্রণালী, ও শিক্ষকের চরিত্রাদিই মুখ্যকল্পের কারণ বলিয়া বোধ হয়। কেননা; নূতনাকারে গঠিত কোন বস্তুর প্রকৃতিভেদ পর্য্যালোচনা করিতে গেলে, উহার বর্ত্তমান নির্ম্মাতার অভিপ্রায়, নির্ম্মাণের প্রণালী ও বর্ত্তমান উপাদান দ্রব্য গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। কিন্তু ঐ দ্রব্যের পূর্ব্বপ্রচলিত আকার কি অবস্থায়, কি প্রণালীতে, কি উপাদানে গঠিত হইত, তাহা অগ্রে আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় উহার আধুনিক প্রকারভেদের কারণ আরও সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইতে পারে। অতএব আমরা প্রাচীনগণের শিক্ষার বিষয়, শিক্ষাদাতা, ও গ্রহীতার অবস্থা প্রভৃতি একবার এই অবসরে স্মরণ করিয়া দেখিব।

কিন্তু, হায়! আমি কোন্‌দিন আজি স্মরণ করিতে যাইতেছি? সে কি-এক দিনই গত হইয়াছে, কি অমৃতময় যুগই অতীত হইয়াছে, কি পূর্ণিমার স্থিরস্নিগ্ধালোক-সমুজ্জ্বলিত কালই প্রলয়তামসীর অতলস্পর্শ অদৃশ্য গহ্বরে বিলীন হইয়াছে! সেদিন কি আর পুনর্ব্বার শুভাগমন করিবে? সে পবিত্র যুগের শিক্ষাদাতা পরমপূজ্য মহর্ষিগণের বিষয় আন্দোলন করিলে অদ্যাপি কি অপূর্ব্ব ভাবাবেগেই অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

সেই সর্ব্বসুখভোগনিস্পৃহ, আবদ্ধবল্কল, জটাভার-ভাস্বর, জ্ঞান-গম্ভীর ধ্যান-নিমগ্ন পবিত্র ঋষিমূর্ত্তি স্মৃতিমন্দিরে ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হইলেও অন্তঃকরণ ভাবপ্রবাহে উচ্ছ্বলিত হইয়া যায়। যেন সত্যের জ্যোতিঃ, দয়ার প্রবাহ তাঁহাদিগের শরীরে মূর্ত্তিমান্ দেখিতে পাই। কেন এরূপ হয়? বাক্যে যে সত্যতার অভিব্যক্তি হয়, কার্য্যে যে দয়ার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তাঁহাদিগের সর্ব্বশরীরে তাহা জড়িত বোধ হয় কেন? তাঁহাদিগের বাক্যই সত্যময়, কার্য্যই কারুণ্যপূর্ণ বোধ হয় কেন? পদার্থে ও তাহার ধর্ম্মে এরূপ অভেদ বোধ হয় কেন? বাস্তবিক অভেদ বলিয়াই অভেদ বোধ হয়। তাঁহাদিগের বাক্য হইতে সত্য পৃথগভূত হয় নাই, কার্য্যের সহিত করুণার বিচ্ছেদ হয় নাই, স্বভাবের সহিত ব্যবহারের অনৈক্য হয় নাই। তাঁহাদিগের রোষমাত্রে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত, প্রসাদমাত্রে অমৃতধারা ক্ষরিত হইত। এরূপ না হইলে তাঁহাদিগের স্মরণমাত্র সমস্ত ভারতবাসীর মস্তক অদ্যাপি সপ্রেম-সম্ভ্রমে অবনত দেখি কেন? উক্তবিধ তপস্তেজঃসম্পন্ন, বেদপারগামী মহর্ষিগণের বাক্য যে শ্রবণ করিয়াছে, তাহার আর অন্য উপদেশ বাক্য শ্রবণের প্রয়োজন কি? তাঁহাদিগের উপদেশ বাক্য যে শ্রবণ করিয়াছে, তাহার আর শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রয়োজন কি? তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার যে নিরীক্ষণ করিয়াছে, তাহাদিগের আবার তত্ত্বনির্ণয়ার্থ শাস্ত্রীয় বিধিবিচার পূর্ব্বক মস্তিষ্ক চালনা প্রয়াসের আবশ্যকতা কি? অহোরাত্র তাদৃশ গুরুর পার্শ্বচর থাকিয়া, পরিচর্য্যাচ্ছলে অনন্যমনে অনুক্ষণ তাঁহাদিগের আলাপ, আচার ব্যবহার, সঙ্কল্প উদ্যোগ, আরম্ভ, কার্য্যকলাপের অনুকরণ করিয়া ছাত্রগণ যে গুরুর প্রতিরূপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এরূপ উজ্জ্বল, নির্ম্মল, আদর্শের সতত-সমীপবর্ত্তী বস্তু যে উহাতে অবিকল প্রতিবিম্বিত হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? ফলতঃ মন্বত্রি, বিষ্ণুহারীত, বশিষ্ট-কাশ্যপাদিরূপ উল্লিখিত আদর্শ এত দূর উচ্চ যে, এ প্রস্তাবের নিমিত্ত তাঁহাদিগের এস্থলে অবতারিত করিতে ইচ্ছা হয় না। আমি দূর হইতে তাঁহাদিগের চরণে সসম্ভ্রমে প্রণতি করিয়া তাঁহাদিগের সুসন্তানদিগকে লইয়াই এ প্রবন্ধ আলোচনা করি। তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।

মহর্ষিগণের নিকট তাঁহাদিগের বংশধরগণ যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা যে সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত শিক্ষক হইবেন, তাহাতে সন্দেহ

কি? শিক্ষকে যাবতীয়গুণের আবশ্যকতা হইয়া থাকে, উক্ত পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রত্যেকে একাধারে তত্তাবৎ গুণরাশির সম্পূর্ণ সমাবেশপক্ষে কোনরূপ অসম্ভাবনা ছিল না। কারণ, পৃথক্ চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগকে উক্তরূপসম্পন্ন হইতে হইত না। ঐ সকল গুণ তাঁহাদিগের জাতীয়ধর্ম্ম ছিল। ব্রাহ্মণ জাতিকে ঐরূপ চরিত্রবান্ স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইতে হইবে, ইহাই বেদের উপদেশ। ব্রাহ্মণদিগের জাতীয় প্রকৃতি, জাতীয় গঠনই ঐরূপ। তাঁহাদিগকে জীবিকার নিমিত্ত ঐরূপ সাজিতে হইত না, বা ঐ প্রকার ভিন্ন ব্রাহ্মণজাতির পৃথক্রূপ জীবিকা ছিল না। তাঁহাদিগের পুরুষানুক্রমে উক্তরূপ হওয়াই স্বভাব এবং উহাই জীবিকা। তাঁহাদিগের তপস্তেজঃ স্বাধ্যয়-সংস্কার চারিত্র-মাহাত্ম্য শুক্রশোণিতের ন্যায় বংশেরংশে, শাখায় শাখায় সংক্রামিত হইত। উপদেশ পরম্পরা কর্ণ হইতে কর্ণে, হৃদয় হইতে হৃদয়ে, প্রচারিত হইত।

আর আধুনিক শিক্ষক ও ছাত্রবর্গকে আমরা কিরূপ দেখিতে পাই? দেখিতে পাই শিক্ষকেরা জীবিকানির্ব্বাহার্থ শিক্ষকতাব্যবসায়ী হইয়াছেন এবং ছাত্রেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত ছাত্র হইয়াছেন। শিক্ষক হয়তো মুখে যেরূপ উপদেশ দিতেছেন, কার্য্যে কখনও সেরূপ আচরণ করেন নাই; এবং ছাত্র যাহা শুনিতেছেন, তাহা হয় ত তাঁহার লিপি পুস্তিকাতেই অঙ্কিত রহিয়াছে, ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত অভাবে তদীয় চিত্তে কখনও তাহা অঙ্কিত হইতেছে না। যে ভক্তি বা করুণরসপূর্ণ প্রবন্ধ শিক্ষক পড়াইতেছেন ও ছাত্র পড়িতেছেন, তাহাতে হয় ত কাহারই হৃদয়ে আ-তট পূর্ণ করিয়া ভাব-প্রবাহ প্রধাবিত হইতেছে না। হৃদয়স্পর্শী গভীর ধর্ম্মবাক্যও হয়তো শিক্ষকের গুণে শুকভাষিতের ন্যায় তাঁহার মৌখিক বাক্যমাত্রে পরিণত হইতেছে, শিক্ষকের কণ্ঠনালী হইতে বহির্গত হইয়া শূন্যের সহিত শূন্য হইয়া মিশিতেছে। সত্তাবিশিষ্ট হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে কোন কার্য্য বা ভাব উৎপাদনে সমর্থ হইতেছে না। এরূপ হইবার কারণও দুর্লভ নহে। বিবেচনা করুন, উক্ত শিক্ষক হয়তো চাণ্ডাল অথবা তাদৃশ কোন অন্ত্যজাতীয় হইবেন। তিনি শৈশব হইতে জাতীয় নীচ ব্যবসায় স্পর্শ না করিয়া বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেপ। শিক্ষা তাঁহার হৃদয়ে সহজাত ভাবে সংক্রামিত হয় নাই, বেশভূষাদি-গত বাহ্য সভ্যতা সাধনেই বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে। এরূপ স্থলে উক্তবিধ শিক্ষক, যাঁহার নিজ শিক্ষা বেশভূষার ন্যায় বহির্ভাগ সাজাইতেই উপযোগী হইয়াছে,

হৃদয়ের অভ্যন্তরে আত্মীয়ভাব ধারণ করে নাই, কোন পূর্ব্বপুরুষাগত সংস্কারসূত্রে ও যাহা কখন তাহার হৃদয়ে উন্মেষিত হইবার সম্ভাবনা নাই, সেইশিক্ষা কিরূপে তিনি পরকীয় হৃদয়ে কার্য্যকররূপে সংক্রামিত করিবেন ? আবার অনেক ছাত্রেরও হয়তো শিক্ষকের উপদেশ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে তথাবিধ কারণ থাকিতে পারে। অপিচ, ছাত্রেরা হয়তো অনেক সময়েই শিক্ষকের বাক্যের সহিত তাহার কার্য্যের, তাঁহার উপদেশের সহিত তাঁহার নিজ ব্যবহারের অসামঞ্জস্য দেখিয়াছে। কেমন করিয়া তাহারা শিক্ষকের প্রতি সমুচিত ভক্তি উপহার দিবে ? অন্তঃকরণ আপনা আপনি যাহা করিতে প্রস্তুত নহে, সভ্যতার অনুরোধ তাহাকে কতদূরই বা সাজাইয়া সর্ব্বদা দেখাইতে পারে ? এইরূপে ছাত্রমণ্ডলীর গুরুভক্তি নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অল্প হইয়া পড়িয়াছে যে প্রকৃত গুরুভক্তি কিরূপ পদার্থ তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে, তাঁহারা একরূপ অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। এইরূপ গুরুভক্তির অভাববশতই, পূজ্যপাদ মহর্ষিকুলের প্রতি আমাদিগের যে পরম্পরাগত ভক্তিস্রোতঃ সংস্কারবদ্ধরূপে চলিয়া আসিতেছে, তাহারা তাঁহাদিগকে সেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠিত। অধিক কি, তাঁহারা জ্ঞানগুরু মহর্ষিগণের বাক্যেও সমুচিত সমাদর ও বিশ্বাস স্থাপন করিতেও প্রস্তুত নহেন। প্রস্তুত না হউন, কিন্তু তাঁহাদিগের আধুনিক গুরুর প্রতি প্রদর্শিতরূপ ভক্তির অল্পতাবশতঃ তাঁহাদিগের বর্ত্তমান কালীন শিক্ষার প্রকৃত ফলও যে বহুপরিমাণে ন্যূন হইতেছে; তাহাতে বোধ হয় কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বিরুক্তি করিবেন না।

নব্য হিন্দু।

নব্য হিন্দু মহাশয়েরা এক নব্য মত উদ্ভাবন করিয়াছেন। নব্য হিন্দু বলেন—"শাস্ত্রের যে অংশ যুক্তির সহিত মিলে; সেই অংশ গ্রহণীয়। তদ্ভিন্ন অন্য অন্য সমস্ত শাস্ত্রোক্ত কথাই বর্জ্জনীয়।" অর্থাৎ শাস্ত্র যুক্তির উপর অবস্থিত। শাস্ত্র; শাস্ত্র বলিয়া মান্য নহে। শাস্ত্র যুক্তিযুক্ত বলিয়াই সকলের আদরণীয়। এই নব্য হিন্দু মহাশয়দিগের নিকট আমার দুই একটী জিজ্ঞাস্য আছে।

১ম। নব্য হিন্দুর সহিত ব্রাহ্মের প্রভেদ কি ? ব্রাহ্মও যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন। যেখানে শাস্ত্র যুক্তিমার্গানুযায়ী, সেখানে ব্রাহ্মও শাস্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। ব্রাহ্ম জাতিভেদ মানেন না। কারণ জাতিভেদ শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও তাঁহাদের মতে যুক্তিবিরুদ্ধ। অতএব জাতিভেদ না মানিলেও হিন্দুত্বের ব্যাঘাত হয় না। এইরূপে বেদ পুরাণ কীর্ত্তিনাশায় ভাসাইয়া দিয়াও হিন্দু হওয়া যাইতেছে। কারণ শুনিতেছি যে, যুক্তিই হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি। অনুষ্ঠানাদি না করিয়াও হিন্দু হওয়া যাইতে পারে। কারণ কেহ বলিতে পারেন যে অনুষ্ঠান শাস্ত্রবিহিত হইলেও যুক্তিবিহিত নহে।

২। যুক্তি অর্থে কাহার যুক্তি ? হিন্দুর যুক্তি না অহিন্দুর যুক্তি ? "বেদ হিন্দুধর্ম্মের মূল"। এই তত্ত্ব আপনার যুক্তিতে মিলিল। আমার যুক্তিতে মিলিল না। এক্ষণে কাহার যুক্তি গ্রহণীয় ? কাহার যুক্তিই বা বর্জ্জনীয় ? রমেশ দত্তের যুক্তিতে বেদের সময়ে জাতিবিভাগ ছিল না। সায়ণাচার্য্যের যুক্তিতে ছিল। এক্ষণে রমেশ দত্তের যুক্তিই গ্রহণীয়, কি সায়ণাচার্য্যের যুক্তিই গ্রহণীয় ?

৩। যদি যুক্তিই সকল বিষয়ের শেষ মীমাংসা করে, তবে আর শাস্ত্রের প্রয়োজন কি ? যাহা যুক্তিযুক্ত, তাহা শাস্ত্রে না থাকিলেও শিরোধার্য্য। আর যাহা অযৌক্তিক তাহা শাস্ত্রে বারম্বার থাকিলেও অগ্রাহ্য। ফলতঃ ধর্ম্মার্থীর দুইটী পথ মাত্র বিদ্যমান আছে। হয় পূর্ণমাত্রায় যুক্তি মানুন, শাস্ত্রাদির বিচারে প্রয়োজন নাই। নয় পূর্ণ মাত্রায় শাস্ত্র মানুন, যুক্তি তর্কের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাঁহারা কতক যুক্তি মানিয়া কতক শাস্ত্র মানেন, তাঁহাদের চরিত্র আমার নিকট নিতান্তই দুর্ব্বোধ্য।

৪। যুক্তির একমাত্র প্রয়োজন এই যে, শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যে যৌক্তিক; ইহা পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তবে ঐ সিদ্ধান্তের অর্থ কি; উদ্দেশ্য কি প্রভৃতি বুঝিবার জন্য যুক্তি ও তর্কের প্রয়োজন হয়। যে যুক্তি দ্বারা নূতন সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়, সে যুক্তি যুক্তি নহে। যে যুক্তি দ্বারা শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্টীকৃত বা দৃঢ়ীকৃত হয়, সেই যুক্তিই যুক্তি। নব্য হিন্দু মহাশয়েরা যুক্তির সাহায্যে নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহেন। যদি শাস্ত্রের যুক্তিও না মানেন

যদি হয় অসৎ কথা, ঘুমেতে চিরয়ি তথা,
শুনিতে বাড়য়ে কত রতি।
নীচ সঙ্গে সদা বাস, সাধুজন দেখি হাস,
কুলটা বন্দিয়ে নিন্দ সতী॥ ইত্যাদি।

আমরা অনেক বার হিন্দুধর্ম্মের আংশিক পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি। কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি যে, এই পরিবর্ত্তনে কখনও কুফল ভিন্ন সুফল লাভ হয় নাই। রামমোহন রায় বেদ বেদান্ত মানিতেন, কিন্তু পুরাণ মানিতেন না। তিনি বলিতেন, বেদ যৌক্তিক কিন্তু পুরাণাদি অযৌক্তিক। দেখুন রামমোহন রায়ের ধর্ম্মের কি পরিণাম হইল। পুরাণ ত অগ্রেই গিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে বেদ বেদান্তও গেল। এক্ষণে নব্যহিন্দু মহাশয়েরা বলিতেছেন, বেদ কিছু নয়, পুরাণ বড় মহদ্দ্রব্য। বেদ ত গেলই। ইহাদের পরবর্ত্তী মহাশয়েরা বলিবেন যে, পুরাণও কিছু নয়। ফলতঃ হিন্দুধর্ম্ম একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ স্বরূপ। বেদ ইহার মূল, উপনিষদাদি ইহার কাণ্ড, স্মৃতি ইহার শাখা, পুরাণ ও ইতিহাস ইহার পুষ্প-ফল। ইহাদের একের উন্নতিতে অন্য সকলের উন্নতি, একের অবনতিতে অন্য সকলের অবনতি। যদি হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাংশে রক্ষা করিতে হইবে। আর যদি ইহার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকে, তাহা হইলে অন্য বৃক্ষ রোপণ করুন। কিন্তু এই জরাজীর্ণ বৃক্ষের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া ইহার দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি করিবেন না।

৫। কেহ বলেন যে যখন শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ দৃষ্ট হয় তখন, কোনশাস্ত্র মানিব না। এতদুত্তরে আমরা বলি যে, মূল কথার শাস্ত্রে শাস্ত্রে কুত্রাপি বিরোধ নাই। যেখানে যেখানে বিরোধ আছে, সেখানে শাস্ত্রকারেরাই সেই বিরোধের ভঞ্জন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য দেব বলিয়াছেন

"প্রভু কহে শ্রুতি স্মৃতি মুনি ঋষিগণ।
সব একমত, নহে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম॥"

আমাদের ও ইহাই বিশ্বাস। হিন্দুমাত্রেরই এইরূপ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। আমরা যুক্তি যুক্তি করিয়া বহুকাল মরীচিকার অনুসরণ করিয়াছি। সম্মুখে পবিত্র, শীতল হিন্দু-সরোবর। ঐ সরোবরে স্নান ও অবগাহন করিয়া আপনাকে ও নিজ সমাজকে কৃতার্থ করুন। বৃথা কথায় প্রলোভিত হইয়া বিড়ম্বিত হইবেন না।

উন্নতি কি অবনতি?

প্রথম প্রস্তাব।

শিষ্য। মহাশয়! কএক বৎসর হইতে, একটি বিষয় লইয়া, আমার মনে একটা গুরুতর আন্দোলন যাইতেছে, কিন্তু নিশ্চয় মীমাংসা কিছুই হয় না, তাই আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই বিষয়টির মীমাংসা করিয়া দিলে পরম পরিতৃপ্ত হই।

আচার্য্য। মীমাংসার প্রতিশ্রুত হইতে পারি না, তবে তোমার আলোচনীয় বিষয়টি শুনিলে, উত্তর প্রদানে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিব।

শিষ্য। বর্ত্তমান শতাব্দীতে (১৯ শতাব্দী) আমাদের দেশের (ভারতবর্ষের) উন্নতি অবনতি লইয়া, একটা তুমুল গোলযোগ উপস্থিত, কারণ এক এক সম্প্রদায় এ বিষয়ে এক এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া, সকলেই আপনাপন পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

(১ম) অনেক ভদ্র সন্তানগণ বলিয়া থাকেন যে, "শুক্লপক্ষের চন্দ্রমা যেরূপ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, ভারতবর্ষ ও সেইরূপ প্রতিদিন উন্নতি-কলা গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে সৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষে যে কদর্য্য ও অধোগত অবস্থা ছিল, তাহা মনুষ্য সমাজে ব্যক্ত করিতেও আত্মগ্লানি ও লজ্জাকর বলিয়া মনে হয়। ভারতের বহুল সৌভাগ্যে সেই চিরন্তন অন্ধকার দূর ভূত হইয়াছে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার অবধিই ভারতের শুক্লপক্ষ প্রারম্ভ হইয়াছে।"

(২য়) আবার আর কতকগুলি ভদ্রলোক বলেন,—"ভারতবর্ষে এখন উন্নতি হইতেছে সত্য, কিন্তু এই উন্নতি পূর্ব্বকালাপেক্ষায় অধিক নহে, কারণ পূর্ব্বকালেও ভারতের বিশেষ উন্নতিই ছিল, কিন্তু মধ্য সময়টাতে মুশলমানদের কিছু পূর্ব্ব সময় হইতে ঘোর অবনতি হইয়াছিল, এখন তাহা হইতে অনেক উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে।"

(৩য়) আর একদল বলেন,—"উন্নতি পূর্ব্বেও ছিল না, এখন হয় নাই, প্রকৃত উন্নতি যে কখনও হইতে পারে এমত বিশ্বাসও নাই, তবে যদি হয় তাহা ভবিষ্যদ্গর্ভে বাস করিতেছে।"

(৪র্থ) আবার অনেকানেক ভদ্রলোকগণ, সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা বলেন, "এইক্ষণে ভারতবর্ষ দিন দিনই ঘোর অবনতি

সাগরের গম্ভীরতলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে, পূর্ব্বকালেই ভারতবর্ষের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল।"

এতদ্ব্যতীত ও এবিষয়ে অনেক প্রকার মত আছে। এই সকল পরস্পর বিরুদ্ধ মত সমর্থক লোকদিগের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আপনাপন পক্ষের সমর্থক নানা প্রকার প্রমাণ, প্রয়োগ ও উদাহরণাদি প্রদর্শিত করাইয়া থাকেন। এইরূপ, পরস্পর বিরুদ্ধ নানা প্রকার মতের দ্বারা আমার চিত্ত সমাকুলিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে কোন্‌টি সত্যমত, আর কোন্‌টি অসত্য বা ভ্রান্ত, তাহা নির্ণয়ে আমি অসমর্থ, অতএব এবিষয়ে আপনার কি মত তাহা জানিতে ইচ্ছা।

আচার্য্য। আমার যাহা বিবেচনা হয় তাহা বলিতেছি, কিন্তু তুমিও আরও একটু চিন্তা করিয়া দেখিও তবেই বোধ হয় একটু পরিষ্কার হইতে পারিবে,—আমার বিবেচনা হয় যে উন্নতি এবং অবনতি প্রত্যক্ষ করার বস্তু, সুতরাং উহা পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মাদির ন্যায় অনুমান করিতে হয় না, উন্নতি হইলেও সকলেই দেখিতে পায়, অবনতি হইলেও সকলেই দেখিতে পায়, অতএব অন্য কোন পরিদৃশ্যমান বস্তুর উপর যেমন অস্তি নাস্তি বিবাদ হওয়া অসম্ভব, উন্নতি অবনতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। তবে অবশ্যই, একটি লোক সন্দর্শন করিলে যেরূপ, সেই লোকটি সত্য হইলেও, তাঁহার রূপ, লাবণ্য, গুণগরীমা প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক কল্পনাগুলি ভ্রান্তিও হইতে পারে, সেইরূপ উন্নতি অবনতিরও অনেকগুলি অঙ্গ কল্পনায় ভুল হইতে পারে, কিন্তু সমূলেই মিথ্যা হওয়া অসম্ভব। এবং যে যে অংশে পরস্পরের ভ্রান্তি আছে, সেই সেই অংশ লইয়া বিবাদও হইতে পারে, কিন্তু একবারে ষোল আনা অংশের বিবাদ হওয়া অসম্ভব। তবে যে ঐরূপ বিবাদ হইতে দেখা যায়, উহার বোধ হয় বিশেষ একটি কারণ আছে। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, কথার অর্থের পার্থক্য থাকাই পরস্পর বিবাদের কারণ হইয়া থাকে; সেইখানে একটি কথাকেই দুজন দুই অর্থে ব্যবহার করেন, কিন্তু কাহারই মনোগত অর্থ কাহাকেও পরিষ্কার করিয়া বলা হয় না, সুতরাং উভয়েই ধরিয়া লয়েন যেন উভয়েই সেই কথাটির একার্থই বুঝিতেছেন, এবং একজন অপরের মত খণ্ডন করিতে থাকেন, সুতরাং তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। মনে কর "আইডোলেটরি" একটি ইংরাজী কথা, এই কথাটির তাৎপর্য্যার্থ,—পুতুলকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করা। বাঙ্গালী ইংরাজি

অধ্যয়ন করিয়া ঐ কথাটি শিখিতে পাইলেন, এবং তাহা হইতে "পৌত্তলিকতা" কথার সৃষ্টি করিলেন। এদিকে ভারতবর্ষের প্রতি গৃহেই কালী দুর্গা প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তিতে পূজা করিতে দেখিতেছেন, সুতরাং এইরূপ পূজা করাকে, তিনি আপন কল্পিত পৌত্তলিকতা অর্থে স্থির করিয়া, তাহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ যোগ করিতে লাগিলেন। অবশ্যই পুতুলকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করা নিতান্ত অযৌক্তিক ও শাস্ত্র বিরুদ্ধও বটে। আবার একজন হিন্দু ঐ পৌত্তলিকতা কথাটি হিন্দুর কালী পূজার অর্থাৎ মৃত্তিকাদি রচিত প্রতিমার অধিষ্ঠানে ইচ্ছাময় সগুণ ব্রহ্মের পূজা করা অর্থে ধরিয়া লইলেন, সুতরাং তিনি তখন মনে করিতে লাগিলেন এই দুরাত্মাগণ বিদ্বেষ করিয়া আমার ব্রহ্মময়ী শ্যামার পূজাকেই নানা প্রকার নিন্দা করিতেছে, কিন্তু তিনি যে এ পর্য্যন্ত কখনই মৃত্তিকাময় পুতুলকে পূজা করিতেছেন না, পরাপর ব্রহ্মস্বরূপা আদ্যাশক্তিকেই অর্চ্চনা করিতেছেন, সুতরাং পুতুল পূজার নিন্দাবাদ তাঁহার কালী পূজাকে স্পর্শ করিতেও পারে না, তাহা একবার মনে করিয়াও দেখিলেন না, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুদিগের প্রচলিত এরূপ সাকার বা সগুণ ব্রহ্ম উপাসনা শাস্ত্রও যুক্তিসিদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার মৃৎকাষ্ঠাদি ময় মূর্ত্তিকেই ঈশ্বরভাবে উপাসনা, ভ্রান্তিমূল ও নিন্দিত তাহাও সত্য অথচ ঘোর বিবাদ উপস্থিত। এখন বুঝিবার দোষে হিন্দুও অন্য কর্ত্তৃক 'আইডোলেটার' অর্থাৎ মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত পুতুলপূজক প্রভৃতি কথায় অভিহিত হইতে লাগিলেন। অথচ কোন হিন্দুই কিন্তু ওভাবে কালী পূজা করেন না। আবার হিন্দু মনে করিতেছেন যে, আমার সগুণ ব্রহ্ম উপাসনাকেই বুঝি বিপক্ষেরা খণ্ডন করিতেছে অতএব উহারা পাষণ্ড দুরাত্মা। এস্থলে এক পৌত্তলিকতা কথাই উভয়ে ভিন্নরূপ বুঝিলেন, সুতরাং বিবাদ বাধিল।

আরও দেখ, বিলাতি 'কাষ্ট সিষ্টম' আর আমাদের 'জাতিভেদ' দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস। অর্থাৎ বিলাতি "কাষ্ট সিষ্টম" ব্যবসায়ীর শ্রেণীভেদ, আর হিন্দুদের "জাতিভেদ" প্রাকৃত পদার্থ। কিন্তু অনেকগুলি ভদ্র সন্তান সেই প্রাকৃত জাতিভেদকেই কাষ্ট সিষ্টম অর্থে ব্যবহার করিয়া, তাহার অবাস্তবিকতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। এদিকে হিন্দুগণ, সেই কাষ্ট সিষ্টন খণ্ডণের দ্বারা "আমাদের জাতিভেদ খণ্ডিত করিতেছে" মনে করিয়া নব্যদিগকে

জাতিভেদের ঘোরতর বৈরী মনে করেন। এইরূপ আরও শত শত স্থানে ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান বিবাদ স্থলীয় উন্নতি অবনতি সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটনাই হইয়াছে, উন্নতি অবনতি কথাটিরও অর্থ সম্বন্ধে বোধ হয় গোলযোগ আছে, বিবাদকারী সকলেই ঠিক এক অর্থ মনে করিয়া উন্নতি অবনতি কথা ব্যবহার করেন না, একদল যে অর্থে উন্নতি কথা ব্যবহার করেন, আর একদল হয়ত ঠিক সেই অর্থেই অবনতি কথা ব্যবহার করেন, অথচ ঐ মনোগত অর্থ কেহই কাহাকে ব্যক্ত করেন না, তাই এত গোলযোগ, বিবাদ। সেইটা বুঝাইয়া দিলেই বোধহয় আর কোন বিবাদ থাকে না, কারণ আপন আপন মনোগত অর্থে বোধহয় সকলের উন্নতি অবনতিই সত্য; মিথ্যা কাহারও নহে। অতএব তুমি সেই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, যে উন্নতি অবনতি কথাটি, তাঁহারা কে কোন্ অর্থে ব্যবহার করেন। তৎপর আমার নিকট বল, তাহা হইলেই বোধ হয় বিবাদ মীমাংসা হইবে।

শিষ্য। (জিজ্ঞাসানন্তর আচার্য্যের নিকট) আমি প্রত্যেক সংপ্রদায়ের নিকটই কথিত বিষয় জিজ্ঞাসিয়া ছিলাম, তাঁহারা প্রত্যেকেই উন্নতি অবনতির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বলিলেন।

আচার্য্য।—কে কি বলিলেন বল দেখি?

শিষ্য। যাঁহারা সৃষ্টি সময় অবধি চিরদিন পর্য্যন্ত ভারতের ঘোর অবনতি এবং ১৯ শতাব্দীতেই উন্নতি হওয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকেই উন্নতি বলেন,—

(১ম) স্থানে স্থানে যথাযোগ্য কলেজ, স্কুল, পাঠশালা, বালিকা ও স্ত্রীবিদ্যালয়ের বিস্তার এবং তাহাতেও অন্য কথায় ইংরেজী পুস্তকের পাঠশিক্ষা।

(২য়) ইংরাজী কথাগুলি ঠিক ইংরাজদের মত বলিতে পারা চাই, এবং ইংরাজী লেখার ধরণ ধারণটি বিশেষ পরিপক্ক ও বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক, হাতের লেখাটিও সুশ্রী থাকা উচিত।

(৩য়) ইংরেজী ভাষায় এরূপ শিক্ষার প্রয়োজন যে, কোন প্রকার মনের ভাব ব্যক্ত করিতেও যেন না ঠেকে এবং শয়নে স্বপ্নে ও মনে ইংরাজীর উদয় হওয়া চাই।

(৪র্থ) ইংরাজী পরিচ্ছদ, ভাবভঙ্গী, আহার, চাল, চলন, অর্থাৎ স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রীর অনাবরণ প্রথা, স্বাধীন বিবাহ, যৌবনকাল বা যৌবনান্তে বিবাহ, স্বেচ্ছাক্রমে পতি ও স্ত্রী পরিত্যাগ, অমিশ্রিত পরিবারতা, বিধবা ও সধবা দিগের পুনঃ পুনঃ পুরুষান্তর গ্রহণ,—ইত্যাদি বিষয়গুলির যতদূর সম্ভবে অনুকরণ করা।

(৫ম) আহার, বিহার ও পানাদি বিষয়ে কোন প্রকার বিচার, বিতর্ক না থাকা, ইত্যাদি। ইহাই প্রথমোক্ত লোকদিগের উন্নতি এবং ইহার বিপরীতই অবনতি।

আচার্য্য।—এই সকল আচার ব্যবহারাদি যদি উন্নতি কথার অর্থ হয়, তাহা হইলে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বতন-তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি মাত্রেই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে এইরূপ উন্নতি অতি অভিনব সামগ্রী, ভারতবর্ষের সৃষ্টি অবধি ইহা কখনই ছিল না, প্রত্যুত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থারই প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং এই মতে যাহাকে অবনতি বলেন তাহাই ইতঃপূর্ব্বে ছিল। এখন দেখ এইরূপ উন্নতি বাদীদিগের সহিত, পৃথিবীতে কাহারও বিবাদ হওয়ার কোন কারণ নাই। এখন দ্বিতীয় সংপ্রদায়, কাহাকে উন্নতি অবনতি বলেন তাহা বল।

শিষ্য।—যাঁহারা অধঃপাত সময় মুসলমানাদির কাল হইতে এখন উন্নতি স্বীকার করেন,—কিন্তু একবারে পূর্ব্বকাল হইতে নহে, তাঁহারা লেখা পড়া শিক্ষা অর্থাৎ প্রাকৃত বিজ্ঞান, রসায়ণ বিজ্ঞান, ও শারীর বিজ্ঞানাদি নানা প্রকার বাহ্য বিজ্ঞান শিক্ষাকেই উন্নতি শব্দে ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং ইহার বিপরীত অবস্থাকে অবনতি বলে।

আচার্য্য। এই মতেও কাহার সহিত বিবাদের কোন কারণ দেখি না। কেননা, ইহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজদের ঠিক পূর্ব্ব সময় অপেক্ষায় এখন প্রাকৃত বিজ্ঞানাদির শিক্ষা যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় যে মুসলমান শাসন সময়াবধি ভারতে বিজ্ঞানশাস্ত্র কাহাকে বলে তাহারও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না, তখন কেবল উপন্যাস ও নীতি সম্বলিত পারসি, উর্দু, প্রভৃতি ভাষা শাস্ত্রশিক্ষা করা হইত। সুতরাং এবিষয়ে এখন, তখন অপেক্ষায় সহস্রগুণ বৃদ্ধি

হইয়াছে তাহা অসন্দিগ্ধ। দুজনের বিবাদ মীমাংসিত হইল, এখন তৃতীয় সম্প্রদায়, উন্নতি অবনতির কি অর্থ করেন, বল।

শিষ্য।—তৃতীয় সম্প্রদায় বলেন প্রত্যেক মনুষ্যের সর্ব্বাংশে সুখ হওয়াই উন্নতি শব্দের অর্থ, যখন ভারতবর্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির কি দৈহিক কি মানসিক, কি সাংসারিক, কোন প্রকার অসুখ অসচ্ছন্দতা বা অভাব না থাকিবে তখনই পূর্ণ উন্নতি হইল। কিন্তু তাহা যে কখনও হইয়াছে এমত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং বর্ত্তমান সময়েও নাই, তাহা সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং এখন কিম্বা কখনও প্রকৃত উন্নতি হয় নাই। সময় সময় আপেক্ষিক কিছু কিছু উন্নতি হয় ইহাও বলাযায় না কারণ, এক এক সময়ের পরিবর্ত্তনের লোকের কতকগুলি করিয়া অভাবের বিমোচন হয় বটে, কিন্তু আর এক দিকে আবার ততগুলি অভাবই হইয়া আইসে, সুতরাং অবনতি ও উন্নতির মাত্রা প্রায় সমানই থাকে; মনে কর, এই উনবিংশ শতাব্দীতে যদি আমাদের অনেকগুলি অভাব মোচন হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষায় কিছু অধিকতর সুখ হইয়া থাকে, তবে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এখন আমাদের অন্যান্য বিষয়ে, পূর্ব্বাপেক্ষায় অনেকগুলি অভাবও বৃদ্ধি পাইয়াছে, সুতরাং হ্রাস বৃদ্ধির তুলনা করিলে, উন্নতি অবনতি না দেখিয়া সংসারের এক অবস্থাই মনে হয়।

আচার্য্য। এই কথাগুলি কি তুমি অস্বীকার কর? আমি বিবেচনা করি, হৃদয়বান্ লোক মাত্রেই ইহা অনুমোদন করিবেন অতএব এই মতের সহিতও কোন বিবাদ দেখা যায় না, এখন চতুর্থ সম্প্রদায়ের মনোগত অর্থ কি তাহা বল।

শিষ্য। চতুর্থ সম্প্রদায় বলেন যে, অন্তঃসার বৃদ্ধি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সারবত্তার বৃদ্ধিই মনুষ্যের উন্নতি, এবং সেই বৃদ্ধির পরাকাষ্ঠাই উন্নতি-পরাকাষ্ঠা। আরোগ্য, দীর্ঘায়ু, বল, মেধা, বীর্য্য, সাহস, স্বাধীনতা, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, সৌভাগ্য, বিদ্যা এবং যতপ্রকার সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও পরম শান্তি, ইহকাল ও পরকালে সম্ভবে, তৎসমস্তই মনুষ্যের অন্তঃসার বৃদ্ধি স্বরূপ উন্নতির ফল; যদি মনুষ্যের অন্তঃসারবত্তা বা আধ্যাত্মিক সত্তা কিছুই না থাকে, তবে উক্ত প্রকারের কোন প্রকার ফলই তাহার ভাগ্যে ঘটে না। অন্তঃসার শূন্য বৃক্ষগুলি যেমন বাহিরে সেই সারবান্ তরুরাজির ন্যায়ই পত্রপুষ্পাদি দ্বারা পরিশোভিত হয় বটে, কিন্তু বহুকাল স্থায়িত্ব হয় না, আবার প্রবল বাত্যার আঘাত লাগিলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়,—কিন্তু সারবান্ বৃক্ষের যদি বাহিরের শ্রীবৃদ্ধি তাদৃশ নাও থাকে, তথাপি বহুকাল স্থায়ী ও অত্যন্ত আঘাত সহ্য হইয়া থাকে। অসার মনুষ্য এবং অন্তঃসারবান্ মনুষ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ হইয়া থাকে। অতএব অন্তঃসার বা আধ্যাত্মিক সারবত্তার বৃদ্ধিই মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি; আর অন্তঃসার না থাকিলে বাহিরে যত প্রকার শ্রীবৃদ্ধিই দেখ না কেন, তৎসমস্তই অবনতির মধ্যে পরিগণিত।

শিষ্য। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ অন্তঃসারবত্তা ছিল, উন্নতি ছিল, এইক্ষণে দিন দিনই ভারত অন্তঃসার বিহীন হইতেছে, ইহাই অবনতি। চতুর্থ সম্প্রদায় এইরূপে উন্নতি অবনতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু মহাশয়! অন্যান্যের কথাগুলি যেরূপ সহজে বুঝিয়াছিলাম এ কথাগুলি তেমন নহে, অন্তঃসার ও আধ্যাত্মিকসার প্রভৃতি কথার মর্ম্ম আমি বুঝিতেই পারিলাম না, আপনি বোধ হয় অবশ্যই বুঝিয়াছেন?

আচার্য্য। বোধ হয় কিছু বুঝিয়া থাকিব।

শিষ্য। তবে অনুগ্রহ প্রকাশে এই চতুর্থ মতটির মর্ম্ম, আমাকে বুঝাইয়া দিন, তৎপর পূর্ব্বকথিত বিবাদ বা বিরোধের মীমাংসা জানার আশা থাকিল।

সুখ ও ধর্ম্ম।

মৃগের নাভিদেশে যখন কস্তুরিকা উৎপন্ন হয় তখন সে অতি চঞ্চল হয়। সে যে কেন চঞ্চল হইল সে নিজে তাহা বুঝিতে পারে না। তাহার এ চাঞ্চল্য বাহিরের কোন কারণবশতঃ হয় নাই। তাহার নাভিকোষে যে কস্তুরিকা জন্মিয়াছে তাহার অপূর্ব্ব সৌরভে যে তাহার প্রাণ মাতিয়া উঠিতেছে সে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। ঐ গন্ধ কোথায়? এই মনে করিয়া সে ঐ গন্ধের জন্য সবেগে চারি দিকে ধাবিত হয়—যে দিকে যায় তথাকার কুশমূলাদি উৎপাটিত করিয়া আঘ্রাণ করিতে থাকে। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ কোন দিকের কুশমূলাদিতে সে গন্ধ মিলিল না। সে গন্ধ মিলে না তথাপি সে সবেগে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে অবিবেকী মৃগ জানে

না যে জন্য তাহার প্রাণ মাতিয়াছে উহার মূল কোথায়। নির্ব্বোধ মৃগ যদি জানিত বাহিরের গন্ধে তাহার মন মত্ত হয় নাই উহা অন্তরের গন্ধ, উহার মূল অন্তরেই অর্থাৎ স্বহৃদয়েই ব্যাপ্ত রহিয়াছে তাহা হইলেই সে অত চঞ্চল হইত না। বিরলে নিশ্চিন্ত হইয়া অন্তরের গন্ধ অনুভূত করিয়া সুখী হইতে পারিত ও ভয়ানক ব্যাধ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হইত না।

বুদ্ধিহীন মৃগের ন্যায় অবিবেকী মানবও ব্যাকুল হইয়া বিষয়ারণ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। তাহার ব্যাকুলতার কারণ সুখ। সুখের কস্তুরিকা কোথায় লুক্কায়িত আছে সে তাহা জানে না। অনুক্ষণ সুখের অন্বেষণে বিষয়-রাজ্যে পাগল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—সুখ পায় না শান্তিও আইসে না। তাহার প্রাণ কোন্ সুখের জন্য ব্যাকুল তাহার মূলই বা কোথায় শাস্ত্রকর্ত্তাগণ তাহা যেরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া গিয়াছেন আমাদের যথাশক্তি তাহার সমালোচনা করিব।

মহামুনি কনাদ স্বকীয় বৈশেষিক দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রে বলিয়াছেন, “যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।” যাহা হইতে অভ্যুদয় অর্থাৎ স্বর্গাদি যাহা হইতে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ অপবর্গ লাভ হয় তাহার নাম ধর্ম্ম। তন্মধ্যে স্বর্গাদি সাধন যাগদানাদিজ লক্ষণ ধর্ম্ম; নিঃশ্রেয়স সাধক ধর্ম্ম অষ্টাঙ্গ যোগ-জনিত। এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম বুদ্ধিধর্ম্ম। অন্তরেই এই ধর্ম্মের মূল বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ধর্ম্ম হইতেই প্রকৃত সুখ যাহা তাহা চিনিতে না পারিয়া মানুষ বিষয়-রাজ্যে অনুক্ষণ পরিভ্রমণ করে। দুঃখের অন্ত ও পরমাভ্যুদয়ের বিকাশ কাহার না প্রার্থনীয়? কিন্তু তাহার মূল কোথায় মনুষ্য তাহা খুঁজিয়া না পাইয়া বিবিধ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়েরই সেবা করে ও পরিশেষে শ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত হয়। মনুষ্য যদি উহার আভ্যন্তরিক ভেদ বিশেষ জানিত তবে সুখ পিপাসায় আকুল হইয়া ঐরূপ ভ্রমণ করিত না।

প্রকৃত সুখ কি ও কি অনুষ্ঠানে তাহা লাভ করিতে হয় এ বিষয়ে শাস্ত্র বারংবার উপদেশ প্রদান করিতেছেন। যিনি প্রকৃত অধ্যবসায়শীল তিনিই সেই উপদেশানুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে ও তল্লভ্য ফলের অধিকারী হইতে পারেন। যাঁহারা শাস্ত্রীয় ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকেন তাহার মধ্যে অনেকেই অতি ক্লেশকর বলিয়া অত্যল্প দূর যাইয়াই প্রতিনিবৃত্তি হয়েন। যাহা কিছু পরিশ্রম তাহা নারিকেলের খোষা ছাড়াইতে ও তাহা আস্বাদন করিতে পর্য্যবসিত হয় অভ্যন্তরে যে অপূর্ব্ব অমৃতোপম রস বিদ্যমান আছে তাহার

তাঁহারা অধিকারী হইতে না পারিয়া শাস্ত্রের নিন্দা বা শাস্ত্রকে অসত্য বলিয়া ঘোষিত করেন। অনভিজ্ঞ লোকেরা যেমন নারিকেলের ত্বক্ (ছোবড়া) লইয়া ব্যস্ত হইয়া অভ্যন্তরের পীযুষ তুল্য জল অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিত্যাগ করে, সেইরূপ শাস্ত্রীয় কার্য্যকলাপের যাহা বাস্তবিক মর্ম্ম, অনভিজ্ঞ লোকেরা তাহা বুঝিতে না পারিয়া, আপাততঃ কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার রস অবগত হইতে না পারিয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্মকলাপাদি বিষয় হইতে বিরত হয়। শাস্ত্রের যাহা ফল, তাহা অতি ক্লেশসাধ্য, দীর্ঘকাল নিরন্তর আদরপূর্ব্বক সেবা না করিলে চিত্তশুদ্ধ্যাদিরূপ নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত উপাসনাদির বিশুদ্ধ ফল অনুভব করিতে পারা যায় না।

এই সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিয়া শাস্ত্রকার ঋষিগণ বলিয়াছেন— “ন ক্লেশেন বিনা দ্রব্যং দ্রব্যহীনে কুতঃ ক্রিয়া। ক্রিয়াহীনে কুতো ধর্ম্মঃ ধর্ম্মহীনে কুতঃ সুখং। সুখং হি সর্ব্বৈরাকাঙ্ক্ষ্যং তচ্চ ধর্ম্ম সমুদ্ভবং। তস্মাৎ ধর্ম্ম এব কর্ত্তব্য শ্চাতুর্ব্বর্ণেন যত্নতঃ।” অর্থাৎ ক্লেশ ব্যতীত দ্রব্য (অর্থাদি) অর্জ্জন হয় না। অর্থাদি বিহীন পুরুষের কোন সংক্রিয়া সম্পাদন হয় না। সৎক্রিয়াবিহীন পুরুষের ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মহীন পুরুষের অন্তরে সুখ হয় না। সুখই সকল জীবনের প্রার্থনীয়। সকলেরই সেই এক কথা “সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মাভূৎ” সুখই আমার সর্ব্বদা হউক, দুঃখ যেন কদাচ হয় না। সুখ সকলেরই একমাত্র সেব্য; কিন্তু ঐ সুখ ধর্ম্মপ্রসূত। অতএব সকলেরই কায়মনোবাক্যে সুখের সবিতা সেই ধর্ম্মের সেবা করিতে হইবে। ক্লেশসাধ্য বলিয়া ফিরিয়া আসিলে চলিবে না। পৃথিবী নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী—সামান্য সুখ পর্য্যন্তও ক্লেশসাধ্য।

বাস্তবিক বিচার-দৃষ্টিতে দেখিলে প্রকৃত সুখ, স্ত্রীপুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র ধনৈশ্বর্য্য;—কিছুতেই নাই §। উহা অন্তরের ধন। যদি বাহিরের হইত, অবশ্যই স্ত্রীপুত্রাদি লাভ করিলেই লোকের মন নিরস্ত হইয়া যাইত। ঐ সকল বাহিরের বিষয় থাকা সত্ত্বেও মন যখন নিতান্তই চঞ্চল, তখন বিবেকী পুরুষ বুঝিবেন যে তাহা বাহিরের জিনিষ নহে।

§ ইহাতে কেহ মনে করিবেন না, সুখান্বেষণ করিতে যাইলে স্ত্রী পুত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। যিনি ধর্ম্মাত্মা তাঁহার নিকট স্ত্রীপুত্রাদি সমস্তই পবিত্র ও উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মের কারণ হয়।

তাহা যে বাহিরের জিনিষ নহে, শুধু এই কথায় তাহা বুঝান যায় না। বিষয় হইতে লব্ধ যে সুখ, তাহা যে ক্ষণস্থায়ী তাহা কে না জানে? কতবার মনে মনে এই সাংসারিক সুখের অনিত্যতা বুঝিতে পারি, কিন্তু তাহার দাস হইয়া থাকি কেন? কুক্কুর যেমন মাংসক্লেদ যুক্ত অস্থিখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া অমৃত বোধে চর্ব্বণ করিতে থাকে, কেহ নিকটে আসিলে পাছে তাহার সেই অমৃতখণ্ড কড়িয়া লয়, এই ভয়ে সেই অস্থিখণ্ড মুখে করিয়া লইয়া পলায়ন করে, সংসারের দাসানুদাস আমরাও সেইরূপ অনিত্যতা ক্লেদযুক্ত সামান্য বিষয় সুখ আস্বাদনে বিব্রত থাকি কোন বৈরাগ্যের কথা শুনিলে পাছে সে সুখ হারাই তাই তথা হইতে পলায়ন করি। কুক্কুর বৃত্তিযুক্ত আমরা জানি না, কোথায় অমূল্য সুখে উৎস নিহিত আছে। জানিলে কি আর মন সেই স্থির সুখ ভুলিয়া এই অসার সুখের জন্য বিষয়রাজ্যে ভ্রমণ করিত?

শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ মানবহৃদয়ের এই দুর্ব্বলতা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা সংসারে থাকিয়া কিরূপে সকল সুখের মূল ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে হয়, তাহার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

আমরা ক্রমে আমাদের সাধ্যানুসারে বিবিধ শাস্ত্র হইতে সেই সকল সুখের মূল ধর্ম্ম কি পদার্থ ও কিরূপে তাহা হইতে পরম সুখ উৎপাদিত হয়, তাহা দেখাইব ইতি।

মনুসংহিতা।

বর্ত্তমানসময়ের অর্থাৎ উনবিংশশতাব্দীর শিক্ষিত ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের শাস্ত্রীয় কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাইতে বহু প্রয়াস পাইয়াও অধিকাংশ সময় বিফলমনোরথ হইতে হয় কেন? পূর্ব্বকালের লোকেরা যে সমস্ত বিষয় ইঙ্গিতমাত্রেই সহজে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইত এখন সেই সমস্ত বিষয় যদি নানা ভাবে সরল হইতে সরলতর করিয়াও বুঝান যায়; তথাপি যেন মনঃপূত হয় না, যেন বুঝিলেও মনে ধরে না। এরূপ হইবার কারণ কি? আবহমান কার পুরুষপরম্পরায় যে ভাষা, যে ভাব, যে ইঙ্গিত অতি সহজেই অল্পায়াসেই বুঝিয়া আসিতেছে, হঠাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে পড়িয়া আজ

সে সমস্ত ক্ষমতা লুপ্ত হয় কিসে? এক বিদেশীর শিক্ষাই ইহার মূল কারণ। না জানি কেমন যেন দিন দিনই ভারতবাসীর মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ রূপে বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে। অস্থি মজ্জায়, রক্তে মাংসে, অণু পরমাণুতে, স্তরে স্তরে বিদেশীয় হাব ভাব অধিকতর ভাবে প্রবেশ করিতেছে। এখন এমনিই অবস্থা আসিয়া উপস্থিত যে ভারতবাসীর নিকট শাস্ত্রীয় কোন বিষয় অবতারণা করিলেই উহার প্রকৃত ভাবটী সেই বিদেশীয় ভাবাক্রান্ত মস্তিষ্করূপ ছাঁচে পড়িয়া একবারে লুপ্ত হইয়া এক অভিনব ভাবে গঠিত হয়। বিলাতী গুরু মিল্ স্পেন্সর, ডারউইন হক্সিলি প্রভৃতির মতের সহিত মিলাইতে যাইয়া দেবতাকে বাঁদর গড়িয়া বসেন। আমরা প্রত্যেক বিষয়ই ইহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ পাইয়া থাকি। উদাহরণ স্বরূপে শাস্ত্রীয় কএকটি বিষয় যাহা শিক্ষিতেরা অতি গুরুতর বলিয়া মনে করেন উদ্ধৃত করিয়া পাঠক দিগকে দেখাইব। মনু বলিতেছেন,—

জাতি মাত্রোপ জীবীবাকামং সাদব্রাহ্মণ ব্রুবঃ।
ধর্ম্ম প্রবক্তা নৃপেতেন্ন তু শূদ্রঃ কথঞ্চন॥
যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞোধর্ম্মবিবেচনং।
তস্য সীদতিতদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ।
যদ্রাষ্ট্রং শূদ্র ভূয়িষ্ঠং নাস্তিকাক্রান্তমদ্বিজং।
বিনশত্যাশু তৎনৎস্নং দুর্ভিক্ষব্যাধিপীড়িতং॥

মনু, ৮ম ৩০।২১।২২।

অর্থ—যে রাজার রাজ্যে শূদ্রে ধর্ম্ম-বিষয়ক বিচার করে, পঙ্কে পতিত গো যদ্রূপ আত্মত্রাণে অশক্ত হইয়া তাহাতে মগ্ন হয় তদ্রূপ উক্ত রাজার রাষ্ট্র সেই অধর্ম্মে অবসন্ন হয়। যে রাজ্যে অনেক শূদ্রের বসতি এবং পরলোকাভাববাদী নাস্তিকজনে আক্রান্ত, ব্রাহ্মণবিহীন সেই রাজ্যে দুর্ভিক্ষ রোগ মরণাদি উপসর্গে নষ্ট হইয়া যায়।

আবার বলিতেছেন—

এক জাতি দ্বিজাতীংস্তবাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্য প্রভবোহিসঃ॥
নামজাতিগ্রহং ত্বেষামভিদ্রোহেণ কুর্ব্বতঃ।
নিঃক্ষেপ্যোঽয়োময়ঃ শঙ্কুর্জ্জলন্নাস্যে দশাঙ্গুলঃ॥
ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতং।
তপ্তমাসেচয়েত্তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রেচ পার্থিবঃ॥

যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেচ্ছ্রেষ্টমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনং॥
পাণিমুদ্যম্য দণ্ডং বা পাণিচ্ছেদনমর্হতি।
পাদেন প্রহরন্ কোপাৎ পাদচ্ছেদনমর্হতি॥
সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাংকৃতাঙ্কোনির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ।
অবনিষ্ঠীবতোদর্পাদ্দ্বাবোষ্টৌ চ্ছেদয়েন্নৃপঃ।
অবমুত্রয়তোমেঢ্রমবশর্দ্ধয়তোগুদং॥
কেশেষু গৃহ্নতোহস্তৌ ছেদয়েদবিচারয়ন।
পাদয়োর্দ্দাঢিকায়াঞ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষুচ॥

মনু, ৮ম, অঃ; ২৭০।২৭১।২৭২।২৭৯।২৮০।২৮১।২৮২।২৮৩।

অর্থ,—শূদ্রজাতি যদি ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণকে কঠিন বাক্য দ্বারা ভৎর্সনা করে তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাচ্ছেদরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, কারণ সে জবন্য জাতি হইতে উৎপন্ন। রে যজ্ঞদত্ত ব্রাহ্মণাধম! এইরূপ সম্বোধন করিয়া শূদ্র যদি দ্বিজাতির উপর আক্রোশ করে তবে ঐ অপরাধে উহার মুখে জলন্ত দশাঙ্গুলী পরিমিত লৌহময় শলাকা নিক্ষেপ করিবে। তোমাদের এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, দর্প করিয়া শূদ্র যদি দ্বিজাতিকে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দেয় তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল প্রক্ষেপ করিবেন। শূদ্র কর চরণাদির মধ্যে যে অঙ্গ দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতিকে আঘাত করে রাজা উহার সেই অঙ্গ চ্ছেদন করিবেন এই মনুর আজ্ঞা। শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্ত তোলে অথবা পদ তোলে তবে হস্তোত্তোলনে হস্তচ্ছেদ ও পাদোত্তোলন পাদচ্ছেদ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্র যদি একাশনে উপবেশন করে তবে রাজা উহার কটিদেশে লৌহময় তপ্ত শলাকায় অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে বহিস্কৃত করিবেন অথবা যেন না মরে এইরূপে তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন। দর্প করিয়া যদি কেহ ব্রাহ্মণের গাত্রে শ্লেষ্মা দেয় তাহাতে ওষ্ঠাধর চ্ছেদন করিবে; প্রস্রাব করিয়া দিলে লিঙ্গ ও সর্দ্দন (বাতকর্ম্ম) করিলে গুহ্য চ্ছেদন করিবেন। শূদ্র অহঙ্কারে যদি হস্ত দ্বারা ব্রাহ্মণের কেশ গ্রহণ করে তবে উহার হস্তদ্বয় চ্ছেদ করিবেন। হিংসা জন্য পাদদ্বয় গ্রহণে, চিবুক স্পর্শে, গ্রীবা অণ্ডকোষ গ্রহণে হস্তদ্বয় চ্ছেদন দণ্ড করিবেন।

মনুর এই শ্লোক কয়েকটী পাঠ করিয়াই হয় ত এখনকার শিক্ষিতেরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবেন। সাম্যের অবমাননা দেখিয়া ক্রোধে হুতাশন-

বৎ হইবেন এবং শাস্ত্রকারদের প্রতি অজস্র গালি বর্ষণ করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইবেন। ফলে সমগ্র মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে কেবল মাত্র পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী শ্লোকে ঐরূপ কঠোর ভাবে শূদ্রের প্রতি শাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। আর কুত্রাপি এরূপ ভাবে লক্ষ্য করিয়া শূদ্রের প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা হয় নাই। বরং নানাস্থানেই দ্বিজাতিদের প্রতি উপদেশ আছে যে কদাচ শূদ্রের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা করিও না।

এখন দেখা যাউক সর্ব্বতত্ত্বদর্শী 'সাম্যের মূর্ত্তির' স্বরূপ, অপক্ষপাতিত্বের অবতার, স্বয়ং ঈশ্বর স্বরূপ মনুদেব কিরূপে এরূপ বৈষম্য দৃষ্টিতে শূদ্রের প্রতি ঘোর নিগ্রহের ভাব প্রকাশ করিলেন? স্থিরবুদ্ধি, শান্তচিত্ত ধর্ম্মপিপাসু কথায় কথায় মনুসংহিতাকে কর্ম্মনাশায় নিক্ষেপ না করিয়া, সরলভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করিবেন যে, যে মনুদেব তাঁহার সুবৃহৎ সংহিতায় অতি গুরুতর গুরুতর বিষয় কত সহজে মীমাংসা করিয়াছেন, ধর্ম্মরাজ্যের অতিদুজ্ঞেয়গভীরতমতত্ত্ব সকল সুবিস্তারে উপদেশ দিয়াছেন,রাজ্য শাসনের চূড়ান্ত প্রণালী সমস্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, এক কথায় মানব জাতির আবশ্যকীয় যাহা কিছু তৎসমস্তই অতি সুশিক্ষকের ন্যায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে উপদেশ দিয়া কেবল এক শূদ্রের সময়ই এরূপ খড়্গহস্ত হইলেন কেন? অবশ্য ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে। এইরূপ বিচার দৃষ্টিতে, ন্যায়ের দৃষ্টিতে যদি আমরা আলোচনা করি তাহা হইলে আমরা অনেক পরিমাণে শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হইতে পারি।

প্রথমত আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিতেরা কল্পনাবলেই হউক আর প্রজ্ঞাবলেই হউক, ধরিয়া লয়েন যে "আর্য্যেরা কোন অনির্ণীত স্থান হইতে আসিয়া ভারতবর্ষস্থ অনার্য্য জাতিদের পরাজয় করিয়া আপনাদের ভৃত্যবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন।" ইহারাই পরে শূদ্র নামে অভিহিত হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত প্রাচীন ও অসংখ্য আর্য্য শাস্ত্রের কোন স্থানে ওরূপ অভিনব কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে শূদ্রদের তাঁহারা আরও নীচ করিয়া দেন। কিন্তু আর্য্যেরা শূদ্রদেব রাক্ষসের ন্যায় অত নীচ মনে করিতেন না। ইহারা জাতি বা প্রকৃতিগত নীচ হইলেও মূল যোনি হইতে নীচ নহে। উহারাও ভারতবর্ষীয় বংশ সমুদ্ভুত।

আমাদের যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র প্রকৃতি-পূজক। বিভিন্ন প্রকৃতির দ্বারাই বর্ণ চতুষ্টয়ের সৃষ্টি এবং প্রকৃতি অনুসারেই ধর্ম্মানুষ্ঠান ভেদ। প্রকৃতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া আর্য্য শাস্ত্রকারগণ সম্পূর্ণ সাম্য ভাবে অধিকারী ভেদে ব্যবস্থা দিয়াছেন। অর্থাৎ যাহার যেরূপ অধিকার তিনি সেইরূপ কার্য্য করিবেন তাহা হইলেই সংসার সুশৃঙ্খলে শাসিত হইবে এবং সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে। নচেৎ মহাপ্রলয়ে মিলিয়া যাইবে।

যিনি মনুসংহিতা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন তিনিই দেখিয়াছেন যে আদি পুরুষ মনুদেবই সংসারে প্রকৃত সাম্যের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যদি বলেন তবে শূদ্রের প্রতি এত কঠোর দণ্ডাজ্ঞা কেন? আমরা বলি তিনি

"শূদ্রকে ঘৃণার চক্ষে" দেখিয়া কোন রূপ দণ্ডের সৃষ্টি করেন নাই, শাসনের জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অন্যায় কার্য্যের দণ্ড বিধান করিয়াছেন সত্য। কেননা আমরা অন্যস্থলে দেখিতে পাই যে যদি একজন ব্রাহ্মণও কোন শাস্ত্র নিষিদ্ধ অধর্ম্ম প্রবর্ত্তক কোন অন্যায় কার্য্য করেন তাঁহাকেও প্রায় ঠিক উক্তরূপ দণ্ড দেওয়া বিধি রহিয়াছে। যথা,—

অষ্টাপাদ্যন্তু শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষং।
ষোড়শৈব তু বৈশ্যস্য দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য চ।
ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টিঃ পূর্ণং বাপিশতং ভবেৎ।
দ্বিগুণা বা চতুঃষষ্টিঃ তদ্দোষ গুণ বিদ্ধি সঃ॥ মনু ৮ম, ৩৩৭।৩৩৮।

দোষজ্ঞ শূদ্র যদি চুরি করে যে, দণ্ড শাস্ত্রোক্ত, উহার আট গুণ ঐ শূদ্রের দণ্ড হইবে এতাদৃশ বৈশ্যকে ষোড়শ গুণ দণ্ড করিবেন, ঐরূপ ক্ষত্রিয়কে ছত্রিশ গুণ দণ্ড বিধান করিবেন, ব্রাহ্মণকে চৌষাট্টি গুণ দণ্ড করিবেন, অথবা অতিশয় গুণবান ব্রাহ্মণের শতগুণ অপেক্ষা গুণীকে একশত আটাইশ গুণ দণ্ড করিবেন।

সুরাং পীত্বা দ্বিজোমোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ॥
গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা পিবেদুদকমেব বা।
পয়োঘৃতং বা মরণাদ্গোশকৃদ্রসমেব বা॥
যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যে নাপ্লাব্যতে সকৃৎ।
তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ সগচ্ছতি॥ মনু ১১শ অঃ, ৯১।৯২।৯৮

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যদি জ্ঞান পূর্ব্বক সুরা পান করে তবে ঐ পাপক্ষয়ার্থ অগ্নিবর্ণ অর্থাৎ জলন্ত সুরা পান করিবে উক্ত সুরা দ্বারা স্বদেহ নির্দগ্ধ হইলে ঐ পাপ হইতে মুক্ত হয়। অথবা অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত গোমূত্র বা জল দুগ্ধ গব্যঘৃত গোময় জল এই সকল এতক্ষণ পান করিবে যে পর্য্যন্ত না মরে, মরিলে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্রাহ্মণের দেহাবস্থিত বেদ মদ্যে একবারও সংসৃষ্ট হয় তাঁহার ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হয় তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। *

যেখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কেহই অন্যায় কার্য্য করিয়া মনুরহস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই তখন শূদ্র কেন অন্যায় কার্য্য করিয়া পরিত্রাণ পাইবেন? তবে শূদ্র যে কার্য্যের জন্য দণ্ডার্হ সে গুলি প্রকৃত অন্যায় কার্য্য কিনা এবং ব্রাহ্মণেরা নিম্ন শ্রেণীর জাতির প্রতি যদি শূদ্রোচিত অন্যায়াচরণ করেন তাহা হইলে তাঁহারাই বা কেন শূদ্রদের উপর যে ভাবে যেরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ঠিক সেই রূপ তুল্য দণ্ডার্হ না হইবেন এই সমস্ত বিষয় বারান্তরে আলোচনা করা যাইবে।

* এক মনু সংহিতা হইতেই এরূপ বহুতর শ্লোক উদ্ধৃত করা যায়। স্থানাভাব বশতঃ অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

দেবযান।

(আতিবাহিকী দেবতা)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু "হার্দানুগৃহীত" অর্থাৎ অন্তর্যামীর উপাসকগণের আত্মা "শতাধিকা" অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয়েন। ইহা ব্রহ্ম বিদ্যার ফল বলিয়া কথিত হয়। সেই ফলে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদী ব্রহ্মলোকস্পর্শী বিদ্যুৎ শক্তি ও শত সূর্য্য প্রভাসমন্বিত সুষুম্না নাড়ি দ্বারা তাদৃশ উপাসকের সদ্গতি হইয়া থাকে। এই সূত্র উপলক্ষে আচার্য্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "মূর্দ্ধন্য রৈব নাড্যা উপাসকো নির্গচ্ছতি, ইতরাভ্যাঃ ইতরে" অর্থাৎ উপাসক মূর্দ্ধন্য নাড়ি দ্বারা নির্গত হন। অন্যে অন্য নাড়ি দ্বারা গমন করিয়া থাকেন। শ্রুতিতেও কহিয়াছেন (কাঠকে ৬ষ্ঠী বঃ) "শতং চৈকাচ হৃদয়স্য নাড্যস্তাশাং মূর্দ্ধন্য মভিনিঃ সৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্ত্বমেতি বিশ্বগন্যা উৎক্রমণে ভবতি॥" পুরুষের হৃদয় বিনিঃসৃতা একশত এক নাড়ি আছে। তন্মধ্যে একটী নাড়ি অর্থাৎ সুষুম্না মস্তক পর্য্যন্ত অভিনিঃসৃত হইয়াছে। মৃত্যুরূপে উপাসক, এই নাড়ি দ্বারা আদিত্য দ্বার যোগে অমৃত-লোকস্বরূপ ব্রহ্ম নিকেতন লাভ করেন। অন্য সকল নাড়ি দ্বারা উৎক্রমণ হইলে অন্যান্য প্রকার গতি হয়।

কিন্তু নাড়ি শব্দে সামান্যতঃ লোকের যে বোধ আছে তাহা স্বতন্ত্র। লিঙ্গ শরীর-শাস্ত্রে আছে, (শারীরকে ৪।২।) সূক্ষ্মং প্রমানঞ্চ তথোপলব্ধেঃ।" লিঙ্গ শরীর-ভূতজ হইলেও তাহা চক্ষুর্গোলকস্থ দর্শন শক্তির ন্যায় একান্ত সূক্ষ্ম। এমত সূক্ষ্ম যে, নাড়ি দ্বারা তাহার নিঃসরণ হয়। মৃত্যু কালে লিঙ্গ শরীর স্বীয় শুভাশুভ ধাতুস্বরূপ নাড়ি দ্বার দিয়া জীবকে পরলোকে বহন করে। "নোপ-মর্দ্দেনাতঃ॥" (শঃ সূঃ) স্থূল দেহের মর্দ্দনেতে তাহা আহত হয় না। "অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা।" লিঙ্গ শরীরের উষ্মা দ্বারা স্থূল শরীরের উষ্মা উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহে যে প্রাণন শক্তিরূপ তেজ আছে তাহাই স্থূল শরীরকে চেষ্টাবিশিষ্ট করে। সুতরাং সূক্ষ্ম শরীর চর্ম্ম চক্ষুর অগোচর। তাহা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণন শক্তির সমষ্টিমাত্র! এবম্বিধ সূক্ষ্ম শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যখন নাড়ির দ্বার স্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তখন নাড়ি সকলও সামান্য নাড়ি নহে, তাহাও ঐরূপ সূক্ষ্ম, এমন কি সূক্ষ্ম দেহের ধাতু স্বরূপ। শুভাশুভ কর্ম্মাদি দ্বারা তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়া থাকে। যাঁহাদের চিত্ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ কর, এবং প্রাণ মন ও বুদ্ধি চরিতার্থ কর বিষয়ে বদ্ধ এবং বিষয়রূপ ফলকামনায় যাঁহারা যাগাদি করেন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণের প্রতিই অসাধারণ অনুরাগ। সুতরাং মৃত্যু সময়ে তাঁহাদের তদুপযুক্ত ধাতুরূপ নাড়ির পক্ষে ইন্দ্রিয়ই দ্বার স্বরূপ হয়, এবং

তাঁহার তাদৃশ নাড়ির দ্বারা, তাদৃশ দ্বার যোগে, যথাসঙ্কল্পিত ফলরাজ্যে গিয়া উপস্থিত হয। কিন্তু যাঁহারা তপস্যা ও শ্রদ্ধা সহকারে যোগৈশ্বর্য্য প্রভৃতি কামনায় অথবা ভক্তি পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহাদের কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, বা প্রাণ মনাদি তৃপ্তকর বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ থাকে না। ইন্দ্রিয়াতীত ঐশ্বর্য্য ও ঈশ্বরের প্রতিই তাঁদের নিষ্ঠা থাকে। সেই নিষ্ঠানুযায়ী মহর্লোকাবধি ব্রহ্মলোকে নিঃসৃত হইবার নিমিত্তে বিষয়নিষ্ঠ ইন্দ্রিয়গণ দ্বার হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মরন্ধ্রই তাহার দ্বাররূপে উক্ত হইয়াছে। উপাসকের দেহত্যাগকালে তাঁহার জ্ঞান নাড়ির দ্বারস্বরূপে ঐ ব্রহ্মরন্ধ্র দীপ্তি পাইয়া থাকে। নাড়ি সকল অতিশয় সূক্ষ্ম। এস্থলে তাহাদের সূক্ষ্মত্বের প্রতিই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। তাহাদের স্থূলত্ব স্বীকার করিলেও তদ্দিগের বিদ্যুতীয় শক্তি উপলক্ষে সূক্ষ্মত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। সেই শক্তির সূক্ষ্মত্বই নাড়ির সূক্ষ্মত্ব। ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

জীবের যেমন কর্ম্ম, যেমন তপস্যা, যেমন জ্ঞান, সেইরূপ গতি হয়। সূক্ষ্ম দেহ ও তদীয় ধাতুস্বরূপ নাড়িসকল সেইরূপ পবিত্রতা ও শক্তি ধারণ করে। তাহারা স্বীয় অনুরূপ লোকে কর্ত্তাস্বরূপ জীবকে লইয়া যায়। "পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্য লোকং।" পুণ্যদ্বারা পুণ্যলোকে, পাপদ্বারা পাপলোকে এবং উভয়দ্বারা মনুষ্যলোকে লইয়া যায়। (শ্রুতি)। স্বর্গাদিলোকের অস্তিত্ব এবং ক্রিয়া কর্ম্মদ্বারা তাহার প্রাপ্তি ঋগ্বেদ সংহিতায়ও উক্ত হইয়াছে। "তেন সত্যেন জাগৃতমধি প্রচেতুনে পদে। ইন্দ্রাগ্নীশর্ম্মযচ্ছতং।" (ঋঃ সং—২০৮ ঋ। ১মঃ।) ৫ অঃ। ১ সূঃ ৬ ঋ)। 'সত্যেন' অবিতথেন 'তেন' কর্ম্মণাঃ প্রাপ্যে 'প্রচেতুনে' ফলভোগজ্ঞাপক 'পদে' স্বর্গলোকাদি স্থানে হে 'ইন্দ্রাগ্নী' দেবৌ 'অধিজাগৃতং' আধিক্যেন সাবধানৌ ভবতং ততঃ অস্মভ্যং 'শর্ম্ম' সুখং 'যচ্ছতং' দত্তং। হে ইন্দ্রাগ্নি! কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্য যে সকল ফলভোগের জ্ঞাপক স্বর্গাদিলোক আছে তাহা আমাদিগের দিবার নিমিত্ত অধিক মনোযোগী হও এবং আমাদিগের সুখ বিধান কর। এস্থলে "স্বর্গলোকাদি" শব্দে ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক, মহলোক, জনলোক, তপলোক ও ব্রহ্মলোক। ভূর্লোক জন্মান্তর লাভও উহারও মধ্যে ভুক্ত।

জীবের কর্ম্মানুসারে স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহার সূক্ষ্ম দেহ শুভাশুভ ধাতু বা প্রাণ সম্পন্ন হয়। সেই ধাতু ও প্রাণ সূক্ষ্ম দেহে থাকেই, তবে সাধু অসাধু ক্রিয়াদ্বারা তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ সংঘটিত হয় মাত্র তন্মধ্যে যেরূপ ধাতু বা প্রাণ নরকসাধক তাহা তমোগুণ প্রধান, যাহা নরলোকে পুনর্জ্জন্ম সাধক তাহা রজোগুণ প্রধান। যাহা ভূর্লোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক, মহলোক, জনলোক, তপোলোক, ও ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তের আনন্দ সাধক তাহা সত্ত্ব গুণ প্রধান।—

১ম ভাগ **বেদব্যাস** ৩য় খণ্ড

—০:০—

মাসিক পত্র

আষাঢ় ১২৯৩

বিষয়		পৃষ্ঠা
অন্তঃসার কাহাকে বলে?	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি	৪৯
ভক্তি	শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার	৫.
মনুসংহিতা	সম্পাদক	৬৩
অদৃষ্টবাদ	শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়লঙ্কার	৬৯

—০:০—

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক।

কলিকাতা।

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টিম মেসিন প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও ৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
প্রকাশিত।

বেদব্যাস।

———ooOoo———

১ম ভাগ। ১২৯৩ সাল। ৩য় খণ্ড।

অন্তঃসার কাহাকে বলে ?

আচার্য্য। অন্তঃসার কাহাকে বলে এ বিষয় এক কথায় বুঝাইতে গেলে, আধ্যাত্মিক পরিপুষ্টি অর্থাৎ আত্মার পরিপুষ্টি অবস্থা (ক) বা আন্তরিক অস্তিত্বকেই 'অন্তঃসার' বা 'আধ্যাত্মিকসার' বলা যাইতে পারে। তৎপর, ইহার বিস্তৃত মর্ম্ম প্রকাশেরও চেষ্টা করা যাইতেছে, কিন্তু প্রথম তোমার একটি কথা জিজ্ঞাসিতে হইবে,—

"এই বানরজাতির সহিত, গো মহিষ ও ব্যাঘ্রাদি পশুজাতির কিরূপ আন্তরিক পার্থক্য আছে, তাহা অবগত আছ কি?

শিষ্য। পূর্ব্বে কখনও এ বিষয় চিন্তা করিয়া দেখি নাই, সুতরাং একটু ভাবিয়া বলিতে হইবে।

আচার্য্য। তাহাই বল।

শিষ্য। আমার বিবেচনা হয় যে, গো, মহিষ, ও ব্যাঘ্রাদি অপেক্ষায়, বানরের বুদ্ধি একটুকু বিশদ, সুতরাং এই টুকুই তাহাদের আন্তরিক পার্থক্য আছে। তৎপর গো মহিষ ব্যাঘ্রাদি অপেক্ষা 'বানরের শারীরিক বল অল্প' কিন্তু বানর কিছু অধিক দীর্ঘজীবী। ইহাতেও পার্থক্য দেখা যায়।

আচার্য্য। বুদ্ধি বিশদ আর অবিশদ কিরূপ ?

শিষ্য। বুদ্ধি শব্দে আমি এখানে বিবেক শক্তি মনে করিয়াছি। বানরের বিবেকশক্তি ব্যাঘ্রাদি জন্তু অপেক্ষা কিছু একটু অধিক বলিয়া মনে হয়। ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন।

(ক) আত্মা শব্দে এখানে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা বুঝিতে হইবে না। যিনি দেহের নিয়ন্তা ও সর্ব্বক্রিয়ার কর্ত্তা সেই ব্যবহারিক জীবকেই বুঝিতে হইবে।

আচার্য্য। মৃত্তিকাও পাষাণাদি দ্রব্যই আপনাপন গুরুত্ত্ব ও আয়তনের পরিমাণ দ্বারা নূন্যাধিক হইতে পারে; শারীরিক বলও কোন ভারী দ্রব্য উত্তোলন দ্বারা নূন্যাধিক ভাবে পরিমিত হয়—যিনি ৵৫ সের পরিমাণ বস্তু উত্তোলনে সমর্থ তাঁহার ৵৫ সের বল, যিনি ৷১০ সের উত্তোলনে সমর্থ তাঁহার ৵১০ সের বল স্থির করা যায়। অতএব বুদ্ধি বা বিবেক শক্তির যদি নূন্যাধিক্য থাকে, তবে কি উহা মৃৎপাষাণাদির ন্যায় অথবা শারীরিক বলের ন্যায় কোন পদার্থ?

শিষ্য। গো, বানর ও মনুষ্যাদির দৃষ্টান্তে বিবেক শক্তির নূন্যাধিক্য, বিলক্ষণ বুঝা যাইতে পারে, তাহা ভ্রান্তি নয়, কিন্তু মৃৎপাষাণাদির সহিত তাহার তুলনা করিলে বিদ্রুপ করা হয়। বিবেকশক্তি শরীর বলের ন্যায় কোন পদার্থও নহে, কারণ তাহাকে বলের মত ওজন করা যায় না, তবে কি না, গো ব্যাঘ্রাদি পশু অপেক্ষায় বানর কিছু দূরদর্শী অর্থাৎ গো ব্যাঘ্রাদি পশুগণ উপস্থিত কোন একটী ঘটনা বিষয়ের যত টুকু পর্য্যন্ত বুঝে বা দেখিতে পায়, বানর তদপেক্ষা অধিক অংশ বুঝিতে পারে, সেই বুঝাটুকুকেই আমি, 'বিবেক' বলিতেছি।

মনুষ্যগণ, বানর মারার নিমিত্ত, প্রচুর খাদ্যদ্রব্যসহকারে একটি যন্ত্র (খোঁয়াড়) পাতিলে, বানর আপন বিবেক বলে তাহা বুঝিতে পারে যে "ইহা আমার মঙ্গলের নিমিত্ত নহে, কিন্তু মৃত্যুর নিমিত্ত—" সে প্রথম ঐ যন্ত্রটি চক্ষুদ্বারা দেখিয়াই নিরস্ত হয় না পরে আবার অন্তরেও ঐ যন্ত্র সংস্থাপনের কারণ চিন্তা করিতে থাকে অথবা যন্ত্রে প্রবেশ এবং নির্গমনের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করে, তখন বুঝিতে পারে যে ঐ যন্ত্র তাহার বিপদের কারণ, সুতরাং কদাচ উহাতে প্রবেশ করে না; কিন্তু একটি গো বা ব্যাঘ্রাদি পশু ঐরূপ যন্ত্রে দুবার চারিবার আবদ্ধ হইয়াও পুনঃ পুনঃ তাহাতেই প্রবেশ করে, কারণ তাহাদের বিবেক বুদ্ধি মাত্রও নাই, তাহারা ঐ যন্ত্রটির দিকে তাকাইয়া কেবল উপর উপর ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষের দ্বারা ঐযন্ত্রটি মাত্রই দেখিতে পায়, অন্তরে অন্তরে আর তাহার কোন বিবরণ দেখিতে পায় না, তাই পুনঃপুনঃহ আবদ্ধ হয়। এইরূপে প্রত্যেক বিষয়েই দেখিতে পাওয়া যায় যে, গো ব্যাঘ্রাদি পশু অপেক্ষায় বানরের বিবেকশক্তি অধিক, অর্থাৎ বানর, কোন একটি বিষয়ের অধিক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পায় কেবল উপর উপর ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ করিয়াই নিরস্ত হয় না।

আচার্য্য।—গো ব্যাঘ্রাদি পশুগণ, যতটুক পর্য্যন্ত ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ করিতে পারে, যদি ততটুকুও না পারিত, তবে তাহাদের কিরূপ অবস্থা হইত?

শিষ্য।—তবে উহারা বৃক্ষাদির ন্যায় স্থাবর প্রাণী মধ্যে পরিগণিত হইত।

আচার্য্য।—স্থাবর প্রাণী কেন হইবে, উহাদের যে গতিশক্তি, শারীরিক বল, এবং আহারাদি ক্রিয়া হইয়া থাকে।

শিষ্য।—হাঁ, তা বটে, তবে উহারা না চেতন না অচেতন এক প্রকার প্রাণী হইত, সদ্যোজাত বালক যেরূপ সকল প্রকার শারীরিক ক্রিয়া করিয়াও কোন প্রকার ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞান থাকে না বলিয়া, ঘটিকা যন্ত্রের মত এক পদার্থের মধ্যে গণ্য, গো ব্যাঘ্রাদি প্রাণী ও ঐরূপ এক পদার্থের মধ্যেই পরিগণিত হইত।

আচার্য্য।—তোমার কথায় সুখী হইলাম, এখন প্রস্তাবিত বিষয় শুন, পরন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কি বলিতেছিলাম তাহা স্মরণ আছে তো?

শিষ্য।—বিলক্ষণ আছে; অন্তঃসার বা আধ্যাত্মিক সারবত্তা, কাহাতে বলে, তাই বিশেষ রূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

আচার্য্য।—গো ব্যাঘ্রাদি প্রাণীর ঐ উপর উপর ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানটুকু না থাকিলে, সদ্যোজাত শিশু বা ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় যে অবস্থা হইত তাহাই আন্তরিক অস্তিত্ব বা অন্তঃসার পদার্থের সম্পূর্ণ অভাব অবস্থা, আর শারীরিক বল সামর্থ থাকা নিবন্ধন উহাকে বহিঃসারবত্তা বা বহিরস্তিত্ব অবস্থাও বলা যাইতে পারে।

সংসারেতে যতপ্রকার পরিমিত বস্তু আছে, সকলের দুইটি সীমা থাকে একটি অভাবের সীমা, আর একটি পরিপূর্ণতার সীমা, অন্তঃসার বস্তুর বা আন্তরিক অস্তিত্বের ও একটি অভাবের সীমা, আর একটি পরিপূর্ণতার সীমা আছে, তন্মধ্যে, গোব্যাঘ্রাদির যে, সমস্ত-ঐন্দ্রিয়িক-জ্ঞানাভাবের অবস্থার কথা বলিলাম, তাহাকে অন্তঃসারের অভাবের সীমাবস্থা এবং বহিঃসারবত্তার পূর্ণতাবস্থা, বলা যাইতে পারে।

তৎপরে, গো-ব্যাঘ্রাদি প্রাণী সকলের স্বভাব অবস্থা মনে করিয়া তাহাদের যে যৎকিঞ্চিৎ ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান হওয়ার কথা বলিয়াছ, তাহা বাস্তবিকই উপর উপর জ্ঞান, সহস্র লোক সমাকীর্ণ হট্টগোলের মধ্য দিয়া গেলে, যেরূপ ঐসকল লোকগুলির ভাসা ভাসা জ্ঞান হইয়া থাকে

বোধ হয় যেন, স্নায়ুর মধ্যেই ঐ জ্ঞান পর্য্যবসিত হইয়া যায়, মস্তিষ্কের মধ্য পর্য্যন্তও যেন উহার কোন ক্রিয়াই হয় না, ঐ অস্ফুট জ্ঞান বাহিরে বাহিরেই থাকে, গোব্যাঘ্রাদির ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞানও ঠিক সেইরূপ উপরে হইয়া থাকে, এজন্য শাস্ত্রে ইহাকে 'আলোচন জ্ঞান' এবং 'সম্মুগ্ধ জ্ঞান" বলিয়া থাকেন 'অস্তিহ্যালোচনং নাম, সম্মুগ্ধং নির্ব্বিকল্পকম্''। অতএব গোব্র্যাঘ্রাদির স্বাভাবিক অবস্থাকেও অন্তঃসার শূন্য 'অবস্থা বা বহিঃসার-বত্তা অবস্থাই বলা যাইতে পারে, কারণ উহাদের যে কোন প্রকার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে তৎসমস্তই আল্‌গা আল্‌গা মত, উহা কেবল বাহিরে বাহিরেই পরিসমাপ্ত হয়, অন্তরে তাহার কিছুই নাই। এই গেল অন্তঃসার না থাকার অবস্থা।

এখন অন্তঃসার থাকা অবস্থার কথা শুন,—বানরের যে বিবেকশক্তি সমালোচন শক্তি কিম্বা দূরদর্শিত্ব বা অধিক দর্শিত্বের কথা বলিয়াছ, সেই টুকু কিন্তু উহাদের কেবল চক্ষু, কর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইতে পারে না, বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল, গোব্যাঘ্রাদির ন্যায় ঐ 'সম্মুগ্ধ' বা 'আলোচন' জ্ঞান মাত্রই হইতে পারে, তৎপরে সমস্তগুলি ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইলেও, অন্তর হইতেই ঐ বিবেক জ্ঞান, বা দূরদর্শন হইয়া থাকে, তখন তাহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে যেন কি একটু পৃথক অস্তিত্ব, একটু পৃথক্ বস্তু জন্মিয়াছে ইহা বুঝা যায়—যাহা হইতে এইরূপ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। যখন, চক্ষু কর্ণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ বা এককালীন ক্রিয়া বিহীন হইলেও এই ক্রিয়া হইয়া থাকে তখন, উহা ইন্দ্রিয় কিম্বা, ইন্দ্রিয় স্থান-স্নায়ুর কার্য্য নয়, কিন্তু ঐ বানরাদির অভ্যন্তরে যে কিছু একটু পদার্থ আছে তাহারই কার্য্য, সেই পদার্থ টুকু হইতেই, ঐ অবরোধ যন্ত্রাদি দর্শনে, উহাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত বিকসিত হয় যে "এই বিবিধ খাদ্যদ্রব্য সংযুক্ত পদার্থই (যন্ত্রটী) আমার পরিতৃপ্তির নিমিত্ত সংরক্ষিত হয় নাই, উহা আমার মৃত্যুরই নিমিত্ত, কারণ উহা সরল নিয়মে অবস্থিত নহে, উহাতে প্রবেশ নির্গমের সরল পন্থা নাই।"

যাহা হইতে এইরূপ বিবেকের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়—তাহার নামই "অন্তঃসার," এবং আন্তরিক অস্তিত্ব, বৃক্ষ মধ্যগত সারের যেরূপ পীত, রক্ত, কৃষ্ণাদিবর্ণ ছটা বিকাসিত হয়, চেতন প্রাণীর অন্তঃসার হইলেও তেমন তাহার বিবেকাদি শক্তির প্রভা বিকীর্ণ হইয়া থাকে, এবং বৃক্ষ

মধ্যে সার হইলে যেরূপ বাহিরের বল্কল ও পত্র পল্লবাদি কিছু হতশ্রী হয় বটে কিন্তু ফলের মধুরতা এবং কুসুমের সৌরভ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, চেতন প্রাণীর ও অন্তঃসার হইলে দেহের উর্জ্জস্বলতা এবং বহির্ম্মুখীন প্রভা অর্থাৎ বহিঃ সারবত্তা অনেক কমিয়া যায়, কিন্তু চেতন প্রাণীর ফল স্বরূপ ক্রিয়া প্রণালীর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং পুষ্পস্বরূপ স্বভাবের আমোদও বৃদ্ধি পায়। এইজন্য বানর ও ব্যাঘ্রাদির তুল্য আকৃতি হইয়াও বানর ব্যাঘ্রাদি অপেক্ষা অনেক দুর্ব্বল, ইহার পাকস্থলী প্রভৃতি ক্রিয়া যন্ত্র, এবং চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় যন্ত্রগুলি অনেক দুর্ব্বল, বহিঃপ্রভাব ও কিছু কম, কিন্তু তাহার ক্রিয়া প্রণালীর উৎকর্ষতা আছে এবং দীর্ঘজীবীও বটে। ইহাই অন্তঃসার বা আন্তরিক অস্তিত্বের ঈষৎ ছায়ামাত্র প্রদর্শিত হইল। অতএব ইহা মনে করিতে হইবে না যে, বানরের বড় অধিক অন্তঃসার আছে, তবে কি না, গোব্যাঘ্রাদির মোটেই নাই; আর বানরের কিছু একটু ছায়ামাত্র আছে, তাই গোব্যাঘ্রাদির তুলনায় "আছে" বলিতে পারা যায়।

গোব্যাঘ্রাদি পশুর অন্তঃসার বা আন্তরিক অস্তিত্ব নাই বলিয়া শাস্ত্রে উহাদিগকে "অষ্টাবিংশদ্বধাত্মক।" (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) বলিয়াছেন!

শিষ্য।—আপনি যে দৃষ্টান্তে অন্তঃসার ও আন্তরিক অস্তিত্ব বুঝাইলেন, তাহাতে এই বুঝিলাম যে, বানরের দেহ মধ্যে বুঝি গোব্রাঘ্রাদি পশু অপেক্ষায় অত্যন্ত সুদৃঢ় একটা কিছু জন্মে; তাহা হইতেই বানরের যৎকিঞ্চিৎ বিবেকাদির কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; তাহাই কি আপনার মনোগত?

আচার্য্য।—নিতান্ত বালকের মত সন্দেহ করিয়াছ! এই রূপ সন্দেহে লোকে হাসিবে; ইহা কি কখনও সম্ভব?

শিষ্য।—তবে কি?

আচার্য্য।—বানরের অন্তরে অন্তরে কতকগুলি শক্তি বিশেষ সঞ্চিত হয়, তড়িৎ সঞ্চয়ের পাত্রে যেরূপ তড়িত যমিয়া থাকে, অন্তরে অন্তরে, প্রাণীর আত্মাতেও সেইরূপ অনেকগুলি শক্তি বিশেষ যমিয়া থাকে, তাহা হইতেই বিবেকাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, সেই শক্তি বিশেষকেই অন্তঃসার বা আন্তরিক অস্তিত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অন্তঃসার বা আধ্যাত্মিক সার পদার্থটার কতকটা আভাস একরূপ

বুঝিতে পারিলে, এখন মানুষ সম্বন্ধে তাহার যোজনা করা হইয়াছে, মানুষের মধ্যেও অন্তঃসার বা আন্তরিক অস্তিত্ব এবং বহিঃ সার আছে, কোন মানুষের হয়ত, কিছুমাত্র অন্তঃসার ও নাই, কেবল ব্যাঘ্রাদির ন্যায় বহিঃসারই আছে, আবার কোন কোন মনুষ্যের কেবল অন্তঃসারই আছে। অবশ্যই যাহাদের অন্তঃসারবত্তা নাই তাহাদের যে ঠিক গো গর্দ্দভের মতই নাই তাহাই নহে, প্রকৃত শিশু অপেক্ষায় কিছুমাত্র সার অবশ্যই আছে, তবে কি না, প্রকৃতপক্ষে তাহা না থাকার মধ্যেই গণ্য, এ নিমিত্ত "নাই" বলিতে হয়। মানুষের মধ্যেও যাহার বিবেক শক্তি কিম্বা দূরদর্শিত্ব থাকে, তাঁহাকেই অন্তঃসারবান্ বা আন্তরিক অস্তিত্বশালী বলিয়া বুঝিতে হইবে আর যাহার বিবেক শক্তি কিছুই নাই বলিলে হয়, তিনি এককালে অন্তঃসার শূন্য, এবং যাহার যে পরিমাণে বিবেক শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি আছে, তিনি সেই পরিমাণেই অন্তঃসার বা আন্তরিক অস্তিত্ব বিশিষ্ট।

'যাহার অন্তঃসার বা আধ্যাত্মিকসার' বত্তা থাকে, তাঁহাকেই লোকে "আত্মবান্" বলিয়া ব্যবহার করে, আর যাহার তা নাই তাঁহাকে "অনাত্ম-বান্" বলে, অতএব "অন্তঃসারবান" আর আত্মবান ইহা এক অর্থেরই কথা, এবং "অন্তঃসার বিহীন," আর "অনাত্মা" বা "আত্মশূন্য" এই সকলও এক অর্থের কথা। তাই শাস্ত্রে বিবেক রহিত লোককে "আত্মশূন্য" অর্থাৎ অন্তঃসার শূন্য বলিয়াছেন "বন্ধুরাত্মা আত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মা আত্মনাজিতঃ অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ।" (ভগবদগীতা)।

বিবেকের বিশেষ বিবরণ পরে হইবে, এখন মোটামোটী আর কএকটি লক্ষণের কথা বলা যাইতেছে,—যাঁহার অন্তঃসার বা আন্তরিক অস্তিত্ব থাকে, তাঁহার অনেকগুলি দৈহিকলক্ষণ বিকাশিত হয়,—নয়নদ্বয় এবং ললাটফলকের জ্যোতি কোমল, সরল, ও কমনীয় অর্থাৎ স্পৃহনীয় ভাব গ্রহণ করে, নয়ন ও ললাট পানে তাকাইলেই মন যেন মৃদু হইয়া আইসে, কপটতা বহন করিতে পারে না, আর বারম্বার ঐরূপ ভাব দেখিতে চায়, (কিন্তু অতি দুরাত্মা লোক ইহা ধারণা করিতে পারে না) অন্তঃসারবান্ লোকের দেহের প্রভা উর্জ্জস্বল বহির্গতি ত্যাগ করিয়া যেন স্তম্ভিত ভাব গ্রহণ করে, মুখমণ্ডল ও তাঁহার দেহের বর্ণটা যেন একটু ফেকাসে ফেকাসে ভাব গ্রহণ করে, কিন্তু দৈন্য প্রকাশক নহে শান্তিরই পারিব্যঞ্জক, তাঁহার

প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গই যেন আপনাপন ক্রিয়া দ্বারা মৃদুতা সরলতা সন্তোষ এবং স্পৃহনীয়তা ভাব প্রকাশ করে, কণ্ঠধ্বনি ছাগল গর্দ্দভাদির কণ্ঠধ্বনির মত হাল্কা হয় না, কুক্কুর, অশ্ব, হস্তীর মত তীব্র ও হয় না, গো মহিষের মত অসার গম্ভীর ও হয় না, আবার সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় তীব্র ঘন গম্ভীরও হয় না—কিন্তু কাহার মত হয় তাহার দৃষ্টান্ত নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, না দৈন্য প্রকাশক, না বীরত্ব প্রকাশক কেমন একটু স্পৃহনীয় মত একপ্রকার হয়। তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রভাব কমে ইত্যাদি আরও অনেক প্রকার দৈহিক লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে যাহারা অন্তঃসার শূন্য, তাহাদের ইহার ঠিক বিপরীত আকৃতি হইয়া থাকে, তাহা আর বর্ণনা করায় আবশ্যকতা মনে করি না। এই গেল দৈহিক অস্তিত্বের বিশেষ বিবরণ, এখন আন্তরিক লক্ষণ শুন।—

পূর্ব্বে বানরের দৃষ্টান্তে যে, অন্তঃসার বুঝাইয়াছি তাহা যে অন্তঃসার বা অধ্যাত্মিক সারের একটু আভাস মাত্র ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ফলপক্ষে কিন্তু মনুষ্যের অন্তঃসারের মধ্যে আরও অনেক দ্রব্য আছে, প্রগাঢ় বিবেকশক্তি তো অবশ্যই আছে, তদ্ব্যতীত যতগুলি মানবীয় শক্তি আছে যাহা মনুষ্য ব্যতীত আর কোন প্রাণীতেই নাই যাহা মনুষ্যের পরিচায়ক পদার্থ অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধীশক্তি, অত্মানুভবের ক্ষমতা, সত্যনিষ্ঠা, অক্রোধ, ভক্তি, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য ইত্যাদি। (ক) ইহারা প্রত্যেকেই সত্ত্বগুণ সমুদ্ভূত এক একটী শক্তি বিশেষ। এই সকলগুলি শক্তি এবং প্রগাঢ় বিবেকশক্তি এই সমস্তগুলি, তীব্রতর যত্ন ও অভ্যাসের দ্বারা অন্তরে অন্তরে আত্মাতে একএকটু করিয়া সঞ্চিত হইয়া ক্রমে ঘনীভূত ও প্রভূত হইয়া যখন এমন হইবে যে, তখন হস্তপদাদি প্রত্যেক দেহাবয়ব ও ইন্দ্রিয়াদির যতপ্রকার বল সামর্থ্য বা স্ফুর্ত্তি আছে তৎসমস্তের উপরে—তৎ-সমস্তের অধ্যক্ষ বা নিয়ন্তারূপে অন্তরে অন্তরে যেন একটা প্রবল শক্তিব্যূহ জ্বলন্ত বিদ্যমানতা বা জ্বলন্ত সত্তা প্রতিভা সমুৎপন্ন ও

(ক) এই সকল শক্তিগুলির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ এবং ইহারা যে একমাত্র মনুষ্যত্বের আশ্রয় ও পরিচায়ক, ইহাদ্বারাই মানুষ মনুষত্ব পদবী গ্রহণ করে, এতদ্দ্বারাই মনুষ্যের মনুষ্য দেহ সঙ্গঠিত হয় ইত্যাদি বিষয় ধর্ম্ম ব্যাখ্যাতে অতি বিস্তারক্রমে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

উপচিত হইবে, হস্তপদাদি অবয়ব এবং ইন্দ্রিয়াদির শক্তি সমষ্টি যেন অভ্যন্তর পানে গুটিয়া গিয়া যেন প্রত্যাকৃষ্ট হইয়া গিয়া অভ্যন্তরে একটা জাজ্বল্যমান তেজঃপুঞ্জের ন্যায় পরিণত হইবে, এবং তাহারই অধীনে হস্তপদাদি অবয়ব ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া সমূহ নিষ্পাদিত হইবে। সূর্য্য হইতে আলোক বিকীর্ণ হইয়া যেরূপ ইতস্ততঃ কার্য্যকারক হইয়া থাকে, সেইরূপ দেহের অধ্যক্ষ সেই সর্ব্বশক্তির সমষ্টি স্বরূপ অন্তঃসার হইতেই একএকটি শক্তি বিজৃম্ভিত হইয়া দেহের এক এক অবয়বে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবে। তখনই মনুষ্যের অন্তঃসার বা আন্তরিক অস্তিত্ব হইল, আর যাহাদের আন্তরিক অস্তিত্ব বা অন্তঃসার জন্মে নাই তাঁহাদের ইহার বিপরীত অবস্থা থাকে অর্থাৎ হস্তপদাদি দেহাবয়ব ও ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত সামর্থ্য ও বল তাহাদের নিজ নিজের অধীন মতেই থাকে, গো অশ্বাদি পশুদিগের ইন্দ্রিয়ের ন্যায় তাহারও অভ্যন্তরের প্রেরণাযোগ না হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে অর্থাৎ যখন যেমন ঘটনা উপস্থিত সেইরূপই কার্য্য করিয়া ফেলে; তাহাদিগের যে কিছু শক্তি যে কিছু ক্ষমতা, তৎসমস্তই গবাশ্বাদি পশুর ন্যায় দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির উপর উপরেই থাকে—উপরেই বীর্য্য, উপরেই তেজস্বিতা ও প্রভাব কিন্তু অভ্যন্তরে ফাঁক, ভুয়ো যেন কিছুই নাই অভ্যন্তরের অতি যৎসামান্য সাহায্য থাকিলেও তাহাদের হস্তের কার্য্য যেন হস্ত হইতেই নিষ্পন্ন হয়, পদের কার্য্য যেন পদহইতেই, চক্ষুর কার্য্য যেন চক্ষু হইতেই, কর্ণের কার্য্য যেন কর্ণ হইতেই ভাসাভাসা রূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাঁহারাও ঠিক সেইরূপই অনুভব করিয়া থাকেন।

যাঁহার এই অন্তঃসার বা আন্তরিক অস্তিত্ব আছে, তিনি অন্তরে অন্তরে উক্ত সমস্ত শক্তির সমষ্টি স্বরূপ আন্তরিক অস্তিত্ব সর্ব্বদা অনুভব বা মানসিক প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সুখ বা দুঃখ সমুৎপন্ন হইলে যেমন তাহায় স্পষ্ট অনুভূতি হইয়া থাকে এই আন্তরিক অস্তিত্ব ও তেমন, তাঁহাদের দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অথচ দেহের নিয়ন্তা ও অধ্যক্ষ আত্মা, বুদ্ধি, মন, ও ইন্দ্রিয়াদি সহকারে, অন্তরে অন্তরে পূর্ব্ব কথিত শক্তিগুলির সহিত জলন্ত ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। বর্ম্মাবৃত পুরুষ, কিম্বা গৃহাভ্যন্তরবর্ত্তী ব্যক্তি যে রূপ বর্ম্ম ও গৃহ হইতে বিভিন্ন রূপে আপনার বিদ্যমানতা অনুভব করে, যাঁহার আন্তরিক অস্তিত্ব বা অন্তঃসার জন্মিয়াছে তিনিও অন্তরে অন্তরে তাহার অনুভব করিতে পারেন, এবং আমাদের যে সর্ব্বদাই একটা

"আমিত্বের" অনুভব হইতেছে, এই অনুভবটা তাঁহার দেহের উপর না থাকিয়া একটু অভ্যন্তরে গুটিয়া যায়, ঐ অভ্যন্তরবর্ত্তী জলন্ত বিদ্যমানতার উপরেই তাহার "আমি" ভাব হইয়া থাকে, তিনি "আমি" বলিতে ঐ অন্তঃসারকেই অনুভব করেন। কারণ অন্তরে অন্তরে যাহার মধ্যে যে সম্পত্তি আছে; তাহা সে অবশ্যই বুঝিতে পারে; ইহা চেতন প্রাণীর লক্ষণ; —এনমকি পশ্বাদি অধম যোনির মধ্যেও এই নিয়ম দেখা যায়, দেহমধ্যে দুগ্ধ থাকিলে; গো মহিষ প্রভৃতি তাহা বুঝে, সর্প আপনার দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী গরল অবগত আছে; মধু মক্ষিকা আপনার পুচ্ছগত বিষের বার্ত্তা রাখে; অতএব প্রাণীশ্রেষ্ঠ মনুষ্য যে আপন দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী পূর্ব্ব কথিত অন্তঃসার বা আন্তরিক অস্তিত্বের বিলক্ষণ অনুভব করিবে না ইহা নিতান্ত অসম্ভব।

আর যাহার অন্তঃসার বা আন্তরিক অস্তিত্ব আদৌ নাই; সে অভ্যন্তরের কিছুই অনুভব করিতে পারে না; সমস্তই ভূয়ো; সে যাহা কিছু বুঝে যাহা কিছু অনুভব করে তৎসমস্তই কেবল দেহের উপরের স্তরটা লইয়া; তাহার আন্তরিক সত্তা যেন দেহের সত্তার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; তাই তাহার দেহও ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যগুলি যৎকিঞ্চিৎ আন্তরিক অস্তিত্বের সাহায্যে হইলেও; গবাশ্বাদি পশুর ন্যায় তখন দেহ হইতেই হইতেছে এইরূপ জ্ঞান হয়; চক্ষুর কার্য্য যেন চাক্ষুষ স্নায়ুর শক্তি হইতেই নিষ্পন্ন হইতেছে; শ্রবণের কার্য্য যেন শ্রাবণিক স্নায়ুর শক্তি হইতেই হইতেছে; হস্তের কার্য্য যেন হস্তীর শক্তির দ্বারাই হইতেছে; ইত্যাদি অনুভব করিয়া থাকেন; আর অভ্যন্তরে প্রবেশ ও নাই তাহার অনুভব ও নাই। এই বলিলাম অন্তঃসার বা আন্তরিক অস্তিত্বের স্বগত লক্ষণ।

ভক্তি।

যদি কোন দেবতা হঠাৎ কোন এক দেবলোক হইতে অবতরণ করিয়া এই বঙ্গদেশে উপস্থিত হন, এবং যদি তিনি আমাদের মনের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমাদের মুখের কথায় আস্থা ও বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই মনে করিবেন; যে বঙ্গবাসার ন্যায় ধার্ম্মিক বোধ হয় দেবলোকেও নাই। এক্ষণে এই বঙ্গদেশে বার আনা লোকে "নিষ্কাম কর্ম্ম" ও "অহৈতুকী ভক্তির" উপাসক ও যাজক। যে যৌবনে, প্রাণিগণ ইন্দ্রিয়-চাপল্যবশতঃ স্বর্গেও পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না, আজি কালি, বঙ্গদেশে সেই যৌবনকালেও বাঙ্গালীগণ সর্ব্বত্যাগী, নিষ্কাম ও সন্ন্যাসব্রতাবলম্বী। অর্জ্জুনও নিষ্কামধর্ম্মের কথা শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন। যে অর্জ্জুন নিশীতে সঙ্গোপনে উর্ব্বশীকেও প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছিলেন, যে অর্জ্জুন বাহুবলে সসাগরা পৃথিবীর একাধিপত্যে ক্ষমবান্

হইয়াও ক্রীতদাসের ন্যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদানুসরণ করিয়াছিলেন, যে অর্জ্জুন যৌবনবতী উত্তরাকে একবৎসর গোপনে নৃত্য গীত শিক্ষা করাইয়াও তাহাকে কন্যার ন্যায় মনে করিতে পারিয়াছিলেন, সেই অর্জ্জুনও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ এবং নিষ্কামকর্ম্মের কথা শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন। নিষ্কামধর্ম্ম বুঝাইবার সময় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন।

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥
যততোঽপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনী প্রসভং হরতে মনঃ॥"

অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন! নিরাহারে থাকিলে আমাদের ইন্দ্রিয় সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকে বটে, কিন্তু আমাদের মনে বিষয়াভিলাষ থাকিয়া যায়। যখন ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখনই আমাদের মন হইতে বিষয়ের অভিলাষ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। যাঁহারা যোগী, সন্ন্যাসী, তাঁহাদের মনও দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা কুপথে পরিচালিত হয়" কিন্তু যাহা যোগী ঋষির হয় না, তাহা আমাদের হইয়াছে। সত্য বটে আমাদের মনের আঠার আনাই হিংসা দ্বেষ কলুষে পরিপূর্ণ। সত্য বটে, যুবতী মাত্রেই আমাদের আরাধ্য; সত্য বটে সুরার সাহায্য ব্যতিরেকে মুষ্টিমের অন্নও আমাদের গলাধঃকরণ হয় না; কিন্তু তথাপি আমরা নিষ্কামধর্ম্মের আচরণ করি। আমরা অহৈতুকী ভক্তির উপাসক! বেদে সকাম ধর্ম্ম আছে আমরা বেদকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিয়া থাকি। অসিত, দেবল, নারদ, কপিল প্রভৃতির পক্ষেও যে ধর্ম্ম সুকঠিন ছিল, তাহা আমাদের নিকট অতি সহজ! হা ধর্ম্ম! তুমি নিশ্চয়ই বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ!

দশবিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের দেশে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ছিল, তখন নরনারী সকলেই সকাম ধর্ম্ম আচরণ করিতেন। দেখিয়াছি, আমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি প্রগাঢ় ভক্তির সহিত দেবার্চ্চনা করিতেন। কিন্তু দেবার্চ্চনাকালে তাঁহারা বলিতেন—

"আয়ুর্দ্দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতী দেহিমে"।

এইরূপ প্রার্থনা করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হইত না। আর আমরা যে ভ্রমেও দেবতার নামগ্রহণ করি না। আমাদের জিহ্বা সকাম প্রার্থনায় নিতান্তই কাতর হয়। দেখিয়াছি আমার মাতা তিন দিন তিন রাত্রি উপবাস করিয়া আরাধ্য দেবতার নিকট সাবিত্রীর ন্যায় সতীত্ব ও এয়োভাগ্য প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার ধর্ম্ম সকাম। কিন্তু আমার পত্নী ও আমার কন্যা প্রাতঃকালে উঠিয়াই উদর পূরণের চেষ্টা করে। ইহাদের ধর্ম্মই নিষ্কামধর্ম্ম। ফলতঃ যাহারা ঈশ্বরের কাছে কোনরূপ প্রার্থনা করে, তাহাদের পক্ষে নিষ্কাম হওয়া বড় কঠিন। কিন্তু যাহারা কোনরূপ প্রার্থনাই করে না, তাহাদের পক্ষে নিষ্কাম প্রার্থনা অতি সহজ।

যাহারা সংসারে থাকিয়া, পুত্রকন্যাগণে পরিবৃত হইয়া নিষ্কামতার ভাণ করে শাস্ত্রে তাহাদিগকে কপটী ও মিথ্যাচার বলে।

ভক্তি কাহাকে বলে, ভক্তির-ক্রম কি; ভক্তির সাধন কি, অহৈতুকী ভক্তির লক্ষণ কি, প্রভৃতির সমালোচনা করিলে, বুঝাযাইবে যে ভক্তি-পথের পথিক হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। আমাদের দেশে রাজর্ষি মহর্ষি দেবর্ষিগণের প্রসাদে অনেকেই ভক্তির দোহাই দিয়া অনুষ্ঠানাদি হইতে বিরত হইতেছেন এবং অন্যকে বিরত করাইতেছেন। "মালা তিলকধারণের প্রয়োজন নাই," "পুষ্পাদি আহরণের প্রয়োজন নাই," "শুদ্ধ ভক্তি কর।" এইরূপ শ্রুতি মনোহর বাক্য পরম্পরা দ্বারা অনেকেই প্রতারিত হইতেছেন। সুতরাং প্রকৃত ভক্তি কি, এবং ঐ ভক্তির সাধন কি, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

ভক্তি অর্থে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, পুত্রের প্রতি যে মাতার অনুরাগ, অথবা স্বামীর প্রতি যে স্ত্রীর অনুরাগ ইহাতেও অনেক পরিমাণে সকামত্ব থাকে। কিন্তু যে ঈশ্বরকে কখনও দেখি নাই, যাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তাঁহার প্রতি হঠাৎ একটা নিষ্কাম অনুরাগ কি সম্ভব? যে বহুকাল ঈশ্বরের আনুগত্য করিয়াছে সে ঈশ্বরের রূপ গুণ দর্শনে মোহিত হইয়া ঈশ্বরানন্দ ভোগ করিতে করিতে নিষ্কাম রূপে ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হইতে পারে। কিন্তু যাহারা আমাদের ন্যায় মহাপাপী, ঈশ্বরের সহিত যাহাদের আলাপ পর্য্যন্তও হয় নাই, তাহারা কি বলিয়া ঈশ্বরের প্রতি নিষ্কামরূপে অনুরক্ত হয়? বরং অন্যদিকে ইহাই দেখা যায়, যে যাহারা ঘোর নাস্তিক, তাঁহারাও কামনাবশতঃ কখন কখনও ঈশ্বরের নামগ্রহণাদি করিয়া থাকে। চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেনঃ—

স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিন্ধুকূল॥

সংসারের সকল বিষয়েরই একটা ক্রম আছে। জন্মগ্রহণ মাত্রেই হাতবাড়াইয়া উত্তুঙ্গ মহিরুহের ফল সকলের গ্রহণীয় হয় না। আমরা যেরূপ বিষয়ী লোক, আমাদের মনে সেইরূপ প্রথমে সকাম অনুরাগেরই উদয় হইবে। কামনার অনুরোধে ঈশ্বরকে ডাকিতে ডাকিতে ক্রমশঃ চিত্তের নির্ম্মলতা বাড়িবে। পরে কালসহকারে ঐ সকাম অনুরাগ স্থলে নিষ্কাম অনুরাগ আসিলেও আসিতে পারে। সকাম হইল বলিয়া যদি ঈশ্বরের নাম গ্রহণে আপনি প্রথম হইতেই বিরত হন, তাহা হইলে আপনার এই মাত্র লাভ হইবে যে আজীবনে আপনি একবারও ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আমরা যখন কামনার দাস, তখন ঈশ্বরানুরাগেও প্রথম প্রথম আমাদের কামনা থাকিবে থাকুক; আপনি তাহা দেখিয়া ভীত হইবেন না। কামনার

উপলক্ষে আপনায় ঈশ্বরের সহিত প্রথম সখ্য সংস্থাপিত হউক। পরে একবার ঈশ্বরের আস্বাদ পাইলে আর ঐ কামনা থাকিবে না। "রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্টা বিবর্ত্ততে"। ধ্রুবও ত প্রথমে বিষয় কামনা করিয়াই ঈশ্বরের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিল। পরে যখন ঈশ্বরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, তখন আপনা হইতেই বিষয়কামনা ছুটিয়া গেল। বৃহৎ অপার অনন্ত সুখের কামনায় সামান্য বিষয়-কামনা ডুবিয়া গেল। ফলতঃ অনুরাগের ক্রমও এই। অতএব সমাজে যে এক্ষণে এক ভয়ানক মত উঠিয়াছে যে "অগ্রে নিষ্কাম হও, পরে ঈশ্বর প্রীতি করিবে" এই মতটি নিতান্ত ভ্রান্ত। বরং বলিতে হইবে "যে যেকারণে পার, সকামেই হউক, বা নিষ্কামেই হউক ঈশ্বরে মনোনিবেশ কর। তাহা হইতেই নিষ্কাম ধর্ম্মের অধিকারী হইবে।" যিনি প্রথমেই আপনাকে নিষ্কাম বলিয়া মনে করেন, তিনি নিষ্কামও হইতে পারেন না, এবং তাঁহার ঈশ্বরাধনাও হয় না।

প্রকৃতপক্ষে ভক্তির একটিমাত্র রূপ। কিন্তু পাত্রভেদে এই এক ভক্তিই ভিন্ন ভিন্ন রূপে কার্য্য করে। আমাদের মধ্যে যাহারা তমোগুণবিশিষ্ট তাহাদের ভক্তির প্রণালী একরূপ। রজোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির ভক্তি অন্যরূপ। সত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির ভক্তি অন্যরূপ। যাঁহারা সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণই অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের ভক্তি অন্যরূপ। ভক্তিপ্রধান ভাগবত শাস্ত্রে এই কয় প্রকার ভক্তির যে প্রকার লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

(ক) তামসি ভক্তি।

১। হিংসা জনিত ভক্তি—অর্থাৎ অন্যকে বধ করিবার জন্য, অথবা অন্যের অনিষ্ট করিবার জন্য যে ঈশ্বরানুরাগ। এই ভক্তি ভক্তির সর্ব্ব নিকৃষ্ট। কিন্তু তথাপি ইহা ভক্তি। যে ব্যক্তি শত্রুনাশ অথবা অন্য অনিষ্ট কার্য্যের জন্যও ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি করে, সে অন্ততঃ নাস্তিক অপেক্ষা অনেক ভাল।

২। দম্ভজনিত ভক্তি—যেমন ব্যভিচারিণী স্ত্রী বাহিরে পতিভক্তি দেখাইয়া ভিতরে ভিতরে অন্য পুরুষের কামনা করে, সেইরূপে কতকগুলি লোক বাহিরে ঈশ্বরানুরাগ দেখাইয়া ভিতরে ভিতরে নানা বিধ অনিষ্ট কার্য্যের কামনা করে। ইহাদের একটু ধর্ম্মভয় আছে। ইহারা অন্ততঃ বাহিরে ধার্ম্মিক। এজন্য ইহাদের ভক্তি প্রথম প্রকার ভক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

৩। মাৎসর্য্য জনিত।—অর্থাৎ অন্যে পূজা করে, আমিও করিব, আমি তাহাদের অপেক্ষা ভাল করিয়া করিব, এইরূপ মনে করিয়া যে দেবপূজা করা তাহার নাম মাৎসর্য্য জনিত ভক্তি। এই রূপ ভক্তিতে অনিষ্ঠাচারণ নাই। সুতরাং ইহা তামসী ভক্তির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

[যাহারা তমোগুণের অধীন, তাহাদের হৃদয়ে এই রূপ ক্রমে ক্রমে ভক্তির বিকাশ হয়। প্রথমে হিংসা, পরে দম্ভ, পরে মাৎসর্য্য তাহাদের ভক্তিকে প্রণোদিত করে। ভক্তি না থাকিলে হিংসা হিংসাতেই পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু ভক্তির সংযোগ থাকাতে হিংসা প্রথমে দম্ভের আকারে ও পরে মাৎসর্য্যের আকারে পরিণত হয়]

(খ) রাজসী ভক্তি

১। বিষয় লালসা জনিত যে ভক্তি—ইহাতে অন্যের অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা আদৌ নাই। আমার বিষয় সুখ ভোগ হউক, ইহাই এই ভক্তির একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং ইহা তামসী ভক্তি সমূহের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

২। যশোলিপ্সা জনিত ভক্তি—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি অপেক্ষা যশোলিপ্সা উৎকৃষ্ট, এজন্য এই ভক্তি বিষয় লোলুপ ভক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

৩। প্রভুত্ব সংস্থাপনের ইচ্ছা জনিত ভক্তি—রাজসী ভক্তির মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কারণ অন্যের অনিষ্ট না করিয়া যত প্রকার সুখ-ভোগ করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে অন্যের উপর প্রভুত্ব করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর ও প্রশংসনীয়।

[ভক্তির সাহায্যে ও ঈশ্বরের সান্নিধ্য বশতঃ হৃদয় হইতে তমোগুণ সমস্ত দূরীভূত হইয়া যায়, এবং ক্রমে ক্রমে রজোগুণের সঞ্চার হয়। রজোগুণের সঞ্চার হইলে ভক্তির ও প্রকার বিভিন্ন হইতে থাকে।]

(গ) সাত্বিকী ভক্তি

১। আমার পাপ নষ্ট হউক এইরূপ কামনা করিয়া যে ভক্তি।

২। আমার ভগবানে প্রীতি হউক এইরূপ কামনা করিয়া যে ভক্তি।

৩। শাস্ত্রের আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপাল্য এইরূপ মনে করিয়া যে ভক্তি—ইহাতে স্পষ্ট রূপ কোন কামনা নাই, কিন্তু অস্পষ্ট রূপে আছে। এজন্য ইহা সগুণ ভক্তির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

[ভক্তির সাহায্যে ও ঈশ্বরের সান্নিধ্যে হৃদয় হইতে রজোগুণ সমস্ত তিরোহিত হইয়া যায় এবং তখন হৃদয়ে সত্বগুণের আবির্ভাব হয়। সত্বগুণের উদয় হইলে হৃদয় মধ্যে সাত্বিকী ভক্তিরও উদয় হয়।]

(ঘ) আহৈতুকী ভক্তি

এই ভক্তির লক্ষণ এই—

১। কামনা মাত্রেরই অভাব।

২। ভেদজ্ঞান শূন্যতা—অর্থাৎ আমার দুঃখ আমার সুখ আমার সুখে অন্যের সুখ এইরূপ ভেদবুদ্ধির অভাব।

৩। অনবচ্ছিন্নতা—অর্থাৎ গঙ্গার শ্রোত যেমন অবিরোধে সাগরের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপে ভক্তের হৃদয় ও অবিরামে ঈশ্বরের দিকে প্রবাহিত হইবে।

এই চারি প্রকার ভক্তির মধ্যে (ক) (খ) (গ) এই তিন প্রকার ভক্তির সাধারণ নাম সগুণা ভক্তি, এবং অহৈতুকী (ঘ) ভক্তির নাম নির্গুণা ভক্তি।

আমাদের মধ্যে সভায় ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিয়ম নাই। কারণ সভায় তমোগুণ, সত্বগুণ, রজোগুণ এই তিন গুণাবলম্বী মনুষ্যই উপস্থিত থাকে। ইহাদের সকলের জন্য একরূপ ধর্ম্ম নহে। গুরু শিষ্যের নৈতিক অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে তাহার অবস্থার উপযোগী ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিবেন। যে বর্ণপরিচয় পড়িবার উপযুক্ত, তাহাকে বর্ণপরিচয় দিবেন। যে কালীদাসের ভাবগ্রহণে সমর্থ তাহাকে কালিদাস দিবেন। এবং যিনি বেদান্তের উপযুক্ত তাঁহাকে বেদান্ত দিবেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে কোনরূপ প্রকৃত কার্য্য করিতে এই নিয়মেই চলিতে হইবে। আর যদি ধর্ম্ম কেবল মুখের কথা হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মশিক্ষা কেবল যেখানে সেখানে পাত্রে অপাত্রে অহৈতুকী ভক্তি প্রদান করিবেন। অবশ্য নির্গুণা ভক্তিই আমাদের চরম লক্ষ্য। আমার এইমাত্র বক্তব্য যে সগুণা ভক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে এই নির্গুণা ভক্তি লাভ করা যাইবে না। আমাদের ন্যায় লোকের ভক্তি প্রথমে সগুণা হইবেই হইবে। তজ্জন্য ভীত বা নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। কারণ সগুণা ভক্তিই ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত, ও বিশুদ্ধীকৃত হইয়া নির্গুণা ভক্তির আকার ধারণ করে।

যে যে উপায়ে বা যে যে প্রণালীতে ভক্তি উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হয়, এক্ষণে তাহাদেরই নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

১ম। ভগবৎ কথা শ্রবণ—(ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় এবং সকলেরই সাধ্যায়ত্ত)

২য়। ভগবৎ গুণ কীর্ত্তন—(ইহা প্রথম উপায় অপেক্ষা কঠিন হইলে ও সহজ উপায় বটে)

৩য়। ভগবদ গুণ স্মরণ—ঐরূপ (অর্থাৎ ২য় উপায় অপেক্ষা কঠিন)

৪র্থ। ভগবৎ পদ সেবন—ঐ রূপ

৫ম। অর্চ্চন ঐ

৬ষ্ঠ। বন্দন ঐ

৭ম। দাস্য ঐ

৮ম। সখ্য ঐ

৯ম। আত্মনিবেদন ঐ

১০। নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যকলাপের যথা শাস্ত্র অনুষ্ঠান

১১। প্রতিমাদি দর্শন, স্পর্শন, বন্দন ইত্যাদি

১২শ। সকল প্রাণিকে ঈশ্বরের সত্বায় অনুভব

১৩শ। ধৈর্য্য ও বৈরাগ্য

১৪শ। উৎকৃষ্টের প্রতি সম্মান, দীনের প্রতি দয়া, তুল্যের সহিত মৈত্র

১৫শ। বাহেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় পরাজয়

১৬শ। আত্মতত্ত্ব শ্রবণ

১৭শ। সপ্রেমে নামসংকীর্ত্তন

১৮শ। সরলতা

১৯শ। সৎসঙ্গ

২০শ। নিরহঙ্কার

উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াই ভক্তিমার্গে বিচরণ করিতেন, বহুকালের পরীক্ষা দ্বারা এই সমস্ত উপায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও ফলপ্রদ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমরাও ঐ সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াই কৃতার্থ হইতে পারি। আমাদের অন্য আধুনিক উপায় সমস্ত অবলম্বনের প্রয়োজন নাই।

মনুসংহিতা।

গতবারের প্রবন্ধে আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে ভগবান মনুদেব শূদ্রাদি জাতিদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া তাহাদের উপর কোনরূপ কঠোর নিয়ম এবং শাসনাদির ব্যবহার করেন নাই। যে দোষী যে পাপী তাহারই উপর তিনি তীব্র দণ্ডাজ্ঞার আদেশ করিয়াছেন। পাপী ব্রাহ্মণই হউন, আর শূদ্রই হউন; অথবা ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্যই হউন মনুর শাসন সাগরতরঙ্গের ন্যায় সকলের উপর সমভাবে সংক্রামিত হইত। যদি স্বয়ং সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতির জন্মদাতা পিতা, এবং তাঁহারই পরম বন্দনীয় আচার্য্য দেব, একান্ত আত্মীয় বন্ধু, অতীব প্রাণপ্রতিম পুত্র, স্নেহের মূর্ত্তিস্বরূপিণী মাতা, প্রাণাধিক প্রিয়তমা ভার্য্যা, নিত্য শুভানুধ্যায়ী পুরোহিত প্রভৃতি গুরু ও স্বজনবর্গও কোনরূপ পাপাচরণে অপরাধী হন তথাপি রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবেন না। এমন কি স্বয়ং রাজাও যদি দোষী হন তাঁহাকেও মনুর মতে উপযুক্ত দণ্ডের ভাগী হইতে হইবে। মনু বলিতেছেন,—

পিতাচার্য্যঃ সুহৃন্মাতা ভার্য্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যোনাম রাজ্ঞোঽস্তি যঃ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি॥
কার্ষাপনং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতোজনঃ।
তত্র রাজা ভবেদ্দণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা॥

মনু, ৮ম, ৩৩৫।৩৩৬।

অর্থ।—পিতা আচার্য্য সুহৃৎ পুত্র মাতা ভার্য্যা পুরোহিত ইহাঁরা যদি স্বধর্ম্মে না থাকেন রাজা ইহাঁদিগকেও দণ্ড করিতে ত্রুটি করিবেন না। যে অপরাধে রাজা ভিন্ন অন্য প্রাকৃত জনের একপণ দণ্ড হইতে পারে, এরূপ অপরাধ যদি রাজা স্বয়ং করেন তবে রাজার সহস্র পণ দণ্ড হইবে।

এক্ষণে কথা উঠিতে পারে "স্বীকার করিলাম যে ভগবান মনুদেব সকলেরই উপরই দণ্ডের বিধান করিয়াছেন। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজা ধিরাজ চক্রবর্ত্তি হইতে অতি দীনহীন সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত, সমস্ত জাতির শীর্ষ স্বরূপ ব্রাহ্মণ জাতি হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত কেহই মনুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। কিন্তু এতগুলি লোকের মধ্যে কোন স্থানেই দেখিলাম না যে এক প্রকার পাপের জন্য সকলকেই সমান দণ্ডের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যেমন মনে করুন ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষত্রিয় ইহাঁদের মধ্যে যদি কেহ সুরা পান করেন, তাহা হইলে অগ্নিবর্ণ অর্থাৎ জ্বলন্ত সুরা পান করিয়া স্বদেহ দগ্ধ করিতে আজ্ঞা দেওয়া হইল। কিন্তু যদি কোন শূদ্র সুরা পান করেন, তাহা হইলে তাহার এই অধর্ম্মাচরণের কোনই শাসন নাই। আবার যদি কোন শূদ্র ব্রাহ্মণকে আঘাত করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি অতি ভীষণ দণ্ডের আজ্ঞা ব্যবস্থা হইল। অথচ একজন ব্রাহ্মণ যদি অন্য একজন ব্রাহ্মণকে প্রহার করেন, তবে সামান্য দণ্ডেতেই নিষ্কৃতি পাইবেন। দ্বিতীয়তঃ যেস্থলে পাপের কোনরূপ সম্ভাবনাই নাই, প্রত্যুত পরম উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে সেখানেও শূদ্রের জন্য দ্বার অবরুদ্ধ। যেমন মনে করুন যে বেদাদি শাস্ত্র ব্রাহ্মণের পক্ষে নিত্য অধ্যয়ন বিধি করিলেন, সেই বেদ শূদ্রে অধ্যয়নত দূরের কথা, শ্রবণ করিলেও ঘোরতর কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে মনু শূদ্রাদি ব্যক্তিবিশেষকে স্বতন্ত্র চক্ষে দেখিতেন।"

এ আপত্তিটি শ্রবণযোগ্য বটে। আজকাল সাধারণতঃ শাস্ত্রবিরোধীগণ এই আপত্তিটা লইয়াই তুমুল আন্দোলন করিয়া থাকেন। এবং ইহা যে একবারে গর্হিত, ইহার কোন উত্তর অথবা সামঞ্জস্য নাই ইহাই স্থির করিয়া আপনাদের গণ্ডি গাড়িয়া বসেন। কিন্তু এটি সাধারণতঃ যত গুরুতর বলিয়া মনে হয় তত গুরুতর নহে। তবে কি না আমাদের দৃষ্টিটা নিতান্তই বিকৃত হইয়াছে, নিজের অস্তিত্বটা একবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা সূচনাতেই বলিয়া আসিয়াছি যে, যাহা কিছু আমরা দেখিব শুনিব বা বুঝিব তৎসমস্তই আমরা বিদেশীয় ভাবে দেখিতে শুনিতে বা বুঝিতে চাই। আমাদের দেশীয় দৃষ্টিটা একবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। শাস্ত্রকে আর দেশীয় চক্ষে দেখিতে পারি না; সুতরাং শাস্ত্র সম্বন্ধেও আমাদের দেখা, শুনা, কিংবা বুঝা সমস্তই অন্যরূপ হইয়া পড়ে। আমাদিগের আচার্য্যদেব গত সংখ্যার "উন্নতি কি অবনতি" প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তার করিয়া বুঝাইয়াছেন সুতরাং পুনরায় এস্থলে এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি না।

প্রথম দেখা যাউক শূদ্রাদির বেদাদি শাস্ত্র "অধ্যয়ন" করা নিষেধ বা পাপজনক বলিয়া গণ্য হইবে কিসে? এই বিষয়টি বুঝিতে হইলে প্রথমে "অধ্যয়ন" কাহাকে বলে, ঋষীরাই বা "অধ্যয়ন" শব্দ কি অর্থে

ব্যবহার করিতেন এবং সেরূপ অধ্যায়নের ফলই বা কি হইত এই সমস্ত বিষয় গুলি বিশেষ করিয়া আলোচনা করা বিধেয়। কেন না আজ কাল যেরূপ অধ্যয়নের প্রথা প্রচলিত এরূপ অভিনব অভূতপূর্ব্ব অধ্যয়নের প্রণালী এ দেশে কোন কালেই প্রচলিত ছিল না। বিদেশীয় স্কুল শিক্ষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই নূতন ধরণের অধ্যয়নের সৃষ্টি হইয়াছে। আমার একটি গল্প মনে আসিল। নিজের এবং পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জন্য এই স্থলেই সন্নিবেশিত করিলাম।

কোন সময় একদিবস রাত্রি কালে নৈহাটির কএকজন মদ্যপায়ী বাবু উন্মত্তাবস্থায় সকলে যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন যে, আজ রাত্রিটা বাঁচ্ খেলিয়া কাটাইব। সকলে গঙ্গায় আসিয়া একখানি নৌকায় উঠিয়া একজন হাল ধরিলেন এবং অন্যান্য সকলে দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিলেন। নৌকায় রক্ষক কেহই ছিল না। সুতরাং নেশার ঝোঁকে মনের স্ফূর্ত্তিতে সমস্ত রাত্রি দাঁড় টানিয়া মনে করিলেন যে, না জানি কতদূর আসিয়াই পড়িয়াছি, আজ আর না; এই খানেই বিশ্রাম লওয়া যাউক। এই বলিয়া ক্ষণকালের জন্য তন্দ্রাযুক্ত হইলেন। এদিকে রাত্রিও প্রভাত হইল। বাবুগণের নেশার ঝোঁকও কতক পরিমাণে উপশমিত হইল। উঠিয়া দেখেন নৌকাখানি একটি সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকায় যেখানকার নৌকা সেই খানেই আছে তাঁহারা বৃথা সমস্ত রাত্রি পণ্ডশ্রম করিয়াছেন।

আমাদেরও শিক্ষার অবস্থা ঠিক ঐরূপই হইয়াছে। আমারাও সেই রূপ উন্মত্তাবস্থায় পড়িয়া মনের স্ফূর্ত্তিতে আপন আপন মনোবৃত্তিরূপ ক্ষেপণী দ্বারা বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্ররূপ নৌকা খানিকে টানাটানি করিয়া বাহিয়া লইতেছি, কিন্তু যখন আমাদের এই উন্মত্তাবস্থা অন্তর্হিত হইবে অর্থাৎ যখন প্রাকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইব তখন দেখিব যে সমাধিপরিমার্জ্জিত নিতান্ত নির্ম্মলচেতা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ঈশ্বরকল্প মহর্ষিগণের হৃদয় স্থূর্ণাতে বেদ নৌকা সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে। কাহার সাধ্য যে ক্রোড়ার ছলে সেই অনন্ত জ্ঞান পরিপূরিত বেদাদি শাস্ত্র-তরণী রেখা মাত্র অপসারিত করিতে পারে? অথচ আমরা চিরদিন পর্য্যন্ত কত পরিশ্রম, কত বল ক্ষয়, কত বুদ্ধি ক্ষয় করিয়া আসিলাম কিন্তু যেখানকার বেদ সেই খানেই থাকিল আমাদের পরিশ্রম বৃথা হইল। তাই বলিতেছিলাম আমাদের যে অধ্যয়ন ইহা ঋষিদিগের কথিত অধ্যয়নের সহিত তুলনীয়ই নহে। সে অর্থে আমাদের অধ্যয়ন "অধ্যয়ন" পদ বাচ্যই হইতে পারে না। ইহাতে কেবল বুদ্ধি ক্ষয়, বল ক্ষয়, আয়ুক্ষয়, আত্মার অধোগতি প্রভৃতি যাবতীয় অনিষ্টই সংঘটিত হয় কোনরূপ কল্যাণের আশা একবারেই অসম্ভব। ফলতঃ এরূপ অধ্যয়নে কেবল শূদ্র কেন যবন, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল প্রভৃতি সমস্ত জাতিরই (বেদ হইতে তন্ত্র পর্য্যন্ত যে কোন শাস্ত্র) সমান অধিকার আছে। এরূপ "বিলাতি অধ্যয়নে" শাস্ত্রের

কোন আপত্তিই নাই। তবে যে "অধ্যয়ন" শাস্ত্র কেবল বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের প্রতি বাধা দিয়াছে, সে "অধ্যয়ন" কাহাকে বলে তাহাই আজ যাথাসাধ্য আলোচনা করিব।

প্রাচীনকালে 'অধ্যয়ন' কথার অর্থে তিনপ্রকারে শাস্ত্রার্থ গ্রহণ করা বুঝাইত। প্রথম শাস্ত্রের বাক্যার্থ গ্রহণ করা অর্থাৎ শাস্ত্রের আদ্যোপান্ত কথাবলী শ্রবণ করিয়া তৎসমস্তের প্রকৃত বাক্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করা। ২য়, শাস্ত্রীয় বাক্যাবলীর দ্বারা যে অর্থ জানা হইল, তাহাকে আবার নানাপ্রকার সদ্যুক্তি ও মীমাংসা দ্বারা অবধারণ করা। ৩য়, সেই বিষয়গুলি আপন হৃদয়ে অনুভব করা, অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী সুখ, দুঃখ প্রভৃতি যেরূপ অন্তরে অন্তরে সুস্পষ্ট মানসিক প্রত্যক্ষ করা হয়, সেইরূপ অন্তদৃষ্টিতে দেখা। যতক্ষণ এই তিন প্রকার জ্ঞানের দ্বারা শাস্ত্রার্থ আয়ত্ত করা না হয় ততক্ষণ পূর্ণ অধ্যয়ন হইল না। যদি কেবল বাক্যার্থ জ্ঞান বা যুক্তি জনিত জ্ঞান জন্মে তবে অধ্যয়নের কিয়দংশ মাত্রই হইল, ইহা বলিতে হইবে, কারণ অধীত বিষয়ের অন্তরে অন্তরে প্রত্যক্ষ করাই অধ্যয়নের মুখ্য অঙ্গ এবং প্রধান লক্ষ্য। অবশ্যই, এখন বলা বাহুল্য যে এই তিন অঙ্গ বিশিষ্ট অধ্যয়ন কেবল অধ্যাত্মতত্ত্বপ্রকাশকশাস্ত্র সম্বন্ধেই সম্ভবে, তদ্ব্যতীত যে সকল শাস্ত্র কেবল বাহ্যার্থ প্রকাশক তাহার অধ্যয়ন বিষয়ে এই নিয়ম সংলগ্ন হয় না। কারণ আধ্যাত্মতত্ত্ব যাহা কিছু আছে, তাহাই সুখদুঃখাদির ন্যায় অন্তরে অন্তরে মানসিক প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে, যেহেতু তাহা আমার হৃদয়ের মধ্যে, আত্মার মধ্যেই আছে। কিন্তু যাহা বাহিরের বস্তু তাহা আমার আত্মার মধ্যে নাই সুতরাং তাহা মনে মনে প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব সুতরাং তাহাদের কেবল, ঐ শেষোক্ত জ্ঞানটি ভিন্ন ১ম, ও ২য় প্রকার জ্ঞানই হইয়া থাকে।

বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, ও ধর্ম্মসংহিতাদি সমস্ত শাস্ত্রগুলি আধ্যাত্ম তত্ত্বপ্রকাশক। সুতরাং তাহারই উক্ত তিন অঙ্গবিশিষ্ট অধ্যয়ন হইয়া থাকে। আর, প্রাকৃত-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, শরীরস্থান, শিল্পবিজ্ঞান, এবং জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রগুলি বাহ্যতত্ত্ববিষয়ক, অতএব ইহাদের কেবল পূর্ব্ব কথিত দুই অঙ্গবিশিষ্ট অধ্যয়নই হইতে পারে, অর্থাৎ বাক্যার্থজ্ঞান আর যুক্তিও মীমাংসাজনিত জ্ঞান মাত্র হইতে পারে।

নিম্নলিখিত প্রমাণের দ্বারই ইহা স্বীকৃত হইতে পারে। আমরা দেখিতেছি যে, মনু উপনিষৎ (শ্রুতি) এবং বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রই বেদ প্রভৃতি অধ্যাত্ম শাস্ত্র অধ্যয়নে অধিকারীর নিরূপণ করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই এইরূপ বলিয়াছেন যে সদাচার, সদাহার ও ব্রত অনুষ্ঠানের দ্বারা দেহ এবং মন হইতে সমস্ত তামস ও রাজস ভাব বিদূরিত হইয়া সত্ত্বগুণের বিকাশে চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা গ্রহণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইলে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। যথা মনু "নিষেকাদি শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যো দিতো বিধিঃ। তস্য শাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়ো নান্যস্য কস্যচিৎ॥"

ভাবার্থ,—নিষেক অবধি সমস্ত প্রকার সংস্কারের দ্বারা যাঁহার দেহও আত্মা নিতান্ত নির্ম্মলীকৃত হইয়াছে, তাঁহারই এই ধর্ম্মসংহিতায় অধ্যয়নের অধিকার আছে। যাহাদের দেহ ও আত্মা ঐরূপ বিশুদ্ধ হয় নাই, তাহাদের এই শাস্ত্রে অধিকার নাই।" এবং "উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচ মাদিতঃ। আচর অগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসন মেবচ।"

ভাবার্থ.—আচার্য্য, বেদাধ্যাপনের নিমিত্ত শিষ্যকে উপনীত করাইয়া দেহও আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত প্রথম শৌচ শিক্ষা দিবেন এবং আচার, অগ্নি পরিচর্য্যা, সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষা করাইবেন"।

"ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্ম নিষ্ঠা, স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ। তেষামেবৈতাং ব্রহ্ম বিদ্যাং বদেতং শিরোব্রতং বিধিবদ্যৈস্তু চীর্ণং (ঋক্) ভাবার্থ,—"যাহাঁরা পবিত্রীকৃতদেহান্তরাত্মা আত্মানিষ্ঠ এবং একর্ষ নামক অগ্নিহোমকারী, নিতান্ত শ্রদ্ধাবান, যাঁহারা রীতিমত শিরোব্রত আচরণ করিয়াছেন এইরূপ ব্রাহ্মণদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে" "তান্ হ স ঋষিরুবাচ ভূয়এবতপসা শ্রদ্ধয়া ব্রহ্মচর্য্যেণ সম্বৎসরং সম্বৎস্যথ যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত, × × "—প্রশ্নোপনিষদ,

সুকেশা, শৈব্য, গার্গ, আশ্বলায়ণ ভার্গব, কবন্ধি এবং কাত্যয়ন প্রভৃতি ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণকুমারগণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ পিপ্পলাদ মহর্ষির নিকট উপনীত হইলেন। পিপ্পলাদ মহর্ষি বলিলেন "হে ব্রাহ্মণ কুমারগণ তোমরা যে কিছু ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়াছ তাহাতে তোমাদের চিত্ত অধ্যাত্মতত্ত্বাধ্যয়নের উপযুক্ত হয় নাই অতএব আরও একবৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, এবং শ্রদ্ধাতিশয্য সহকারে সবাস কর, তৎপর যাহা ইচ্ছা প্রশ্ন কর, কারণ তাহা হইলেই তোমাদের বুঝিতে অধিকার জন্মিবে।" এইরূপ শত শত স্থানে অধিকারীর বিষয় লিখিত আছে।

এখন ভাবিয়া দেখুন, অধ্যয়ন যদি কেবল শ্রবণ জন্য জ্ঞান আর বিচার তর্কজনিত জ্ঞানই হইত তবে অধিকারী লইয়া এত পাড়াপীড়ী কেন? বাক্যার্থ জ্ঞান আর বিচার তর্কের দ্বারা আনুমানিক জ্ঞান হইতে হইলে এত তপস্যা এত ব্রহ্মচর্য্য এত কঠোর তিতিক্ষাদির দ্বারা দেহ ও মনকে এত নির্ম্মল বিশুদ্ধ ও পাপমুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিতে বলিবেন কেন? ঐ রূপ জ্ঞানতো যে কোন অবস্থায় যে কোন রকমেই হইতে পারে? কিন্তু তৃতীয় প্রকার জ্ঞান, অর্থাৎ অধ্যাত্মতত্ত্ব সকলের মনে মনে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা সকলের নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা নিতান্ত মলিন থাকে এবং কদাচার কদাহার কুব্রতাদির দ্বারা দেহ ও চিত্ত জড়িত হইয়া তম ও রজঃ শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে ততক্ষণ সে ইন্দ্রিয়াদি বিনিবর্ত্তন করিয়া অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ করিতেই পারে না। তাহার অনুভব, চিন্তা, জ্ঞান, ধ্যান, সমস্তই বাহিরে বাহিরে পর্য্যবাসিত হয়। সে অন্তঃসার শূন্য (ইহার বিচায় "অন্তঃসার কাহাকে বলে" প্রবন্ধে এই বারেই আচার্য্যদেব করিয়াছেন) অতএব তাহার ঐ তৃতীয় জ্ঞান অর্থাৎ আধ্যাত্ম-

তত্ত্বের মানসিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না তাই অধ্যয়নের প্রথমে দেহ ও মনকে প্রস্তুত করিতে বলিয়াছেন। অতএব আর্য্যগণ অধ্যয়ন বলিলে মুখ্য কল্পে মানসিক প্রত্যক্ষ করাই বুঝিতেন।

দ্বিতীয়তঃ, অনেকস্থলে সুস্পষ্টই উল্লেখ আছে যে অধ্যাত্ম শাস্ত্র হইতে বাক্যার্থ জ্ঞান এবং তাহার মানসিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। "জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ। * *" (ভগব-দগীতা) "জ্ঞানং শাস্ত্রোক্ত পদার্থানাং পরিজ্ঞানং, বিজ্ঞানন্ত তথা জ্ঞাতানাং তথৈবানুভব করণম" (শাং ভাষ্য)। "শাস্ত্রের বাক্যার্থ জ্ঞানকে 'জ্ঞান' আর সেই গুলিকে মনে মনে প্রত্যক্ষ করাকে 'বিজ্ঞান' বলে। যিনি শাস্ত্র পাঠজনিত জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের দ্বারা পরিতৃপ্ত ইত্যাদি।" এবং শ্রুতি "বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ, সংন্যাস যোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধ সত্ত্বাঃ" "বেদান্ত শাস্ত্রের বাক্যার্থ বোধ এবং তাহার মানসিক প্রত্যক্ষ দ্বারা যাঁহার প্রকৃতার্থের নিশ্চয় ধারণা হইয়াছে, * *" ইত্যাদি। অতএব দেখা গেল যে কেবল বাক্যার্থ জ্ঞান বা তর্ক বিচার জনিত জ্ঞানকেই আর্য্যগণ জ্ঞান বলিতেন না, কিন্তু তাঁহারা মানসিক প্রত্যক্ষানুভব কার্য্যই মুখ্যাধ্যয়ন বলিয়া গণ্য করিতেন। অতএব যাহারা এইরূপ অধ্যয়নের ক্ষমতাবান্ তাহা-দিগকেই বেদাদি অধ্যয়নের আদেশ আছে, আর যাঁহারা অক্ষম তাঁহাদিগকে অধ্যয়ন নিষেধ করিয়াছেন। সুব্রাহ্মণগণ অধ্যাত্মতত্ত্বানুভবে সক্ষম তাই তাঁহাদিগকে অধ্যয়ন বিধি দিয়াছেন, আর শূদ্রাদি এবং স্ত্রীলোক তাহাতে অক্ষম তাই তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। এমন কি ব্রাহ্মণ হইলেও যিনি অব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছেন "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধুনাং ত্রয়ীনশ্রুতি গোচরাঃ" (মনু) "স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং অব্রাহ্মণ ইহাদিগের বেদধ্যয়ন বা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে"।

বিশি: এই বচনটি দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে ঋষিগণ বিদ্বেষ পরবশ হইয়া বেদাদি অধ্যয়নের নিষেধ করেন নাই, কারণ যদি বিদ্বেষানুবর্ত্তি হইয়া নিষেধ করাহইত তবে কেবল শূদ্রকে নিষেধ না করিয়া অব্রা-হ্মণ এবং স্ত্রীলোককেও নিষেধ করিবেন কেন? অবশ্যই তাঁহাদের মাতা, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতিও স্ত্রীলোক মধ্যেই ছিলেন এবং তাঁহাদেরই পুত্র পৌত্রাদিগণও কেহ না কেহ অব্রাহ্মণের কার্য্য করিত তবে অব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য হইত অতএব তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ থাকা বা ঘৃণা থাকা কখনই সম্ভবপর নহে, তবে কেবলমাত্র সত্যানুরোধই ইহার কারণ বলিতে হইবে।

আরও দেখুন, কেবল শূদ্র কেন, বৈশ্য ক্ষত্রিয়দিগেরও সম্পূর্ণ অধ্যয়নে অনুমোদন করেন নাই "অধ্যতবাং নচান্যেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ং বিনা।" ভাবার্থ, ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহই পুর্ণ অধ্যয়ন করিতে পারিবেন না, বৈশ্য কোন কোন অংশ পড়িতে পারেন ক্ষত্রিয়ও সকল পারেন না।" ইহাতেও কি বিদ্বেষ পরবশতার আশঙ্কা মনে হয়?

প: অনেকে বলিতে পারেন যে "ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ পবিত্রীকৃত হইয়া অধ্যয়নের বিধি আছে, শূদ্রাদিরও ঐরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা অধিকারী হইয়া অধ্যয়নের বিধি নাই কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলি, যাহার বীজ থাকে তাহারই সংস্কার সম্ভব, আর যাহার বীজই আদৌ নাই তাহার আর সংস্কার বা বিশোধন কি? ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মতত্ত্বানুভবের ক্ষমতাবীজ আছে, তাহাই ব্রতনিয়মচর্য্যাদির দ্বারা বিশোধিত হইলে অধ্যয়নের ক্ষমতা বিকসিত হইল। আর শূদ্রাদির সেই বীজ নাই সুতরাং তাহার ব্রতনিয়মাদির দ্বারা সংস্কারও নাই, সুতরাং তাহার সংস্কার পূর্ব্বক অধ্য-য়নের বিধি কিরূপ থাকিবে?

একথাও অনেকের অনেক রকম আপত্তি হইতে পারে কিন্তু তাহা এখন মীমাংসার সময় নাই তবে একটিমাত্র কথা বলিব ইহা দ্বারাই সমস্ত বুঝিয়া লইতে পারিবেন। ঋষিপ্রণীত অধ্যয়নের নিয়মটা কিন্তু অনেক দিন হইতেই শিথিল হইয়া গিয়াছে অনেক দিন হইতেই ভারতবর্ষে শূদ্রাদি জাতি নানাপ্রকার শাস্ত্র পড়িয়া আসিতেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ঐ সকল অধ্যয়নের দ্বারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া, ব্রাহ্মণ ব্যতীত একটি লোককেও প্রকৃত পরম হংস হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্বেষণ করিলে ব্রাহ্মণের মধ্যেই যাহা দুই চারিটি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার অব্রাহ্মণের মধ্যেও শূদ্রের দশাই দেখিতে পাওয়া যায়।

অদৃষ্টবাদ।

বর্ত্তমান সময়ে, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগকে, অদৃষ্টবাদী বলিয়া অনেকে কটাক্ষ করেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে অদৃষ্টবাদে লোকের পুরুষ-কারের প্রতি অবহেলা হয়, পুরুষকারই পুরুষার্থলাভের উপায়, উন্নতির সোপান, উহার প্রতি অবহেলায় উন্নতির পথে লোক অগ্রসর হইতে পারে না। সুতরাং অদৃষ্টবাদ প্রচার করিয়া, হিন্দুগণ, উন্নতির পথে কণ্টক বিকীর্ণ করিয়াছেন"!

হিন্দুজাতির এই অকারণ অপবাদ দূরীকরণকামনায় আর্য্যগণ অদৃষ্ট শব্দ কি অর্থে ব্যবহার করেন এবং ঐহিক ও পারলৌকিক কার্য্যের সহিত উহার কিরূপ সম্বন্ধ তদ্বিষয়ে আমরা যথাশক্তি আলো-চনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিষয় অতি দুরূহ লৌকিক ব্যক্তিমাত্রই ভ্রম প্রমাদের বশবর্ত্তী; আমাদের ভ্রম প্রমাদ ঘটিলে, বিচক্ষণ পাঠক বর্গ, তৎপ্রদর্শনে উপকৃত করিবেন আমরা ইহা প্রত্যাশা করিতে পারি।

তাঁহাদের বিশ্বাস, হিন্দুগণ এইরূপ অদৃষ্ট মানেন যে,—"ঈশ্বরই আমাদিগকে সকল কার্য্য করাইতেছেন, তাঁহারই ইচ্ছায় আমরা কোন

কার্য্যে প্রবৃত্ত এবং কোন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতেছি; বিহিত কার্য্যের লঙ্ঘন, ও প্রতিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে আমাদের কোন প্রকার কর্তৃত্ব নাই সুতরাং তন্নিবন্ধন আমাদের কোন দোষ বা গুণ নাই।" অতএব এ অদৃষ্টবাদের দ্বারা গুরুতর অনিষ্ট হইতেছে। কিন্তু আমরা যতদূর জানি তাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রাদির কোন স্থানেও এইরূপ কল্পনাকে অদৃষ্টবাদ বলিয়া উপপন্ন হয় নাই। উ[illegible] শাস্ত্রীয় হইলে, বলা যাইতে পারে যে শাস্ত্রকারগণ পুরুষকার পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা এখনকার কল্পিত মত। বাস্তবিক, শাস্ত্রে যাহাকে অদৃষ্ট বলে তাহা সম্পূর্ণ অন্য, তাহা পরেই বলিব। আপাততঃ আমরা দেখাইব যে, শাস্ত্রে যে ঈশ্বর কর্তৃত্ব বাদ আছে, তাহাও ঠিক ঐরূপ নহে, এবং তদ্দ্বারা পুরুষকারের শৈথিল্য হইয়া উন্নতি পথে কণ্টক নিক্ষেপ করা হয় নাই, প্রত্যুত তাহা বুঝিতে পারিলে পুরুষকারের বিশেষ আবশ্যকতাই মনে হয়।

ভগবদ্গীতা কি বলিতেছেন দেখুন,

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

এই দুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন যে—ভগবান্ এই শরীর স্বরূপ যন্ত্রে আরূঢ় সমস্ত জীবকে আপন শক্তি দ্বারা নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া সকল প্রাণীর হৃদ্দেশে বাস করিতেছেন, হে অর্জ্জুন। তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই পরমেশ্বরের শরণ লও, তাহা হইলে তাঁহার প্রসাদে তুমি পরম শান্তি স্বরূপ মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

মনুষ্যের নিজকর্ম্মে কর্তৃত্ব ও স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে, ভগবানের শরণাপন্ন হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করা অসঙ্গত হয়। অতএব ঋষিগণের সিদ্ধান্ত এই ঈশ্বর সকল কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও মনুষ্যের স্ব স্ব কার্য্যে এতাবৎ কর্তৃত্ব আছে—যে নিজ নিজ কার্য্যের দোষ গুণ তাহাদিগকে স্পর্শ করে।

মহর্ষিগৌতম স্বকৃত ন্যায় সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় আহ্নিকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষ কর্ম্মাফল্য দর্শনাৎ।"

পুরুষ চেষ্টার বিফলতা দৃষ্ট হয়—অতএব কেবল ঈশ্বরই কারণ এই কেন বলি না?

উত্তর—

"ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ।"

পুরুষকার ব্যতিরেকে ফল নিষ্পন্ন হয় না। অতএব পুরুষকারও কারণ।

উল্লিখিত প্রশ্নোত্তর দ্বারা প্রাগুক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে।

এই ক্ষণ নিরূপিত হইতে পারে যে মনুষ্যগণ, স্ব স্ব কার্য্যে স্বতন্ত্র, ও তজ্জন্য পাপ পুণ্যভাগী, ইহা স্বীকার করিয়াও ঈশ্বর সমুদায় কার্য্যের কর্ত্তা ইহাই ঋষিগণ উপদেশ করেন। এতদ্দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে এক কার্য্যে দুই ব্যক্তি কর্তৃত্ব করিতেছেন, অথচ তন্মধ্যে এক ব্যক্তি (জীব) পাপপুণ্য ভোগী অপর ব্যক্তি (ঈশ্বর) তাহাতে নির্লিপ্ত। শ্রুতিতেও এইরূপ বর্ণনাই দেখা যায়,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।"

দুই সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী (জীব ও ঈশ্বর) এক বৃক্ষ (শরীর) অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন এবং পরস্পরের সখা। তন্মধ্যে একটি (জীব) ঐ বৃক্ষের ফল (সুখ দুঃখ) ভোগ করেন অন্যটি (ঈশ্বর) নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন মাত্র করেন।" এই শ্রুতিবাক্যও প্রাগুক্ত সিদ্ধান্তই প্রমাণ করিতেছে। ঈশ্বর সর্ব্বকার্য্যে কর্ত্তা হইলেও মনুষ্যের স্বীয় কার্য্যে কর্তৃত্ব ও স্বাতন্ত্র্য আছে দৃষ্টান্ত দ্বারাও ইহা বুঝিতে পারা যায়। আমরা দেখিতেছি, এক ধনে, স্বামীর স্বত্ব, স্ত্রীর স্বত্বকে বাধা করে না; একই ভূমিতে রাজার স্বত্ব প্রজা স্বত্বের প্রতিবন্ধক হয় না, এক কার্য্যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও তদ্রূপ মনুষ্যের কর্তৃত্বের বাধা জন্মায় না, ইহা বলিতে পারা যায়। এখন আর এক প্রশ্ন করিতে পারেন যে ঈশ্বর এবং জীব উভয়েরই কর্তৃত্ব থাকিলে পাপপুণ্য কেবল জীবকে স্পর্শ করে ঈশ্বরকে করে না—ইহার কারণ কি? এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে গুণাতীত ভগবানের গুণ ও স্বরূপ বিষয়ে বিচার করিতে আমাদের শক্তি নাই; তবে মানুষের নাকি ধৃষ্টতার পরিসীমা নাই, তাই সে যদি, যাঁহার কৃপায় বুদ্ধির বিকাশ, সেই বুদ্ধির দ্বারাই তাঁহাকে পাপপুণ্য কেন স্পর্শ করে না? ইহার একটা মীমাংসা করিয়া লইতে উদ্যত হয়, তবে, বোধহয়, তাহার মনে এইপ্রকার সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইতে পারে মনুষ্য ফলাকাঙ্ক্ষায় যে কার্য্য করে বস্তুর শক্তি বা কারণ শক্তি দ্বারা উহা নির্ব্বাহ পায়। বস্তুর বা কারণের শক্তি আর কিছুই নহে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা মনুষ্যধর্ম্মের কার্য্য নির্ব্বাহ পাইতেছে অতএব তিনি মানবীয় কার্য্যের কর্ত্তা বটেন; কিন্তু মনুষ্য বিপন্নের পরিত্রাণ ও নিরপরাধের প্রাণহরণে ঐ প্রকার ঈশ্বরের ইচ্ছাবলেই সংসাধন করিতে সমর্থ, সুতরাং ঈশ্বর তাহাকে যে আনুকূল্য করিতেছেন সে তাহা স্বীয় অভিপ্রায় সাধনের নিমিত্ত সৎ বা অসৎ ব্যবহার করিতেছে; অতএব গুণ বা দোষ তাহাকেই স্পর্শ করিবে।

যিনি সৎ ও অসৎ কর্ম্মে, বস্তুশক্তি দ্বারা সমভাবে, জীবের আনুকূল্য করিতেছেন সেই কৃপাপারাবার পরমেশ্বরে, লৌকিক বিচারেও

পাপ পুণ্য আরোপিত হইতে পারে কি? বোধ হয় না। ফলতঃ তিনি প্রাগুক্ত যুক্তিতে, কর্ত্তা হইয়াও উদাসীন। গীতা শাস্ত্রে সুতরাং লিখিত হইয়াছে —

"তস্য কর্ত্তার মপিমাং বিদ্ধ্য কর্ত্তার মব্যয়ং।
নমাং কর্মানি লিম্পন্তি নমে কর্ম্মফলে স্পৃহা।"

আমি উহার কর্ত্তা অথচ উদাসীন ও অব্যয় বলিয়া জানিও কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই কোন কর্ম্ম আমাকে স্পর্শ ও করে না।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও প্রাগুক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। যথা,—

"ঈশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবৎ দ্রষ্টব্যঃ। যথাহি পর্জ্জন্যো ব্রীহি যবাদি সৃষ্টৌ কারণং সাধারণং ভবতি ব্রীহি যবাদি বৈষম্যে তু তত্তদ্বীজ গতান্যেবাসাধারণানি সামান্যানি কারণানি ভবন্তি।" এব মীশ্বর দেব মানুষাদি সৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি। দেবমনুষ্যাদি বৈষন্যেতু তত্তজ্জীব গতান্যেব সধা-রণানি কর্ম্মানি কারণানি ভবন্তি। ঈশ্বরকে মেঘবৎ দর্শন করিতে হইবে। মেঘ, যেমন, ব্রীহি যব প্রভৃতির সাধারণ কারণ মাত্র, কিন্তু ব্রীহি যা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ওষধির প্রতি অর্থাৎ ঐ সকল ওষধির পরস্পর বৈলক্ষণ্যের প্রতি তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন বীজগত অসাধারণ সামর্থ্যই কারণ। ঈশ্বর, তদ্রূপ, দেব মনুষ্যাদি সৃষ্টির সাধারণ কারণ, তাহাদের পরস্পর বৈলক্ষণ্যেরপ্রতি তাহাদের ভিন্নভিন্ন কর্ম্ম অর্থাৎ পাপ পুণ্যই কারণ।"

অতএব হিন্দুগণের মতে, ভগবান্ সমুদায় কর্ম্মের সাধারণ কর্ত্তা। জড়, অজড়, চেতন অচেনত কর্ম্ম মাত্রই বস্তু শক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। বস্তুর শক্তি-রূপে তিনি বা তদীয় ইচ্ছা বিরাজ করিতেছে। মনুষ্য স্বীয়, ইচ্ছানুসারে, ঐ শক্তির বিহিত বা অবিহিত, ক্রমে প্রয়োগ করিতেছে। তাহার এই স্বতন্ত্র আছে সুতরাং তাহার কার্য্য কখনও সত্ কখন বা অসত্ হইতেছে; এই বৈলক্ষণ্যের প্রতি তাহার ইচ্ছা কারণ বস্তুশক্তি ময়ী ইচ্ছা নহে, অতএব তাহার ফল পাপ পুণ্য ও ঐ পুরুষকেই আশ্রয় করিবে, ঈশ্বরকে করিবে কেন?

অর্ব্বাচীনেরা, শাস্ত্রজ্ঞানাভাবে যে ঈশ্বর কর্ত্তৃত্বকে পুরুষকারের ক্ষতি-জনক মনে করেন। আর্য্যগণ, সর্ব্বত্র সেই ঈশ্বর কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াই মনুষ্যের পাপ পুণ্যে স্বাতন্ত্র ও পুরুষকারের প্রয়োজনীয়তা কিরূপে উপপাদন করেন তাহা প্রদর্শিত হইল। অতঃপর পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ পুণ্য স্বীকার করিয়া পুরুষকারের প্রয়োজনীয়তা কিরূপে উপপাদন করেন তাহা প্রদর্শিত হইবে।

ক্রমশঃ—

১ম ভাগ — ৪র্থ খণ্ড

বেদব্যাস।

মাসিক পত্র।

শ্রাবণ ১২৯৩

বিষয়	নাম	পৃষ্ঠা
পারিবারিক উন্নতি	শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ	৭৩
অদৃষ্টবাদ	শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়লঙ্কার	৭৭
সাধারণ একজন বৈষ্ণবের দুই চারিটি কথা	শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার	৮২
অন্তঃসারের বাহ্য লক্ষণ	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি	৮৫
মনুসংহিতা	সম্পাদক	৯৫

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

কলিকাতা।
৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম মেসিন প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও ৬৬নং কলেজ ষ্ট্রীট. কলিকাতা হইতে
শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
প্রকাশিত।

বেদব্যাস।

১ম ভাগ। ১২৯৩ সাল। ৪র্থ খণ্ড।

পারিবারিক্ উন্নতি।

নব্যযুবকের মধ্যে অনেকে মনে করেন অবরোধপুরী মুক্ত দ্বার হওয়াই পারিবারিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, নব্যসম্প্রদায়ের এই মতটি ভ্রান্ত ও বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার নিতান্ত অযোগ্য। আমরা দেখিতেছি, আজিও হিন্দুরমণীগণের স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার সামর্থ্য জন্মে নাই। স্ত্রী-স্বাধীনতা দূরে থাকুক, পুম্-স্বাধীনতাও এ সময়ে অন্তর্হিত। পুরুষগণ এক্ষণে প্রায়ই কুপ্রবৃত্তির, কুচরিত্রেরও ইন্দ্রিয়ের অধীন। এতদ্ভিন্ন রাজার অধীন, রাজজাতির অধীন, রাজার দেশের লোকেরও অধীন। এইরূপ নিজেদের অষ্টপৃষ্ঠে অধীনতা বন্ধন বিদ্যমান থাকিতে অবরোধ দ্বার উন্মুক্ত করা নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হয় না। পুরুষচরিত্র যত দিন না পূর্ণ পবিত্র হয়, পুরুষ যত দিন না পরস্ত্রীর প্রতি মাতৃবৎ পূজা সম্মান করিতে শিক্ষা করিবে, ততদিন অবরোধ দ্বার অনুন্মুক্ত থাকুক, থাকিলে ভাল বৈ মন্দ হইবে না। স্বাধীন প্রকৃতি লোকের কি কি গুণ থাকা উচিত—যত দিন না তাহা আমরা জানিতে পারিব,—এবং স্ত্রীলোকেরাও বুঝিতে পারিবে, ততদিন ঐ প্রথা প্রচলিত না হওয়াই ভাল। স্ত্রীলোক-দিগকে জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি ও তেজ শিখাইতে যত্নবান্ হও—
শিখিলে অবশ্যই তাহারা আপনা হইতে উন্নতিলাভ ক
হইয়া স্বাধীনতা রাখিতে পারিবে—তখন আর আঁটা
হইবে না—আপনা হইতেই স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত
তখন নিজ পারিবারিক উন্নতি দেখিয়া সুখী হইব।

স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দিবার জন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা এক সময়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন—নব্য সম্প্রদায় আজ উহা নূতন চেষ্টা করিতেছেন না। মীরা বাই, চৈতন্যসম্প্রদায়, কর্ত্তাভজা, রামবল্লভী, সাহেবধনী, বাউল, ন্যাড়া, আউল প্রভৃতি দলবদ্ধ বৈষ্ণবেরা এক সময়ে স্ত্রীস্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদেরও সমাজের কিছুমাত্র সুখ, স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয় নাই, সমাজসংস্করণ ও ধর্ম্মভাব কিছুই জন্মে নাই। পরন্তু অতি অপবিত্র ভাবেরই ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।

দেখিতে পাই, নব্যযুবকেরা সকলেই স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীস্বাধীনতা করিয়া মহা ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা যে কি তাহা তাঁহারা একবারও বিবেচনা করেন এরূপ আমাদের মনে হয় না। তাহারা মনে করেন, সকল স্ত্রীপুরুষের সমভাবে অত্যন্ত মিশামিশি হইলেই বুঝি স্ত্রীস্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। স্ত্রীস্বাধীনতা নাই কেন? আছেই ত? পুরুষ যেমন পুরুষের নিকট স্বাধীন, স্ত্রীও তেমনি স্ত্রী-সমাজে স্বাধীন। স্ত্রী-সমাজ যেমন পুম্-সমাজে যাইতে পারে না, আসিতে পারে না, পুরুষের সহিত বসিতে, কথা কহিতে ও কৌতুকালাপ করিতে পারে না, পুম্-সমাজও তেমনি স্ত্রী-সমাজে যাইতে, বসিতে, অসঙ্কোচে কথা কহিতে ও কৌতুকালাপ করিতে পারে না, সুতরাং ভাবিয়া দেখিলে, উভয় সমাজকেই সমস্বাধীন বলিয়া বিবেচিত হইবে। যদি বলেন, পুরুষ একাকী ভ্রমণ করে, স্ত্রী তাহা পারে না; ইহা বড় দুঃখের বিষয়। ইহাতে আমরা বলি, সে দুঃখ নিবারণের যোগ্য সময় এখনও হয় নাই। সমাজ মধ্যে ধর্ম্মের তেজ ও জ্ঞানের উন্মেষ উপস্থিত হইলে তখন আর ও দুঃখ থাকিবে না, আপনা আপনি নিবারিত হইবে। স্ত্রী-পুরুষে মিশামিশি হয় না, সেই দুঃখে যদি স্ত্রীকে স্বাধীন করিতে চাও—তবে তাহা স্বাধীনতা নহে—তাহা স্বৈরাচার। সেরূপ স্বৈরাচারকে আমরা সমাজ মধ্যে প্রশ্রয় দিতে অনিচ্ছুক। স্ত্রী-পুরুষের মিশামিশি যদি স্ত্রীস্বাধীনতা সিদ্ধ হয়—তবে তাহা নিতান্ত হেয়। বহুকালা- র্থাশ্রমে ঐরূপ মিশামিশি হওয়ার প্রথা প্রচলিত হইয়া হিন্দুরা তীর্থযাত্রা কালে আপন আপন গৃহিণীকে অসঙ্কোচে কেন, কিন্তু তাহাতে অদ্য যাবৎ অশুভ ভিন্ন শুভ হইতে প্রত্যুত ঐরূপ বিমিশ্রতার দ্বারা নানা প্রকার অপবিত্রতা

প্রশ্রয় পাইতেছে। পূর্ব্বে পবিত্র সাধুলোকেরাই তীর্থবাস করিতেন; স্ত্রীসংস্রবের প্রভাবে এক্ষণে তাঁহারা সে স্থানে থাকিতে ইচ্ছুক নহেন। পূর্ব্বে লোকে সকল তীর্থে গিয়া কলুষরাশি ধৌত করতঃ বিশুদ্ধ হইত—কিন্তু এক্ষণে তাহা বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। পুরুষজাতি যদি ধর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া স্ত্রীজাতির সহিত পবিত্রতা রক্ষা করিতে না পারিল—তবে প্রলোভনসংকুল সংসার-বাজারে বেড়াইয়া তাহারা যে তাহা রক্ষা করিতে পারিবে—ইহা নিতান্ত অবিশ্বাস্য। ইংরাজদিগের গির্জা অনেক সময়ে প্রেমশিক্ষার আরম্ভ-গৃহ হইতে দেখা যায়। সমাজ স্ত্রীস্বাধীনতাপ্রিয় হইলেই চরমে ঐরূপ দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকে। বাধা নাই, বিপত্তি নাই; কলঙ্ক নাই, চাতুরীর অবকাশ আছে, পথ আছে,—এরূপ অবস্থা আসিলে যুবক যুবতীর মন যে বিচলিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? এরূপ জন-প্রবাদ আছে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের চিত্ত কোন এক সময়ে মাতৃরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। অতএব, ধর্ম্মামোদপ্রিয় নব্যযুবকদের চিত্ত যে সহচর বর্জ্জিতা একাকিনী যুবতীর সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় আত্মপবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিবে, ইহা আমরা কোনও ক্রমে বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি কেহ সে অবস্থাতে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম থাকেন—তবে তিনি যথার্থতঃ স্ত্রী সমাজের মঙ্গল করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেরূপ লোক কয়টী আছে? সত্য বটে, নরনারী অস্থিমাংসের ন্যায় সঙ্গড়িত হইয়া সংসারের কল্যাণবর্দ্ধন করিতে পারেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কয় জন নর ও কয় জন নারী সেরূপ উচ্চাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন? নারী পদ-শব্দে যাহাদের মন প্রাণ চমকিয়া উঠে, তাহারা যদি আজ নারী জাতিকে অবরোধমুক্তা করিবার চেষ্টা পায়, তাহা হইলে ভবিষ্যদ্দর্শী বিজ্ঞলোক ঐ ব্যাপারকে কুপ্রবৃত্তির কৌশল ভিন্ন অন্য কি মনে করিতে পারেন?

সুন্দরী সুসজ্জিতা রমণীর হাত ধরিয়া বেড়াইতে, তাঁহার সহিত কথা কহিতে ও হাসি তামাসা করিতে সহজেই পুরুষপ্রকৃতি ভাল বাসে। কিন্তু সামাজিক শাসন ভয়ে, লোকগঞ্জনা ভয়ে, কলঙ্ক রটনা ভয়ে ঐ দুর্ব্যবহার করিতে সাহস করে না। এমত অবস্থায়, যদি ঐ সূক্ষ্ম পরদা খানি উঠাইয়া দাও—তাহা হইলে সমাজে যে কি, দুরবস্থা উপস্থিত

হইবে তাহা ভাবিতে গেলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। যাঁহারা স্বাধীনতা লাভের উপযুক্তা পাত্রী, তাঁহারা তাহা লাভ করুন, ক্ষতি নাই। কিন্তু সমস্ত নারীজাতির নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, যাহারা চিরপরাধীনতায় হতবীর্য্য, হতমান, হতপ্রতিপত্তি ও কাপুরুষের একশেষ হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের নিকট তোমরা স্বাধীনতা ভিক্ষা চাহিও না, ভোয়া বক্তৃতায় ভুলিয়া গিয়া ক্রীতদাসের নিকট হইতে ঝুটা স্বাধীনতার অলঙ্কার পরিবার ইচ্ছা করিও না। কেননা উহার গিল্টী উঠিয়া গেলে তখন তাহার মূলমালিন্য দেখিয়া লজ্জিতা হইবে। পুরুষের নিকট স্বাধীনতা স্বীকার করা অপেক্ষা নিজে নিজে উপার্জ্জন করাই ভাল। তোমরা যাহাতে ধর্ম্মধীরা হইতে পার, নিজ চরিত্রের তেজ দেখাইতে পার, তাহারই চেষ্টা কর। যে যে খানে আছ সেই খানেই থাকিয়া ক্রমশঃ সবল হইবার চেষ্টা কর। পুরুষের প্রতি নির্ভর করিও না, পুরুষের নিকট ভিক্ষা চাহিও না। ভিক্ষালব্ধ ধন ক দিন থাকে? দত্ত বস্তু কাড়িয়া লইতে কি সামর্থ্য লাগে? সেই জন্যই বলিতেছি, বর্ত্তমান মিউনিসিপাল স্বাধীনতার ন্যায় ভোয়া স্বাধীনতায় তোমাদের প্রয়োজন নাই। এস্থানে পুরুষদিগকেও বলি, তোমরাও এ দুরবস্থার সময় দুর্ব্বলা মহিলাদিগকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিও না করিলে মহান্ অনিষ্ট হইবে। পিঞ্জরবদ্ধ পাখীকে ছাড়িয়া দিলে কখন সে অন্যান্য পাখীর ন্যায় উড়িতে পারে না, প্রত্যুত সে অপরাপর পাখীর দ্বারা উৎপিড়ীত হয়। তোমরা আগে নিজে মুক্ত হও নিজে স্বাধীন হও, নিজ কুপ্রবৃত্তির নিকট ও দুষ্ট ইন্দ্রিয়ের নিকট আত্মক্ষমতা বিস্তার কর, পরস্ত্রী পবিত্র চক্ষে দেখিতে শিক্ষা কর, অভ্যাস কর, পুরবালাদিগকে যথোচিত স্নেহ, ভক্তি ও সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হও, পশ্চাৎ তোমরা অন্যকে মুক্ত করিও, এবং স্বাধীন করিয়া সুখী হইও।

চিত্ত-দোষের সংশোধন ও নিষ্কলঙ্ক প্রণয় অর্থাৎ ভাল বাসা, এই দুই সদ্‌গুণ স্বাধীনতা লাভের প্রসব-ভূমি। ঐ দুই গুণ যখন মনুষ্য সমাজের প্রত্যেক নর নারীতে বিরাজ করিবে তখন তাহারা আপনা হইতেই মা যেমন ছেলের কাছে, ছেলে যেমন মায়ের কাছে, পবিত্র স্বাধীন থাকে সেই রূপ স্বাধীন হইয়া সুখী ও সমলঙ্কৃত হইবে,

কাহারও কোন চেষ্টা, বা অনুরোধ অথবা বল-প্রয়োগ, কিছুই করিতে হইবে না।

অদৃষ্টবাদ।

অদৃষ্ট সত্ত্বেও পুরুষের সাতন্ত্র।

মনুষ্য যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে তাহাতে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব আছে; অথচ মনুষ্যেরও উহাতে স্বাধীনতা আছে। সুতরাং আমাদের আপনাপন চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বিষয় পূর্ব্ববারে, সংক্ষেপে, যাথাশক্তি আলোচিত হইয়াছে। এইক্ষণে অদৃষ্টশব্দের অর্থ কি? উহার সহিত পুরুষকারের সম্বন্ধ কি? ইহা সাধ্যমতে আলোচিত হইবে।

ভাষা পরিচ্ছেদে লিখিত আছে। "ধর্ম্মাধর্ম্মাবদৃষ্টং স্যাৎ।" ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই অদৃষ্ট।

এই অদৃষ্ট কাহার ধর্ম্ম বা গুণ? ভাষা পরিচ্ছেদ তাহার উত্তরে বলেন।

"বুদ্ধ্যাদিষট্‌কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণাএতে আত্মনি স্যুশ্চতুর্দ্দশ"।

"বুদ্ধি প্রভৃতি ছয়—অর্থাৎ বুদ্ধি,সুখ,দুঃখ, ইচ্ছা,দ্বেষ, যত্ন; এবং সংখ্যাদি পাঁচ অর্থাৎ সংখ্যা পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ও ভাবনা সংস্কার ধর্ম্ম, ও অধর্ম্ম এই চতুর্দ্দশটি গুণ জীবে অবস্থিতি করে।"

জীবের এই সকল গুণ আছে ইহা কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ? ইহার উত্তরে ভাষা পরিচ্ছেদকার বলেন;

"মনোগ্রাহ্যং সুখং দুঃখমিচ্ছাদ্বেষোমতিঃ কৃতিঃ।"

জীবের সুখ দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, বুদ্ধি, কৃতি;—অর্থাৎ যত্ন, এই ছয় গুণ মানসিক প্রত্যক্ষের বিষয়। ইহা মনে মনে অনুভব করিতে পারাযায়।

আবার স্থানান্তরে সুস্পষ্টরূপে নিরূপিত হইয়াছে।

"গুরুত্বাদৃষ্টভাবনা অতীন্দ্রিয়াঃ" (ভাষা পরিচ্ছেদ)

গুরুত্ব অর্থাৎ ভার, অদৃষ্ট অর্থাৎ পাপ পুণ্য, এবং সংস্কার, ইহারা অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ কোন বাহ্য ইন্দ্রিয় বা মনের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে।

এখন ধর্ম্মাধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহাও জানা আবশ্যক। মলমাস তত্ত্বের বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে,

" বিহিতক্রিয়য়াসাধ্যো ধর্ম্মঃপুংসোগুণোমতঃ।
প্রতিসিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ সগুণোঽধর্ম্মউচ্যতে।

বিহিত ক্রিয়া অর্থাৎ শরীর দ্বারা দান, পরিত্রাণ, পরিচর্য্যা। বাক্য দ্বারা সত্য প্রিয়ওহিত আলাপ, এবং স্বাধ্যায় পাঠ। অন্তকরণ দ্বারা দয়া অস্পৃহা, ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি করিলে আত্মার যে, মধ্যে এক প্রকার গুণ বিশেষ উৎপন্ন হয় উহার নাম ধর্ম্ম। আর প্রতিসিদ্ধ ক্রিয়ার দ্বারা অর্থাৎ শরীর দ্বারা হিংসা স্তেয় প্রতিসিদ্ধ মৈথুন এবং বাক্য দ্বারা পারুষ্য, অনৃত্য, পৈশূণ্য, আর অন্তঃকরণ দ্বারা পরদ্রোহ পরদ্রব্যে লোভ, এবং নাস্তিক্য ভাবের সেবা করিলে আত্মার মধ্যে এক প্রকার মলিনতা বা দোষ জন্মে উহাকে অধর্ম্ম বলে। এইরূপ ধর্ম্মও অধর্ম্মের নামই অদৃষ্ট। (ক)

এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে আমরা কি কেবল এই অদৃষ্টের পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মের অধীন হইয়াই সমস্ত কার্য্য করিতেছি কিম্বা উহাতে আমাদের স্বাধীনতাও কিছু আছে। অর্থাৎ যে যে কার্য্য আমরা করিয়াছি করিতেছি এবং ভবিষ্যতে করিব তৎ সমুদায়ই কি পূর্ব্বেই আমাদের অদৃষ্ট দ্বারা নিয়ত হইয়া রহিয়াছে, না উহাতে স্বাধীনতাও আছে, অর্থাৎ আমার ইচ্ছা কোন কার্য্য করিতে পারি কি না। কোন কোন ব্যক্তি বলেন মনুষ্যের স্বাধীনতা নাই তাহার সমুদায় কার্য্যই অদৃষ্টায়ত্ত। এ বিষয়ে তাঁহারা নিম্নলিখিত কএকটি কারণ দেখাইয়া থাকেন।

(১) কার্য্য মাত্রের প্রতি অদৃষ্টই কারণ ইহা শাস্ত্রকারগন স্বীকার করিয়াছেন

(২) পুরুষকার দ্বারা অদৃষ্টকে অতিক্রম করা যায় না, মহাভারতের নানা স্থানে এবম্বিধ উপদেশ দৃষ্ট হয়। যথা

" দৈবং পুরুষকারেণ কোঽতিবর্ত্তিতুমর্হতি!"

(৩) পুরাণান্তরেও পুরুষের স্বাধীনতা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা

(ক) শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয় তাহার ধর্ম্মব্যাখ্যায় এই বিষয় অতি বিস্তার মতে লিখিত আছে, অতএব আমরা আর অধিক বিস্তার করিলাম না।

" সুখস্য দুঃখস্য নকোঽপিদাতা পরদাদাতীতি কুবুদ্ধি রেষা।"
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ স্বকর্ম্মসূত্রে গ্রথিতোহি লোকঃ।

কোন ব্যক্তিই সুখ বা দুঃখ দান করিতেছে না, এই ধারনা অত্যন্ত ভ্রম যে " অন্যে আমার সুখ বা দুঃখ প্রদান করিতেছে।" ." আমি স্বয়ং সুখ বা দুঃখ বিধান করিতেছি।" ইহাও বৃথা অভিমান। কারণ প্রত্যেক লোকই আপনাপন অদৃষ্ট বা কর্ম্ম সূত্র দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। এবম্বিধ শাস্ত্রীয় বচন দর্শনে প্রাগুক্ত ব্যক্তিগণ, অদৃষ্টের অধিকার এতদূর বিস্তার করিয়াছেন যে মনুষ্যের স্বাতন্ত্য একবারে বিলুপ্ত করিয়াছেন, সুতরাং এই মত দ্বারা যে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মত যে নিতান্ত ভ্রম সঙ্কুল ইহা স্বীকার না করিয়া পারাযায় না কারণ মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে আদৃষ্ট পরতন্ত্র হইলে সমুদায় বিধি নিষেধ শাস্ত্রই ব্যর্থ হয়। যাহার স্বাধীনতা নাই, অন্য কোন অলৌকিক শক্তিদ্বারা বলাৎকৃত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে তাহার পাপ পুণ্য কি? আবার পাপ পুণ্য না থাকিলে অদৃষ্টই বা কি? সুতরাং শাস্ত্রের স্বব্যাঘাত দোষ উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয়ত শাস্ত্রকারগণ পুরুষকার ব্যতিরেকে ফলনিষ্পত্তি হয় না ইহা নানা স্থানে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যথা গোতম সূত্র!

" ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলা নিষ্পত্তেঃ।

পুরুষকার ব্যতিরেকে ফল লাভ হয় না। অতএব পুরুষকারও কারণ কেবল ঈশ্বর বা অদৃষ্ট কারণ নহে। স্থানান্তরে লিখিত আছে।

" যথাহে কেন চক্রেণ নরথস্য গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি।
যথা মৃৎ পিণ্ডতঃ কর্ত্তা কুরুতে যদ্যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতংকর্ম্ম মানবঃ প্রতিপদ্যতে।"

এই বচনের অর্থ সুগম—ইহার ভাব এই যে, কার্য্য নিষ্পত্তির প্রতি অদৃষ্ট কারণ বটে, কিন্তু অদৃষ্ট মৃৎপিণ্ডের ন্যায় পুরুষযত্ন সাপেক্ষ। মৃত্তিকা পিণ্ড যেরূপ পুরুষের যত্ন বিশেষে, নানা রূপে পরিণত হইয়া নানা প্রকার ফল জন্মায়, অদৃষ্টও তেমন পুরুষের যত্ন ও চেষ্টার দ্বারা নানা ফল জন্মায় সুতরাং পুরুষেয় স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদিত হইতেছে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

"দৈবে পুরুষকারে চ কার্য্যসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা
তত্র দৈব মভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকং।

এই বচনের দ্বারাও আমাদের পুরুষকার অর্থাৎ চেষ্টা যে কার্য্যের প্রতি কারণ তাহা ত নিরূপিত হইয়াছে, অধিকন্ত, দৈবের প্রতিও পুরুষকার কারণ ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। যে যে সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া, পুরুষের স্বাধীনতা নাই বলিয়া লোকে মনে করিয়া থাকে,—কিন্তু অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে—উহার একটি দ্বারাও তাহা সিদ্ধ হয় নাই।

(১) কার্য্যমাত্রের প্রতি অদৃষ্টকারণ—এই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত দ্বারা পুরুষের স্বাতন্ত্র্য নিরাকৃত হয় না। যেমন কুম্ভকারের নির্ম্মিত সমুদায় সামগ্রীর প্রতিই মৃত্তিকা মুখ্য কারণ বলিয়া সেই সেই কার্য্যে কুম্ভকারের স্বাধীনতার কোন ব্যাঘাত নাই, সে মৃত্তিকা লইয়া ইচ্ছানুসারে ঘট, শোরাই প্রভৃতি বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারে, আমরাও তদ্রূপ অদৃষ্টের আনুকূল্যে মনুষ্যাদি জন্ম লাভ করিয়া নানারূপ শক্তি সম্পন্ন হইয়া ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ, ইহাই উপপন্ন হইতেছে।

(২) পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করিতে পারা যায় না—এই নির্দ্দেশ দ্বারা কেবল এই মাত্রই প্রতীত হয় যে—পুরুষ স্বীয় চেষ্টা দ্বারা অদৃষ্ট-নিরূপিত-বিষয়ের অন্যথা করিতে অসমর্থ, কিন্তু তাহার সমুদায় কার্য্যই যে দৈব বা অদৃষ্ট দ্বারা নিরূপিত হইয়া রহিয়াছে—এই সিদ্ধান্ত ঐ বচন হইতে কোন মতেও উপপন্ন হয় না। সুতরাং দৈবদ্বারা অনিয়ন্ত্রিত কার্য্যের প্রতি তাহার পূর্ণ স্বাধীনতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত নাই।

(৩) আমি সুখ ও দুঃখ স্বয়ং লাভ করিতেছি—ইহা বৃথাভিমান। এই প্রাগুক্ত বাক্য দ্বারা কেবল এই মাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পুরুষ, আপনা প্রতি যে পুনঃকৃত কার্য্যের কেবল আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া সময়ে সময়ে অভিমান করিয়া থাকে, তাহা অনুচিত—কারণ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধং। বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবা এ পঞ্চমং। শরীরবাঙমনোভির্যৎ কর্ম্মপ্রারভতেহর্জুন। ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ। তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ। পশ্যত্য কৃতবুদ্ধিত্বাৎ ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ। (গীতা)

মনুষ্যগণ, শরীর এবং বাক্য ও মন দ্বারা ন্যায্য বা অন্যায্য যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহার প্রতি শরীর, আত্মা, ইন্দ্রিয়, প্রাণ,

প্রভৃতির চেষ্টা, ও দৈব অর্থাৎ অদৃষ্ট এই পাঁচটীই কারণ। এরূপ অবস্থায় যে কেবল আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে সে দুর্ম্মতির যথার্থ জ্ঞান নাই।

এই গীতা শ্লোকের ন্যায়ই "অহং করোমিতি বৃথাভিমানঃ" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে, ইহার ভাব এই যে, "কেবল জীবই কর্ত্তা—"এই অভিমান অনুচিত। জীবের স্বাধীনতা বা কর্তৃত্ব নাই ইহা ঐ বচনের মর্ম্ম নহে। "স্বকর্ম্মসূত্রে গ্রথিতোহি লোকঃ"—এই অংশের অভিপ্রায় এই যে, জীবের স্বাতন্ত্র্য বা কর্তৃত্ব সীমা-বদ্ধ। যেমন সূত্রবদ্ধ বিহঙ্গ সূত্রের বিস্তার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না, কিন্তু ঐ পরিধি মধ্যে দূরে বা নিকটে উড়িতে বা দাঁড়াইতে পারে, মনুষ্যও তদ্রূপ আপনার অদৃষ্টচক্রের মধ্যে স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিয়া আপনার শুভাশুভ বিধান করিতে পারে। সূত্র শব্দ প্রয়োগের ইহাই তাৎপর্য্য। অদৃষ্ট বিষয়ক শাস্ত্রের সূক্ষ্মরূপে অনুশীলন করিলে দৃষ্ট হইবে যে যেমন জল ও বায়ুর বেগ না থাকিলে নাবিক যতটুকু বল প্রয়োগ করে, নৌকা ততটুকু অগ্রসর হয়, তদ্রূপ যাহার অদৃষ্ট অনুকূলও নয় প্রতিকূলও নয়, সে যে পরিমাণ যত্ন করিবে তাবৎ পরিমাণই ফল লাভ করিবে। আর জল ও বায়ুর বেগ অনুকূল হইলে নাবিকের অল্প পরিশ্রমেই নৌকার বহুদূর গতি হয়, সেইরূপ অনুকূল অদৃষ্টশালী পুরুষ অল্প প্রযত্নেই গুরুতর ফললাভ করে। এবং জল বায়ু প্রতিকুল থাকিলে নাবিকের অল্প প্রযত্নে নৌকার গতি হয় না, কিন্তু বহু প্রযত্নে কিঞ্চিৎ গতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রতিকুল-দৈব-সম্পন্ন-ব্যক্তির অল্প প্রযত্নে ফল লাভ হয় না, কিন্তু সমধিক প্রযত্নে কিঞ্চিৎ ফল লাভ হইতে পারে। আর ইহাও দেখা যায় যে, জল ও বায়ু যতই কেন অনুকূল হউক না, কিন্তু নৌকাখানি না ছাড়িলে উহার কোন গতিই হয় না, তদ্রূপ দৈব বা অদৃষ্ট সম্পূর্ণ অনুকূল থাকিলেও যত্ন না করিলে কোন ফলই হয় না; সুতরাং হিতকর কার্য্যে সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য।

"শ্রোষ্যন্তি যৈব যেভক্ত্যা মমমাহাত্ম্যমুত্তমং নতেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতোত্থা নচাপদঃ।"

ইত্যাদি শাস্ত্র দর্শনে সুস্পষ্ট প্রতীত হয় যে, জগদম্বার মাহাত্ম্য শ্রবণে ও সেবনে সমুদায় দুরদৃষ্ট নিরাকৃত এবং দুরদৃষ্ট কৃত সমস্ত বাধা বিঘ্ন প্রশমিত

হয়। অতএব সাবধান। কোন হিন্দু সন্তানই যেন অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করিয়া নিজের স্বধর্ম্মের, স্বজাতির ও স্বদেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার অপনয়নে পরাঙ্‌মুখ না থাকেন। জগদম্বার সর্ব্বসন্তাপহারী পাদপদ্মে মনও প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক যত্ন করিলে অবশ্যই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইবেন এবং জননী ভগিনী ও জন্মভূমির বিষণ্নবদনে মধুর হাস্য দর্শন করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

সাধারণ একজন বৈষ্ণবের দুই চারিটী কথা।

১। "আউলায় ক্যান্" অর্থাৎ ঈশ্বর-জ্ঞান মনের মধ্যে এত চঞ্চল ভাবে থাকে কেন? যে বৈষ্ণবটির কথা বলিতেছি, তিনি একজন সম্পূর্ণ "অশিক্ষিত" ব্যক্তি। বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত নাই। মধ্যে মধ্যে তিনি আমাকে এক এক সমস্যায় ফেলিয়া যান। এক দিন আমি বসিয়া কাজ করিতেছি, এমন সময়ে বাবাজী আমাকে এক প্রণাম ঠুকিয়া বলিলেন—"ও ঠাকুর! আউলায় ক্যান্?" আমি কিছুই বুঝিলাম না, বলিলাম "বাবাজী সহজ ভাষায় বল।" বাবাজী বলিলেন—"প্রেমত সমুদ্র; মহাপ্রভুত চন্দ্র; তবে আউলায় ক্যান্?" আমি বলিলাম—"কালি বলিব।" তাহার পরে বাবাজী চলিয়া গেলেন।

আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা সমস্যা স্থির করিলাম। যতই ভাবিতে লাগিলাম, ততই যেন গূঢ় অর্থ সকল আমার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে লাগিল। আমার মনে যাহা উদিত হইল অবিকল তাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "প্রেম যে সমুদ্র তাহাতে সন্দেহ কি? সমুদ্র হইতে বারিবিন্দু উত্থিত হইয়া পরে সমুদ্রেরই কলেবর বৃদ্ধি করে। প্রেম—ঈশ্বপ্রেম হইতে জ্ঞান, ভক্তি উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের চরণে উপনীত হইয়া পরে প্রেমেরই কলেবর বৃদ্ধি করে! আবার দেখুন সমুদ্রে রত্নও আছে, হাঙ্গর কুম্ভীরও আছে। হাঙ্গর কুম্ভীর গুলি সমুদ্রের উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়ায়। কিন্তু সমুদ্রের নিম্নে,—কত নিম্নে-মহোজ্জল মণি মাণিক্য। যে ঈশ্বরে প্রেম করে, তাহারও প্রথমে কত কষ্ট। স্ত্রীপুত্রের প্রতি মমতা, রাজ্যৈশ্বর্য্যের প্রতি লোভ, হাঙ্গর কুম্ভারেব ন্যায় তাহাকে কত বার দংশন করে, আক্রমণ

করে। সে নীচে ডুবিতে চায়, রত্ন অন্বেষণ করিতে চায়, কিন্তু হাঙ্গর কুম্ভীরে তাহাকে নিম্নে ডুবিতে দেয় না। তাহার পরে সমুদ্রস্থ জলরাশি সর্ব্বদাই নিম্নাভিমুখে গমন করে। প্রেমত যেন স্বভাবতঃই নিম্নগামী। কি দুর্দ্দৈব! এই যে হৃদয়স্থ অপার অনন্ত প্রেমসমুদ্র ইহা স্ত্রী পুত্রের অভিমুখে নিয়তই গমন করিতেছে, ভ্রমেও একবার উর্দ্ধে উঠে না। প্রবল ঝটিকার সময় সমুদ্র এক এক বার উর্দ্ধে উঠে বটে, কিন্তু সে ঝটিকার গুণে, নিজের ইচ্ছামতে নহে। মনুষ্যও বিপদে পড়িলে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করে বটে, কিন্তু সে বিপদের গুণে, নিজের ইচ্ছায় নহে। তদ্ভিন্ন বিপদের সময় যে ঈশ্বর-প্রেম, তাহা যাতনা, ভীতি, প্রভৃতিতে বড়ই কলুষিত হয়, তাহাতে সুখের বা পবিত্রতার লেশমাত্রও থাকে না।

"তাহার পর ভগবান যে চন্দ্রের, ন্যায় তাহাতে সন্দেহ কি? তাহার পর চন্দ্রই সমুদ্রকে উর্দ্ধে উত্তোলিত করে। হাঙ্গরই থাকুক, কুম্ভীরই থাকুক, বৃষ্টিই হউক বা ঝড়ই হউক, চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রকে উর্দ্ধে উঠিতে হইবেই হইবে। সেইরূপ পাপীই হও বা তাপীই হও, রোগীই হও বা শোকীই হও, দুঃখীই হও বা সুখীই হও চৈতন্য-চন্দ্রের আকর্ষণে তোমার হৃদয়স্থিত প্রেম সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইবেই হইবে। অথচ এই আকর্ষণের মধ্যে জোরাজুরি কিছুই নাই। দেখুন সমুদ্র যেন নিজেই আনন্দে বক্ষস্ফীত করিয়া চন্দ্রের অভিমুখে গমন করে। চন্দ্র যখন যেখানে থাকেন সমুদ্র তখন সেই দিক লক্ষ্য করিয়াই ধাবিত হয়। সে ধাবনের বিরাম নাই (১)। প্রেমিকের হৃদয়ও সেই এক ঈশ্বর লক্ষ্য করিয়া পরিধাবিত হয়। ঝড় বৃষ্টির সময় সমুদ্রের দ্বারা অনেকের অনেক রূপ বিপদ সঙ্ঘটিত হয়। কিন্তু জোয়ারের জলবৃদ্ধিতে কাহারও কোন রূপ অনিষ্ট হয় না, বরং অনেকের উপকারই হয়। সেইরূপ বিপদকালীন যে ঈশ্বর-প্রেম তাহাতে অন্যের অনিষ্টাশঙ্কা আছে। কিন্তু স্বাভাবিক প্রেমিকের প্রেমোচ্ছ্বাসে সংসারের মঙ্গল ভিন্ন কোনরূপ অমঙ্গল হয় না।

এ সব বেশ কথা। কিন্তু বৈষ্ণবের সমস্যার উত্তর কি? "আউলায় ক্যান্?" অর্থাৎ সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব বড়ই চঞ্চল

---

(১) যাঁহারা জোয়ার ভাটার নিয়ম জানেন তাঁহাদের নিকট এই তত্ত্ব সুবিদিত।

ভাবে থাকে। প্রেমোচ্ছ্বাসেও হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর জ্ঞান বড়ই অপরিস্ফুট থাকে। ইহা কেন হয়? ইংরেজী দর্শনেও এইরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায়। যখন হৃদয়ের মধ্যে আনন্দের বেগ, প্রেমের বেগ প্রবল হয়, তখন জ্ঞানের কার্য্য বড় হয় না। প্রণয়ীযুগলের প্রেমালিঙ্গনের সময় জ্ঞানের কার্য্য প্রায় কিছুই হয় না। কিন্তু ইহা কেন হয়? ইংরেজী দর্শন অনুসারে বলা যাইতে পারে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু এই উত্তরে বৈষ্ণব সন্তুষ্ট হইবে কি?"

পরদিন বৈষ্ণব যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল আমার যথাসাধ্য সব কথা বুঝাইয়া বলিলাম। বৈষ্ণব সব কথা শুনিয়া বলিল—"ঠিক, কিন্তু আউলায় ক্যান্।" আমি বলিলাম "স্বাভাবিক নিয়মে।" বৈষ্ণব ঘাড় নাড়িতে লাগিল। আমি বলিলাম—"তবে তুমি কি বল?" বৈষ্ণব বলিল "আমি বলি ভাবের লহরে," এই কথা বলিয়াই বৈষ্ণব উঠিয়া গেল। আমি কষ্টেস্ষ্টে-পূর্ব্ব সমস্যা কতক বুঝিয়াছিলাম। এ আবার এক নূতন সমস্যায় পড়িলাম। আমি অনেক বার দেখিয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছিলাম যে বৈষ্ণবের কথাগুলি সুতার পুঁটুলী। পুঁটুলীটী দেখিতে বড় ছোট। কিন্তু খী ধরিয়া টানিতে পারিলে পুঁটুলী হইতে অনেক সুতা বাহির হয় ইহা মনে করিয়া বৈষ্ণবের কথা উপহাসে উড়াইয়া না দিয়া, চিন্তা করিতে বসিলাম। চিন্তা করিয়া যাহা স্থির করিয়াছিলাম, তাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। নিম্নে ঐ লেখা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"ভাবের লহরে। অর্থাৎ হৃদয় যখন প্রেমে পরিপূর্ণ হয়, তখন সুখের প্রবাহ চতুর্দ্দিক হইতে প্রবাহিত হয়। যখন প্রণয়ীযুগলের মিলন হয়, তখন ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় হইতে সুখোর্ম্মি উত্থিত হইয়া একত্র সম্মিলিত হয়। প্রণয়ীর দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি জনিত ভিন্ন ভিন্ন সুখ, একই সময়ে গিয়া মস্তিষ্কে উপস্থিত হয়। সেই সুখরাশির সম্মিলনে মস্তিষ্ক বড়ই আকুলিত হয়। সুতরাং ইহার জ্ঞানান্বেষণের ক্ষমতা থাকে না। ঈশ্বর প্রেমের সম্বন্ধেও এই কথা। যখন প্রেমোচ্ছ্বাসে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, তখন ভক্ত কখন বা দাসের ন্যায় ঈশ্বরের চরণে পতিত হয়, কখন বা সখার ন্যায় তাঁহাকে আলিঙ্গন করে, কখনও বা পুত্রের ন্যায় তাঁহাকে প্রণাম করে, কখনও বা পিতার ন্যায় তাঁহাকে স্নেহ করে, কখনও বা কান্ত ভাবে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেছে। এতগুলি সুখের

তরঙ্গ যদি যুগপৎ কাহারও হৃদয়ে প্রবাহিত হয়, তবে সে স্থির থাকে কিরূপে, আর মনঃস্থির না থাকিলে জ্ঞানের কার্য্যই বা কিরূপে হয়। চৈতন্য চরিতামৃতে এক স্থলে আছে—

সখি হে শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহা লম্পট দস্যুগণ,
সবে কহে হর পরধন॥
এক অশ্ব এক ক্ষণে, পাঁচ পাঁচ দিগে টানে,
এক মন কোন্ দিকে ধায়।
এক কালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এই দুঃখে সহন না যায়॥
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহা সবার কাহা দোষ,
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচে পাঁচে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন॥

অর্থাৎ চক্ষু উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণের রূপ গ্রহণ করিতেছে, কর্ণ কৃষ্ণের শব্দ গ্রহণ করিতেছে, ত্বক্ কৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে, জিহ্বা সেই রস পান করিতেছে এবং নাসিকা কৃষ্ণগাত্রের আঘ্রাণ সুখে ভোগ করিতেছে। এক মনে এই পাঁচ সুখ ভোগ করে কিরূপে? সুতরাং মনের মধ্যে বড়ই কোলাহল উপস্থিত। এই কোলাহলের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণ হয় কিরূপে?"

বৈষ্ণব আসিলে বৈষ্ণবকে সব কথা বলিলাম। বৈষ্ণব বলিল—"আমি মূর্খলোক। আমি ও সব বুঝি না।"

অন্তঃসারের বাহ্য লক্ষণ।

শিষ্য। অন্তঃসার বা আন্তরিক অস্তিত্ব কাহাকে বলে তদ্বিষয় বেশ বুঝিয়াছি, এবং অন্তঃসারবান্ ব্যক্তির অন্তরে অন্তরে কিরূপ অবস্থা হয় তাহাও অবগত হইলাম, কিন্তু বাহিরে কি লক্ষণ দেখিয়া একজনের অন্তঃসার অপরে বুঝিতে পারে তদ্বিষয় বিশেষরূপে জানিতে হইবে।

আচার্য্য। অন্তঃসারবান্ ব্যক্তির দৈহিক লক্ষণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তদ্দ্বারাই অন্তঃসার আছে কি না তাহা বিলক্ষণরূপে জানা যাইতে

পারে। তৎপর, কার্য্য-প্রণালী দ্বারাও অন্তঃসার থাকা না থাকার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় যাঁহার অন্তঃসার থাকে তাঁহার আচার ব্যবহার ও অন্যান্য কার্য্যপ্রণালী একরূপ, আবার যাঁহার অন্তঃসার নাই তাঁহার কার্য্যপ্রণালী, আচার ব্যবহারাদি সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রণালী হইয়া থাকে। তদ্দ্বারাই তাঁহার অন্তঃসার আছে বা নাই তাহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রথমে, অন্তঃসারের বিভাগ গুলি জানিতে পারিলে, পরে তাহার ঐ সকল বাহ্য লক্ষণ গুলি বুঝিতে পারা যায়; কারণ এক এক শ্রেণীর অন্তঃসার অনুসারে এক এক প্রকার বাহ্য লক্ষণ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন আচার, ব্যবহার ও কার্য্যপ্রণালী প্রকাশিত হয়। অতএব প্রথম অন্তঃসারের বিভাগ বলা যাইতেছে। প্রথম তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, অন্তঃসার পদার্থটি কি, তাহা স্মরণ আছে কি ?

শিষ্য। তাহা বেশ মনে আছে,—ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সম, দম ও ধীশক্তি প্রভৃতি সকলগুলি মানুষীয়শক্তি বিকসিত হইয়া ক্রমে সঞ্চিত ও রাশীকৃত হইলে তাহাকেই অন্তঃসার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আচার্য্য। সেই শক্তি সমষ্টিস্বরূপ অন্তঃসারের পাঁচ প্রকার শ্রেণী ভেদ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর অন্তঃসার, দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তঃসার, তৃতীয় শ্রেণীর অন্তঃসার, চতুর্থ শ্রেণীর অন্তঃসার এবং পঞ্চম শ্রেণীর অন্তঃসার বলা যাইতে পারে।

(যাহার), ক্ষমাশক্তি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশক্তি, দমশক্তি, সমশক্তি ও বিবেকাদি সমস্তগুলি মানুষীয় শক্তি উপচিত হইয়া অবশেষে আত্মজ্ঞানের শক্তি (ক) বিকসিত হইলে প্রথম শ্রেণীর অন্তঃসার অর্থাৎ সম্পূর্ণ অন্তঃসার হইল।

আত্মজ্ঞানের শক্তি পূর্ণ মাত্রায় বিকসিত হয় নাই, কিন্তু তদ্ব্যতীত সম্পূর্ণ বিবেকশক্তি, সম্পূর্ণ বৈরাগ্যশক্তি, সম্পূর্ণ উদাসীন্যশক্তি এবং অন্যান্য

(ক) এই সকল শক্তির বিষয় "ধর্ম্মব্যাখ্যাতেই" অতি বিস্তারে বলিয়াছি, অতএব এক্ষণে অতি সংক্ষেপেই কিছু বলিয়া রাখি। এই দেহ এবং দেহের অন্তর্গত ইন্দ্রিয়শক্তি এবং মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও পৃথকভাবে, এই দেহের মধ্যে, অখণ্ডাদ্বিতীয়, নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধও মুক্ত স্বভাব আত্মাকে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতাকে "আত্মজ্ঞানের ক্ষমতা" বলা যায়।

সমস্তগুলি মানুষীয় শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হইলে (খ) তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তঃসার বলা যাইতে পারে।

আত্মজ্ঞানশক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, ও ঔদাসীন্যাদিশক্তি পূর্ণমাত্রায় বিকসিত হয় নাই, কিন্তু ভক্তিশক্তি, শ্রদ্ধাশক্তি, দমশক্তি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ-শক্তি এবং সমশক্তি প্রভৃতি সমস্তমানুষীয়শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে (গ) তাহাকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তঃসার বলিতে পারাযায়।

আত্মজ্ঞানশক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, দম, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ও সমাদিশক্তির বিকাশ হয় নাই, কিন্তু কেবল ধৃতিশক্তি, ক্ষমা-শক্তি, দমশক্তি, অস্তেয়শক্তি, সত্যশক্তি, অক্রোধশক্তি এবং বাহ্যবিষয়িনী ধীশক্তি প্রভৃতির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে চতুর্থ শ্রেণীর অন্তঃসার বলাযায় (ঘ)

আত্মজ্ঞান শক্তি, বৈরাগ্য শক্তি, বিবেক শক্তি, ঔদাসীন্য শক্তি, কিছু-মাত্র বিকসিত হয় নাই এবং ভক্তি, শ্রদ্ধা, দম ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদির অতি

(খ) ইন্দ্রিয়শক্তি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, অপান, সমান, ধ্যান, উদান প্রভৃতি শক্তি, এবং ইচ্ছা, প্রবৃত্তি প্রভৃতি যে সকল আধ্যাত্মিক পদার্থ আছে, তাহাদের প্রত্যেককে আপন দেহ মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিচার ও প্রত্যক্ষ করিয়া এই সকল জড় পদার্থ হইতে চিৎস্বরূপ আত্মার সম্পূর্ণ বিভিন্নতা মনে মনে বিচার করিতে পারিলে তাহাকে বিবেকশক্তি বলে। সকল প্রকার ভোগ্যবস্তু বিষয়ে নিতান্ত নিস্পৃহভাব হইলে তাহাকে বৈরাগ্য শক্তিবলে। সুখ এবং দুঃখ বিষয়ে কিছুমাত্র আশক্তি বা বিদ্বেষ না থাকিলে তাহাকে ঔদাসীন্য শক্তি বলে।

(গ) পরমেশ্বরে ঐকান্তিকী আশক্তির নাম ভক্তি, আর শ্রদ্ধা তাহারই পূর্ব্বাঙ্কুর মাত্র। মনের মধ্যে যতপ্রকার কুপ্রবৃত্তি আছে তাহাকে অনায়াসে দমন করার ক্ষমতাকে দমশক্তি বলে। ইন্দ্রিয় সমূহকে নিজের অধীন বা সম্পূর্ণরূপ সংযত করার ক্ষমতাকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহশক্তি বলে।

(ঘ) ধারণাশক্তির নাম ধৃতিশক্তি, অপকারক ব্যক্তির প্রত্যপকার করার নিমিত্ত যে কুপ্রবৃত্তি বিজৃম্ভিত হয় তাহাকে দমন করার শক্তিকে ক্ষমা-শক্তি বলে। অসদ্ভাবে ধনগ্রহণের নিমিত্ত যে প্রবৃত্তি হয় তাহাকে দমন করার ক্ষমতাকে অস্তেয়শক্তি বলে। এবং সত্য ব্যবহারের শক্তিকে সত্যশক্তি, আর ক্রোধের সংযম করার ক্ষমতাকে অক্রোধ শক্তি বলে।

সামান্য উন্মেষ মাত্র হইয়াছে, আর ধৃতি, ক্ষমা অস্তেয়, সত্য, ও আক্রোধাদির পূর্ণ বিকাশ হয় নাই, কিন্তু বাহ্যবস্তুবিষয়িনী ধী-শক্তির সম্পুর্ণ বিকাশ হইয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে পঞ্চম শ্রেণীর অন্তঃসার বলা যাইতে পারে (ঙ)।

এই পাঁচ প্রকার অন্তঃসারের মধ্যে প্রথমটি সর্ব্বোচ্চ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার নীচে দ্বিতীয়টি তাহার নীচে তৃতীয়টি তাঁহার নীচে চতুর্থটি এবং তাহার নীচে পঞ্চমটি পরিগণিত হয়। ইহাদের উৎপত্তি পারম্পর্য্যও আছে; তাঁহাদের প্রথম হইতে অন্তঃসার না থাকে তাঁহাদের ঐ সর্ব্ব নীচে (পঞ্চম শ্রেণীর) অন্তঃসার হইতেই ক্রমে চতুর্থ, তৃতীয় তৎপর দ্বিতীয়, তৎপর প্রথম শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ অন্তঃসার জন্মিয়া থাকে। ইহার প্রণালী সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।—

প্রথম একজন অন্তঃসার শূন্য ব্যক্তি মনে মনে লক্ষ্য করিয়া লও,—ভাবিয়া লও যেন এমন একজন ব্যক্তি আছেন যাঁহার বিবেক, বৈরাগ্য ঔদাসীন্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, আত্মজ্ঞান, ধীশক্তি, ক্ষমা শক্তি, ধৃতি শক্তি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ শক্তি বা অক্রোধাদি শক্তি কিছুই নাই, তিনি কেবল সাধারণ পশুর ন্যায় যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতেছেন, অর্থাৎ যখন যে ইন্দ্রিয় শক্তি যে ভাবে পরিস্ফূরিত হয় তাহা তৎক্ষণাৎ সেই ভাবে চরিতার্থ হয়, যখন যেরূপ মনোবৃত্তি বিকসিত হয় তখনই তাহা, অনিবার্য্য ভাবে সেই কার্য্য করিয়া ফেলে ইত্যাদি অবস্থায় আছেন।

এখন মনে কর, ইনি ভাগ্যক্রমে সৎসংসর্গ এবং অধ্যয়নাদি লাভ করিয়া ক্রমেই বাহ্য জগতে প্রবেশ করা শিখিতে লাগিলেন,—সূর্য্য কিরণ যেমন পৃথিবীর উপরিভাগের রস আত্মসাৎ করিয়া ক্রমে নিম্নস্তরে প্রবেশ করিতে থাকে, তিনিও সেইরূপ, বাহ্য জগতের স্থলস্তরের এক একটি কথা বুঝিতে পারিয়া তাহার রস (মর্ম্ম) আত্মসাৎ করত ক্রমে তাহার অন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, আচার্য্যের উপদেশাদির সাহায্যে তাঁহার চিন্তা শক্তির মুকুল যেন এক একটু করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল,

(ঙ) বাহ্য বস্তু সকলের প্রকৃতি, গুণ, ক্রিয়াদির পর্য্যালোচনার দ্বারা (সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক) তত্ত্বনির্ণয় করার ক্ষমতাকে বাহ্য বস্তু বিষয়িনী ধীশক্তি বলাযায়।

বারম্বার সজ্ঘর্ষণাদি প্রক্রিয়া দ্বারা যেমন কোন দ্রব্যের মধ্যে তড়িৎশক্তি জড় হইয়া থাকে, তাঁহারও সেইরূপ এক এক বাহ্য বস্তুর চিন্তা করিতে করিতে চিন্তা সংস্কারগুলি ঘনীভূত হইয়া ক্রমে যেন উপচিত হইতে থাকিল। তখন এমন হইল যে, তাঁহার মনোযন্ত্রে কোন বাহ্য বস্তু উপস্থিত হইলে, তাহা তৎক্ষণাৎই পরিস্খলিত হয় না। মন তাহা পরিত্যাগ করিতে চায় না। ক্রমেই তাহার অন্তস্তরে প্রবেশের চেষ্টা করে। তখন তিনি যে কোন বস্তু দেখেন কিম্বা শুনেন তাহারই আকৃতি প্রকৃতি, গুণ, স্বভাব, কারণ, ক্রিয়া ও ক্রিয়াপ্রণালী প্রভৃতি চিন্তা করিতে থাকেন। ক্রমেই উহা বহিস্তর হইতে অন্তঃস্তরে প্রবেশ করিতে থাকে। যখন এইরূপ অবস্থা হয়, তখনই ধীশক্তির বিকাশ হইল, তিনি ধীশক্তি-সম্পন্ন হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাহার মধ্যে যে শক্তি বা যে পদার্থ থাকে, সে তাহা অন্তরে অন্তরে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। যেমন আমরা অভ্যন্তরে সমুৎপন্ন সুখ দুঃখাদির মানসিক প্রত্যক্ষ করিতে পারি, সেইরূপ যাঁহার ধীশক্তি বিকসিত হয়, তিনিও তাঁহার মনে মনে অনুভব করিতে পারেন; সুতরাং তৎসঙ্গে তাঁহার অন্তর্জগতে প্রবেশের ক্ষমতাও কিছু বিকসিত হয়,—কারণ ধীশক্তি অভ্যন্তরের বস্তু; অতএব অভ্যন্তর প্রদেশে কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে না পারিলে, তাহা কিরূপে অনুভব করা যাইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, কোন বিষয় চিন্তা করিতে হইলে চিত্তের অনেকটা স্থিরতার প্রয়োজন, চিত্ত যখন নানা বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক বিষয়ে স্থিরতা লাভ করে, তখন কেবল অন্তরে অন্তরেই তাহার ক্রিয়া হইয়া থাকে, সুতরাং তখন স্বতঃই কিছু অন্তঃপ্রবেশ না হইলে চলে না। অতএব অন্তঃসারের সম্পূর্ণ অভাব অবস্থায় যেমন নিজের অস্তিত্বটা যেন ভাসাভাসাভাবে বাহিরে বাহিরেই থাকে, ধীশক্তির বিকাশ হইলে সেই অস্তিত্বটা যেন কিছু অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করে। চিত্তের চঞ্চলতার হ্রাস হইয়া অভ্যন্তর প্রবেশের ক্ষমতা কিছু হইলেই তৎপরে ধারণাশক্তি, ক্ষমাশক্তি, সত্য, ও ক্রোধসংযম প্রভৃতি শক্তিগুলি বিকসিত হইতে পারে। কারণ চিত্তের চঞ্চলতা নিবৃত্তি হইয়া অভ্যন্তরে অভিনিবেশের ক্ষমতা থাকিলে যে এই সকল প্রবৃত্তির (ধৃতি ক্ষমাদিশক্তির) বিকাশ হয়, তাহা একটু বিবেচনা করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। "ধর্ম্মব্যাখ্যায়" এ বিষয় অতি বিস্তারে বলিয়াছি।

ধৃতি, ক্ষমা, প্রভৃতি অনেকগুলি শক্তির বিকাশ হইলে, অন্তরাত্মা আর একটু পরিপুষ্ট হয়। অন্তঃপ্রবেশের ক্ষমতাও আর একটু বৃদ্ধি পায়। এবং অভ্যন্তরের অনুভবটা আর একটু বাড়ে। সেই ঈষৎ উন্মেষিত আন্তরিক অস্তিত্বের উপর বিশেষ একটু মমতাও হয়। অবার একটু স্বাধীনতা বিকশিত হয়, তখন ইন্দ্রিয় ও মনের প্রবৃত্তির উপর কিছু একটু ক্ষমতা বিকশিত হয়। অতএব তখন দম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তিশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে।

এখন অন্তরাত্মা আরও পরিপুষ্টি লাভ করে, কারণ এখন তাহার অনেকগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গসম্পন্ন হইল। এখন নিজের অস্তিত্বটা যেন আর একটু অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অন্তঃপ্রবেশের ক্ষমতাও আর একটু বৃদ্ধি পায়, অন্তরের অনুভবক্ষমতাও বাড়ে। সুতরাং আন্তরিক অস্তিত্বের উপর পূর্ব্বে যাদৃশ মমতা ছিল, তদপেক্ষায় আরও বৃদ্ধি পায়, ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তির উপর আধিপত্য আরও উন্মেষিত হয়। সুতরাং তখন বিবেক বৈরাগ্যাদির বিকাশ হইতে থাকে। তখন অধ্যাত্মজগতের পদার্থগুলির বিচার করিতে পারা যায়, এবং তাহাদের পরস্পরের বিভিন্নতা, আকৃতি, প্রকৃতি, গুণ, ধর্ম্ম, ক্রিয়া ও ক্রিয়াপ্রণালী প্রভৃতি সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পারা যায়। দেহের মমতাও অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। সুতরাং দৈহিক সুখে বিতৃষ্ণা হইয়া পড়ে। এবং দৈহিক সুখদুঃখাদিতে আসক্তি ও বিদ্বেষাদি কমিয়া যায়। তাহাই বিবেক, বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্যাদির বিকাশ।

এই অবস্থার পরিপক্কতা হইলে ক্রমে আত্মজ্ঞানশক্তির বিকাশ হইয়া পরিপূর্ণ অন্তঃসার জন্মে। এখন ইহাদের প্রত্যেকের বাহ্য লক্ষণ শুন, তাহা হইলেই ইহার সবিশেষ মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবে। প্রথম ৫ম শ্রেণীর অন্তঃসারের বাহ্য লক্ষণ অর্থাৎ যদ্দারা বাহির হইতেই পঞ্চম শ্রেণীর অন্তঃসার বা আন্তরিক অস্তিত্ব বুঝা যাইতে পারে।

(পঞ্চম শ্রেণীর আন্তরিক অস্তিত্বের লক্ষণ)

যাঁহার পঞ্চম শ্রেণীর আন্তরিক অস্তিত্ব থাকে, তিনি স্বভাবতঃই চিন্তা দ্বারা প্রত্যেক বিষয়কে আপন আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন, কেবল ভাসা ভাসা রূপে, কোন বিষয়ের বহিঃস্তরটা মাত্র দেখিয়াই নিরস্ত থাকেন না। বিষয়টি দর্শন বা শ্রবণমাত্র তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক তন্ন তন্ন করিয়া তাহার সকল দিক অন্বেষণ করিতে

থাকেন, এবং তাহার আকৃতি, প্রকৃতি, গুণ, ধর্ম্ম ক্রিয়াপ্রণালী, কারণ, ও কার্য্য ইত্যাদি সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক অবগত হইয়া তাহাকে গ্রহণ বা পরিত্যাগ বা যে কোন প্রকার ব্যবহার করা যায়, তাহা করেন, এ জন্য তিনি হঠাৎ কাহারও কথা বিশ্বাস করিতে পারেন না। আর যদি, বিশ্বাসের উপযুক্ত কোন কারণ থাকে, তবে অভিমানাদি-পরবশ হইয়া কদাচ তাহা উপেক্ষা করেন না, কিন্তু যে বিষয়ে তাঁহার চিন্তা করার অধিকার বা অভ্যাস না থাকে, এমন কোন বিষয় হইলে, যাহারা সেই বিষয়ের চিন্তাশীল বা পারগ তাঁহাদের কথায় শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, এবং তদনুযায়ী ব্যবহারও করেন। অর্থাৎ মনে কর, তিনি একজন অদ্বিতীয় রসায়নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, কিন্তু অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে কখনও কোন চিন্তা বা অভ্যাস করেন নাই, তাহা হইলে, যাঁহারা অধ্যাত্মচিন্তক এবং অধ্যাত্মতত্ত্বপরায়ণ লোক, তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন। ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি (পঞ্চম শ্রেণীর অন্তঃসারবান্) অতি নীচ অবধি শ্রেষ্ঠ পর্য্যন্ত কাহা-রও কথাতে অবজ্ঞা করেন না, প্রত্যুত সকলের কথাই বিশেষ মনো-নিবেশ পূর্ব্বক শুনিয়া থাকেন, কারণ চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট এমন কোন কথা বা এমন কোন বিষয় নাই, যাহা হইতে তিনি কোন না কোন প্রকার সার সংগ্রহ করিতে না পারেন। যে কথা এবং যে বিষয়ই হউক না কেন, তাহা হইতেই তিনি কিছু না কিছু সারতত্ত্ব আহরণ করিতে পারেন। ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির অধ্যবসায় চিরস্থায়ী হয়, শীঘ্র তাঁহার উদ্যম ভঙ্গ হয় না; ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষ সারবত্তা না বুঝিয়া, আচার, ব্যবহার, ভাষা, ও পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে সঙ বা বহুরূপীর ন্যায় কাহারও অনুকরণ করিতে সাহসী হয়েন না; ধীশক্তি-শালীব্যক্তির বিদ্যাভিমান থাকে না, কারণ তিনি যতই পরিশ্রম সহকারে এক এক বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে থাকেন, ততই তাহার মধ্যে এত অজ্ঞাত বিষয় দেখিতে পান যে তদ্দারা তিনি আপনার জ্ঞানকে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারেন না। একগাছী তৃণ মধ্যেও যদি তিনি মনোনিবেশ করেন, তবে তাহার মধ্যেও এত অসঙ্খ্য অজ্ঞাত বিষয় দেখিতে পান যে সেইখানেই তাঁহার সমস্ত অভিমান বিচূর্ণিত হইয়া নিজের অজ্ঞতা সপ্রমাণ করে। কিন্তু যতই নিরেট মূর্খ, ততই জ্ঞানাভিমান দেখিতে

পাইবে। ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কাহারও মুখের কথা কিম্বা লিখিত কথা শুনিয়া বা পড়িয়াই সন্তুষ্ট হয়েন না, এবং তদ্দ্বারা যে তাঁহার পাণ্ডিত্য হইল, তাহাও মনে মনে বিশ্বাস করেন না। যখন নিজের চিন্তাশক্তি দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারেন, তখনই সেইটুকু জানিলেন বলিয়া বিশ্বাস করেন। আরও বহুতর লক্ষণ আছে,—তদ্দ্বারা ধীশক্তির (পঞ্চম শ্রেণীর অন্তঃসারের) পরিচয় পাইতে পারা যায়,—তাহা প্রবন্ধের বিস্তার ভয়ে বলিলাম না। এই গেল পঞ্চম শ্রেণীর অন্তঃসার বা ধীশক্তির লক্ষণ। আমরা বিশ্বাস করি, ইউরোপাদি দেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ মাত্রেই এই পঞ্চম শ্রেণীর অন্তঃসারবান্ হইতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে এই পঞ্চম শ্রেণীয় অন্তঃসারবান্ লোকও এমত বিরল হইয়া পড়িয়াছেন যে, আমার মত অল্পদর্শী লোকের পক্ষে তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া ভার। এখন চতুর্থ শ্রেণীর অন্তঃসারের লক্ষণ চিন্তা করা যাইতেছে।

(চতুর্থ অন্তঃসারের লক্ষণ)

ধীশক্তি বিকাশের পর ধৃতি, ক্ষমা, অস্তেয় প্রভৃতি শক্তি বিকসিত হইলে ঐ সকল শক্তির কার্য্য দ্বারাই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারা যায়। কিন্তু এখন বলা বাহুল্য যে, উচ্চতর অন্তঃসার উৎপন্ন হইলে নীচতর অন্তঃসার এবং তাহার লক্ষণ সকল বিলুপ্ত হইয়া যায় না, প্রত্যুত সেইগুলি থাকিয়াই ক্রমে অন্যান্য শক্তি ও লক্ষণের বিকাশ হইয়া থাকে,—যখন ধৃতিশক্তি, ক্ষমাশক্তি ও সত্যশক্তি প্রভৃতির বিকাশ হয়, তখন পরিপূর্ণ ধীশক্তি এবং তদীয় লক্ষণ সমূহ অব্যাহত থাকে, বরং আরও তাহার শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায়। চতুর্থ অন্তঃসার হইলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলিও থাকে, অথচ তিনি সত্যনিষ্ঠা-সম্পন্ন, ধারণাবান, যত্নশীল, যথাবিহিত অর্থোপার্জ্জন তৎপর, বিশুদ্ধচেতা এবং বিজিত ক্রোধ ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন। এখন তৃতীয় অন্তঃসারের লক্ষণ চিন্তা করা যাউক।

(তৃতীয় অন্তঃসারের লক্ষণ)

ধীশক্তি ও সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি পঞ্চম চতুর্থ অন্তঃসার উপচিত হইয়া যখন শম, দম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এবং ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি শক্তিগুলির সঞ্চয় হইতে থাকে, তখন তাঁহার পূর্ব্বোক্ত স্বগত লক্ষণগুলি (৫২।১১ অবধি ৫৭ পৃঃ ২২ পং পর্য্যন্ত) প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন আন্তরিক অস্তিত্বটি বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, এমন কি এই স্থূল দেহটা তখন যেন

দ্বিতীয় এক ব্যক্তির মত মনে হয়। তখন প্রায় সর্ব্বদাই দেহের অভ্যন্তরে নিজের অস্তিত্বের অনুভূতি হয়; "আমিত্বটা" যেন দেহের উপরিস্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভ্যন্তরে গুটিয়া আইসে, কেবল ঐ সকল শক্তিগুলির উপরই "আমিত্বের" অনুভূতি হইয়া থাকে, দেহের অভ্যন্তরে যেন একটা জাজ্বল্যমান অস্তিত্ব বা সত্তার উপলব্ধি হয়। দেহের অভ্যন্তরে সুখ বা দুঃখ হইলে তাহার অস্তিত্ব যেরূপ সুস্পষ্ট অনুভব হয়, শোক বা হর্ষাদি শক্তির বিকাশে যেরূপ জ্বলন্ত মানসিক প্রত্যক্ষ করা যায়, আন্তরিক অস্তিত্ব বা অন্তঃসার পরিপুষ্ট হইলেও তাহার সেইরূপ জ্বলন্ত অনুভব হইয়া থাকে, এই দেহের মধ্যে, সমস্ত দেহযন্ত্রের পরিচালক—দেহের অধ্যক্ষ বা কর্ত্তা অথচ দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন যে একটি পদার্থ (আত্মা) আছে, তাহা বিলক্ষণরূপে অনুভব হইয়া থাকে, এবং সেই পদার্থটির (আত্মার) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ যে শক্তিগুলি আছে তাহার অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধীশক্তি, সত্যনিষ্ঠা, অক্রোধ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিবেক, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, সরলতা, শান্তি, ও আত্মানুভূতির ক্ষমতা প্রভৃতি সমস্ত শক্তিগুলি অন্তরে দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ অন্তরে অন্তরে যাহার মধ্যে যে সম্পত্তি থাকে সে তাহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারে ইহা চেতন প্রাণীর লক্ষণ। দেহের অভ্যন্তরে অতি সামান্য পরিমাণে একটু সুখকণিকা কিম্বা দুঃখস্ফুলিঙ্গ, অথবা অণুমাত্র শোক বা হর্ষাদি বিকসিত হইলে তাহা যখন আত্মার অপরিচিত থাকে না, যেই বিকশিত হওয়া অমনি তৎক্ষণাৎ মনে মনে প্রত্যক্ষ হওয়া, আবার ক্রোধ, কাম, ঈর্ষা, অসূয়াদি প্রবৃত্তি বিজৃম্ভিত হইলেও তাহা বিলক্ষণ অনুভব করা যায় ইহা সকলেই অবগত আছেন; তখন আমাদের পূর্ব্বোক্ত অসঙ্খ্য শক্তিময় অন্তঃসার বা আন্তরিক অস্তিত্ব পরিপুষ্ট হইলে যে তাহা আমরা অন্তরে অন্তরে দেখিতে পাইব না, ইহা কি সম্ভবপর মনে হয়?

সুখ, দুখ, হর্ষ, শোক, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা ও অসূয়াদি শক্তিগুলির অবস্থিতি কালে যেমন আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি, তেমন উহা-দের এক কালে অভাব বা হ্রাস বৃদ্ধি হইলেও তাহা বিলক্ষণ অনুভব হয়; তদ্রূপ, অন্তঃসার বা আন্তরিক অস্তিত্বেরও যখন হ্রাস বা ক্ষয় কিম্বা বৃদ্ধি হয় তাহাও অন্তরে অন্তরে অনুভব করা যায়, এবং অন্তঃ-সার না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন কেবল এই দেহের উপরেই মমতা বা "অহং-

ভাব আমিত্ববোধ” থাকে, অন্তঃসার বিকসিত ও পরিপুষ্ট হইলে তাহার উপরেও সেইরূপ মায়া মমতা, অহংভাব হইয়া থাকে। প্রত্যুত দেহের মায়া মমতা তখন একবারেই কমিয়া যায়, ইহা পূর্ব্বেই অন্তঃসার কাহাকে বলে এই প্রবন্ধে বিস্তর মতে বলিয়াছি।

এই জন্য যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, আত্মার বা অন্তঃসারের কোন প্রকার ক্ষয় কিম্বা একবারে বিনাশ হয়, তাহা অন্তঃসারবান্ ব্যক্তি কদাচ করিতে পারিবেন না, কেন না ঐরূপ কার্য্য সাধারণ দৃষ্টিতে অতিশয় সুখ-জনক হইলেও, তাঁহার পক্ষে উহা অতীব ক্লেশদায়ক হইবে। কারণ অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তির এই দেহের হস্তপদাদি একএকটি অবয়ব ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিলে, কিম্বা রুগ্ন বা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে যেরূপ অনিষ্ট বোধ হয়, অন্তঃসারবান্ ব্যক্তির অন্তরাত্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষয় বা হ্রাস কিম্বা রুগ্ন অবস্থা হইলেও ঠিক সেইরূপ অনিষ্ট বোধ হইবে।

আর যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অন্তঃসার বা আত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টি বা বৃদ্ধি হয়, অন্তঃসারবান্ ব্যক্তি তাহাতেই বিশেষ সুখবোধ করেন; সুতরাং ঐরূপ কার্য্য, সাধারণ দৃষ্টিতে অতিশয় দুঃখ-জনক বিবেচনা হইলেও অন্তঃসারবান্ ব্যক্তির কিছুমাত্র ক্লেশাবহ নহে। ভাবিয়া দেখুন; এসংসারে যিনি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই কেবল আত্মার পরিপুষ্টি বা পরিতৃপ্তি বা শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত। তবে তাহার মধ্যে বিশেষ এই যে, যাহাদের জড়পিণ্ড স্বরূপ এই দেহটা ব্যতীত অন্তরাত্মা এখনও সম্পূর্ণরূপ জন্মে নাই, কিম্বা পূর্ব্বে কোন দিন ছিল কিন্তু, এইক্ষণে আবার এই দেহের সঙ্গে মিশা-ইয়া গিয়াছে—তাঁহারা অগত্যা এই জড়পিণ্ড দেহকেই আত্মা বা “আমি” বলিয়া অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন, এজন্য তাঁহারা কেবল এই দেহে-রই পরিপুষ্টি বা পরিতৃপ্তির নিমিত্ত যাবৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু বিবেচনা করিলে সেই কার্য্যও তাঁহাদের আত্মার নিমিত্তই করা হইল, অন্যের নিমিত্ত নহে; কেন না, তাঁহাদের দেহই আত্মার মধ্যে গণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর যাঁহাদের অন্তঃসার পরিপুষ্ট হইয়া দেহ হইতে পৃথক অন্তরাত্মা জন্মিয়াছে, কিম্বা পূর্ব্ব হইতেই আছে তাঁহারা এই দেহটা বাদ দিয়া দেহের মধ্যবর্ত্তী সেই পূর্ব্বোক্ত শক্তিসমষ্টিস্বরূপ অন্তঃসার বা আন্তরিক অস্তিত্বের উপরেই “আমিত্ব” বোধ করেন বলিয়া সেই

অন্তঃসার বা অন্তরাত্মার পরিপুষ্টি ও পরিতৃপ্তি কামনা করিয়াই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। এবং সেই আন্তরিক তত্ত্বের যদি কোন একটী হানি হয় তবে তাঁহারা আন্তরিক অস্তিত্ব বিহীন দেহাত্মদর্শীয় হস্ত পদাদি অঙ্গচ্ছেদনে যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ আত্মহানির দুঃখ অনুভব করেন, সেই জন্যই আত্মহানিজনক কোন কার্য্য করিতে পারেন না। দৈহিক সুখ স্বচ্ছন্নতাদির নিমিত্ত যখন কোন প্রকার কুপ্রবৃত্তির ঈষৎ পরিস্ফুরণ হয়, তৎক্ষণাৎ তিনি অনুভব করিতে পারেন যে তাঁহার আত্মায় দম, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, বা-বিবেকাদি কোন একটী প্রধান অঙ্গের বিমর্দ্দন বা বিনাশ করিয়া ঐ কুপ্রবৃত্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিল, এবং ঐ অঙ্গহানিজনিত দুঃখের অনুভব করিয়া থাকেন, সুতরাং তৎক্ষণাৎ ঐ দুঃখদায়ক শত্রুস্বরূপ কুপ্রবৃত্তিটা দমন করিয়া পুনর্ব্বার আপনার অস্তিত্বের দণ্ডায়মান হয়েন, সুতরাং কোন প্রকার কুপ্রবৃত্তি বা পাপ তাঁহাদের মনে মনেও স্থান পাইতে পারে না, তাই বাহিরেও প্রকাশিত হইতে পারে না এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিও হইয়া থাকে!

কিন্তু যাঁহারা আন্তরিক অস্তিত্ব বিহীন প্রাণী কেবল দৈহিক বা ব্যব-হারিক অস্তিত্বশালী; তাঁহাদের অন্তরের নিমিত্ত কোন প্রকার মমতা থাকে না, সমস্ত মমতাই বাহিরে; বাহিরে যদি কোন প্রকার অপকার বা অসুখের কারণ হয়, তাহাই তাঁহারা ক্ষতিজনক মনে করেন এবং বাহিরের ক্ষতিটা না হইয়া যাহাতে কেবল বাহিরেরই উপকার হয় তদ্বিষয়েই যত্নবান থাকেন। এই গেল তৃতীয় শ্রেণীর আন্তরিক অস্তিত্ব বা অন্তঃসারের লক্ষণ। দ্বিতীয় এবং প্রথম প্রকার অন্তঃসারের কথা এখানে বলিব না, কারণ তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না, সংক্ষেপেও হইবে না।

মনুসংহিতা।

গতবারে আমরা যথাসাধ্য বিস্তারমতে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে বর্ত্তমানে আমরা যে অর্থে “অধ্যয়ন” শব্দ গ্রহণ করি পূর্ব্বে সে অর্থে গৃহীত হইত না। প্রাচীনকালে “অধ্যয়ন” শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইত তাহাও গতবারের প্রবন্ধে একরূপ বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। এ

প্রবন্ধে আমরা অধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহাই সাধ্যানুসারে আলোচনা করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কেবল কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকাকারে শাস্ত্রীয় বাক্যাবলী অভ্যাস করিয়া স্থানবিশেষে তাহারই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করার নাম অধ্যয়ন নহে। কিন্তু সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় শ্লোকের নানা প্রকার সদ্যুক্তি ও সাধু-মীমাংসার দ্বারা যে প্রকৃত অর্থ অবধারণ পূর্ব্বক সেই বিষয় গুলি নিজ হৃদয়ে অনুভব করা, অর্থাৎ দেহাভ্যান্তরবর্ত্তী সুখ দুঃখ প্রভৃতি যেরূপ অন্তরে অন্তরে সুস্পষ্ট মানসিক প্রত্যক্ষ করা যায়, সেই রূপ অন্তরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া যখন শাস্ত্রার্থ আয়ত্ত করিলাম তখনই আমার পূর্ণাধ্যয়ন হইল। কেন না অধীত বিষয়ের অন্তরে অন্তরে প্রত্যক্ষ করাই অধ্যয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মনে করুন আমরা ভগবান্ কপিলদেবের একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছি। সেই নিত্যবুদ্ধ মুক্তস্বভাব ভগবান্ কপিলদেবের চিত্তের একান্ত একাগ্রতাবস্থায় যোগস্থ হইয়া, আপনার অস্তিত্ব ব্রহ্মসত্ত্বায়বিলীন করিয়া একবারে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তাবস্থায় তাঁহার অন্তরে যে সমস্ত জ্ঞানরাশী উদিত হইয়াছিল, তাহাই তিনি তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে অক্ষরাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এখন দেখুন, আমার মলিন কুসংস্কারাপন্ন আত্মাতেত সহজে সে সমস্ত জ্ঞানরাশি উপচিত হইতে চাহে না। এ অবস্থায় যদি মহর্ষি কপিল দেবের গ্রন্থ সর্ব্বদা পাঠ করি তাহা হইলে পুঃন পুঃন অভ্যাস জন্য তাঁহার গ্রন্থনিহিত ভাবনিচয় অল্পে অল্পে আমার আত্মার সংস্কারাবস্থায় থাকিয়া যাইবে। কেন না "বিদ্যা অভ্যাসজঃ সংস্কার" অর্থাৎ অধ্যয়ন জন্য যে সংস্কার তাহার নাম বিদ্যা। ক্রিয়া মাত্রেরই একটি সংস্কার থাকিয়া যায়, অর্থাৎ আমাদের মনে যে কোন ভাবেরই উদয় হউক না কেন, তাহার একটি সংস্কার থাকিয়া যায়। এখন একটী ভাবই যদি পুঃন পুঃন উদয় হয় তাহা হইলে তাহার সংস্কারও ক্রমেই দৃঢ় হয়। এখন মনে করুন আমি ঋষি প্রণীত একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া সদ্যুক্তি ও সাধু চিন্তা দ্বারা গ্রন্থ নিহিত ভাবরাশি সংগ্রহ করিলাম, এই ভাব আমার আত্মার সংস্কারাবস্থায় থাকিয়া গেল। আমি যতই ঋষি প্রণীত গ্রন্থ সকল পাঠ করিব, ততই তাঁহাদের অন্তর্নিহিত উন্নত, পবিত্র, ও আত্মার উৎকর্ষসাধক ভাবরাশি আমার আত্মার সংস্কারাবস্থায় পরিণত হইয়া পূর্ব্বসংস্কার দৃঢ় করিবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মারও উন্নতি হইতে থাকিবে। আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের উপদেশাদি না পাইয়াও তাঁহাদের তপস্যা ও কঠোর সাধনলব্ধ ভাবসমুদ্রে বিভাসিত উপদেশ সমস্ত অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুষ্ঠানে মনোযোগী হইব। ইহাইত অধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে কি উপায়, অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, এবং সেই সেই ভাব সমূহ মনোমধ্যে উদিত করিতে, দেহ মনের কিরূপ অবস্থা হওয়া আবশ্যক সে সকল বিষয় আমরা আগামীবারে আলোচনা করিব।

১ম ভাগ ৫ম খণ্ড

বেদব্যাস

মাসিক পত্র

ভাদ্র ১২৯৩

বিষয়	নাম	পৃষ্ঠা
ছাত্র ও শিক্ষক	শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ	৯৫
ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী কে?	শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন শাস্ত্রী সরস্বতী	১০১
আলস্য	শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার	১০৭
উন্নতি ও অবনতির অর্থ	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি	১১৩

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

কলিকাতা।

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম মেসিন প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও ৬৬নং কলেজ ষ্ট্রীট. কলিকাতা হইতে
শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
প্রকাশিত।

হা-
মস্ত
অধ্য-
ন্মন
নের
বারে

বেদব্যাস।

১ম ভাগ | ১২৯৩ সাল। | ৫ম খণ্ড।

ছাত্র ও শিক্ষক।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ছাত্রদিগের গুরুভক্তি যে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বোধ হয় গুরুর কৃত কার্য্য, কত মহৎ তাহা সম্যক অবগত নহেন বলিয়াই নব্যেরা তাঁহাদের প্রতি সমূচিত আচরণ করেন না। বাস্তবিক, দেখিতে গেলে গুরূপদেশ ব্যতিরেকে, মনুষ্যের প্রকৃত মনুষ্যত্বই সম্পাদিত হয় না। কে পূর্ণপ্রজ্ঞা লইয়া জননী জঠর হইতে ধরাতল স্পর্শ করিয়াছে? তাদৃশ শিশুর কথা দূরে থাক্, যাহারা বয়ঃস্থ হইয়া, দেখিয়া, শুনিয়া বা ভুক্তভোগী হইয়া দূরদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও কি আমরা পদে পদে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিতে দেখিনা? এ নিত্যনূতন ভাবাপন্ন সংসারপথে পরিভ্রমণ করিতে হইলে, কোন্ ব্যক্তিকে ভ্রান্তি-কান্তারে পতিত হইতে না হয়? এখানে মোহের অন্ধকারে দৃষ্টিরোধ করে, ক্রোধের উত্তুঙ্গতায় পদস্খলন জন্মায়, পক্ষপাত বাত্যায় দিগ্‌ভ্রম উৎপাদন করে, এইরূপে সহজেই আমরা ভ্রমপ্রমাদ গহ্বরে পতিত হই। এইরূপ অধঃপাত সময়ে কাহারও সাক্ষাৎ নিষেধবাক্যে, কাহারওবা হস্তাবলম্বনে, কাহারও উপদেশস্মরণে, অথবা পূর্ব্বপ্রকৃতিলব্ধ-প্রবোধের আবির্ভাবে, আমরা ভ্রংশ হইতে রক্ষা পাই। এই এই ব্যক্তিগণ সকলেই আমাদিগের শিক্ষক এবং অবস্থাভেদে পিতামাতাদিরূপ গুরুজন ও অধ্যাপক আচার্য্যাদি শব্দের বাচ্য। তন্মধ্যে বিদ্যাদাতা ও জন্মদাতা, সমান পূজ্য বলিয়া, উক্ত হইয়াছে। জন্মদাতা পিতার সহিত তুল্যতাখ্যাপন করাতেই শিক্ষকের গুরুত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে;

কারণ এ পৃথিবীতে পিতামাতার তুল্য গুরু কে আছে? পিতা সাক্ষাৎ ব্রহ্মার ও মাতা ধরণীর মূর্ত্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ যাহাদের হইতে আমরা এই দেহ ও অন্তঃকরণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই পিতামাতার গুরুত্ব বিষয়ে আর বক্তব্য কি আছে? যাহাদের হইতে আমরা সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রজ্ঞা, আয়ু, সহিষ্ণুতা, তেজস্বিতা, শৌর্য্য, সৌকুমার্য্য, চরিত্র, ধর্ম্মনিষ্ঠা সকলই, প্রদীপ হইতে প্রজ্বলিত প্রদীপান্তরের ন্যায়, অবিকলভাবে প্রাপ্ত হই, তাঁহাদিগের গুরুত্বের মাহাত্ম্য আর কোন্ কথায় অভিব্যক্ত হইতে পারে? এই পৃথিবীতে যে আমাদিগের সত্তা ছিলনা, যাঁহারা আত্মা ও দেহের অর্দ্ধার্দ্ধদানে, আমাদিগের দেহের পৃথক সত্তা সংস্থাপন করিয়াছেন, অন্য কোন বস্তুর দাতার সহিত তাঁহাদের তুলনা সম্ভবপর? একমাত্র বিদ্যাদাতা উহার তুলনা হইতে পারেন। পিতামাতার প্রসাদে আমরা স্থূল জন্ম গ্রহণ করি। বিদ্যাপ্রভাবে এ জগতে যেন আমাদিগের সূক্ষ্মরূপে ও প্রকৃতরূপে জন্মলাভ হয়। আমরা যেন আর একবার সূক্ষ্মরূপে চক্ষুরাদি জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয়গুলি লাভ করি। জড়তায় ও প্রাজ্ঞতায় তুলনা করিলে, কে আমাদের সেই প্রাজ্ঞাবস্থাকে জন্মান্তর বলিয়া স্বীকার না করিবে? বিশেষতঃ আচার্য্য যথাবিধি উপনয়ন বিধানপূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধন যে বেদবিদ্যা প্রদান করেন, তাহার তুলনা আর কোন বস্তুতেই সম্ভবে না। দেখ; পিতামাতা হইতে আমরা দেহ, অন্তঃকরণ সকলই প্রাপ্ত হই বটে, কিন্তু সে সকলই অসংস্কৃত। তাহা হীরকতুল্য অমূল্য হইলেও উপদেশাদি অভাবে অনুদ্ধৃত ও অসংস্কৃত হীরকখণ্ডের ন্যায়, কাষ্ঠলোষ্ট্রের সমদশায় খনির তিমিরময় গর্ভে, গাঢ়তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া কাল অতিবাহন করে। কিন্তু যিনি সে হীরকখণ্ডকে সুসংস্কৃত করিয়া রাজরাজেশ্বর জগদীশ্বরের সেবার উপযুক্ত করেন, তাঁহার আর তুলনা কোথায়? তাঁহার সে কার্য্যকে পুনর্জ্জন্মদান ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে! আমাদিগের অন্ধ তমসাচ্ছন্ন জড়প্রকৃতিকে তাদৃশ প্রবোধপ্রভায় প্রদীপ্ত করিয়া যিনি তাহাকে বিদ্যালোকস্ফুরিত অন্তর্দর্শিনী অধ্যাত্মদৃষ্টি প্রদান করেন, যাহার বলে, আমরা নিত্যানন্দময় চিরাকাঙ্ক্ষিত পথ, সম্মুখে সুপ্রসারিত দেখিতে পাই, তিনি পিতামাতা অপেক্ষাও কেন পূজনীয় না হইবেন? বাস্তবিক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি আচার্য্য কর্ত্তৃক উপনীত হইয়া, বেদপাঠ ও তদর্থজ্ঞান পূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠান করিলে মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়েন বলিয়া উক্ত সাবিত্রী

বাচনলব্ধ অভিনব জন্ম, অজর ও অমররূপে, শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এবং ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই, ঐ জন্ম অক্ষয় বলিয়া, প্রথমজন্মদাতা পিতা অপেক্ষাও, এই ব্রহ্মজন্মদাতা আচার্য্যের অধিক গৌরব কীর্ত্তিত হইয়াছে। মনু স্পষ্ট লিখিয়াছেন "উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান ব্রহ্মদঃ পিতা। ব্রহ্মজন্মহি বিপ্রস্য প্রেত্যচেহচ শাশ্বতম্"। এই নিমিত্তই পিতা সাক্ষাৎ ব্রহ্মার ও মাতা ধরণীর এবং আচার্য্য পরমাত্মার মূর্ত্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। যথা,

আচার্য্যো ব্রহ্মণোমূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিবী মূর্ত্তিস্ত ভ্রাতা স্বো মূর্ত্তিরাত্মনঃ॥

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যাঁহার কৃপায় মনুষ্য মনুষ্যত্ব লাভ করে, জ্ঞাননেত্র প্রাপ্ত হইয়া, মুক্তিপথাবলম্বনে অধিকারী হয়, তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? তাঁহার প্রতি কতদূর ভক্তিপ্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত? তাঁহার বাক্যে ও ব্যবহারে কতদূর অটল বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য! আমি স্বীকার করি, সেরূপ ঋষিতুল্য লোক আজি কালি শিক্ষক মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাও স্বীকার করি যে সেরূপ বেদবাক্যের ন্যায়, আধুনিক শিক্ষকদিগের বাক্যে সর্ব্বথা বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না, বা তাঁহাদিগের ব্যবহারকে সর্ব্বথা আদর্শস্বরূপ জ্ঞান করা যায় না। তথাপি আধুনিকদিগের মধ্যে অনেকাংশে সাধুচরিত শিক্ষক যে একেবারে নাই, এরূপ নহে। তাঁহাদের অনেক উপদেশ যে গ্রাহ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধ্যয়নীয় গ্রন্থসমূহের অনেকস্থলে যে সর্ব্ববাদিসম্মত উপদেশ আছে, তাহাও অবশ্যস্বীকার্য্য। ঐ সকল শিক্ষক ও তাঁহাদের উপদেশ এবং ব্যবহারে সম্যক্ আস্থাপ্রদর্শনপূর্ব্বক তদনুসারে চলিলে, অনেকাংশে সুশিক্ষার ফল ফলে। কিন্তু ছাত্রদিগের হৃদয়ে ঐ সকল স্থিরতররূপে আস্পদলাভ করিতে পারে না, ছাত্রেরাও তদনুসারে চলিতে হৃদয়ের সহিত সম্মত হন না। এক্ষণকার অধিকাংশ শিক্ষকই যেমন বচনসর্ব্বস্ব, ছাত্রেরাও তেমনি শ্রবণসর্ব্বস্ব হইয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহারা উপদেশ সমস্ত কর্ণেই গ্রহণ করেন, সুতরাং কার্য্যে তাঁহাদের তদনুরূপ ব্যবহার সম্পন্ন হইয়া উঠে না। বিবিধরসপূর্ণ উপন্যাস পাঠে, পাঠক যেমন মনে মনেই কখন করুণাবিগলিত, কখন ভীতিবিচলিত, কখনও বা ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়েন, ছাত্রেরাও তেমনি মনে মনেই সত্যবাক্, সাধুশীল, ধর্ম্মনিষ্ঠ, গুরুজনভক্ত হইয়া উঠেন। কথায় কথায় সমাজ ও দেশের হিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে চাহেন, দুই এক

দিন সমাজ বিশেষের বক্তৃতা শুনিয়াই ব্রহ্মবিৎ যোগী হয়েন। তাঁহাদের অনেকের হৃদয়ে, দয়াবৃত্তির উদ্রেক থাকিতে পারে, তথাপি দরিদ্রকে মুষ্টি-ভিক্ষাদানে তাঁহারা কাতর। গুরুজনকে প্রণতি করা, কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া অনেকের ধারণা আছে, কিন্তু কার্য্যতঃ মস্তক অবনমন করিতে, তাঁহাদের বড়ই কুণ্ঠা উপস্থিত হয়। পুষ্পচন্দন দ্বারা ঈশ্বরার্চ্চনা করা, কাহার কাহার হৃদ্য বলিয়া বোধ আছে, কিন্তু কার্য্যতঃ হস্তদ্বারা ঐ সকল স্পর্শ করিতে বড়ই ভার বোধ হয়। ফলতঃ আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে 'হস্তক্ষেপ করিতে ইহাঁরা একান্ত অসম্মত। সুতরাং, গুরুর উদ্দেশে ভক্তিপ্রকাশ ও গুরুর উপদেশ বা গ্রন্থকারের উপদেশের কার্য্যতঃ অনুসরণ ইহাঁদিগের ঘটিয়া উঠে না।

আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ইহাঁদিগের এইরূপ ঔদাসীন্য বড়ই দুঃখের বিষয়। ইহাঁরা এই ঔদাসীন্য প্রকাশে এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছেন, যে তজ্জন্য তাঁহাদিগের কোনপ্রকার কষ্ট বোধ না। প্রত্যুত গ্রন্থকীট হইয়া থাকিতেই ইহারা সুখানুভব করেন'। ইহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত উদ্যোগী তাঁহারা বাক্যসার বা বচনবীর মাত্র। তাঁহাদের বাক্যাবলী আমরা শুক-ভাষিতের ন্যায়, শ্রবণমধুর বলিয়াই মনে করি; কার্য্যক্ষেত্রে উহার কিছু-মাত্র সার্থকতা আছে বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয় না। হায়! যাঁহাদের শিক্ষা, দীক্ষা, ব্যবহার এইরূপ ভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সকল-হিন্দুসন্তান যে অনুষ্ঠানপ্রধান স্বধর্ম্মে ও স্বসমাজে অনুরক্ত ও প্রবৃত্ত থাকি-বেন, এরূপ আশা আর কি বলিয়া হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি? আমা-দিগের ধর্ম্মাদি এরূপ অনুষ্ঠান সর্ব্বস্ব, যে ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠায়ীদিগের শিক্ষায় বাহ্য বা অন্তর ভাবে অনৈক্য থাকিলে চলে না, মৌখিক বা ব্যাবহারিক ব্যাপারে পার্থক্য থাকিলে চলে না। তাঁহাদিগের প্রাইভেট ক্যারেক্টর বলিয়া, যথেচ্ছাচারপ্রতিপোষক প্রচ্ছন্ন যবনিকা নাই, তাঁহাদিগের ধর্ম্মনীতি সাপ্তা-হিক বা সাময়িক বাগাড়ম্বরে পর্য্যবসিত নহে। তাঁহাদের অধ্যয়ন ও তাহার অর্থজ্ঞানপূর্ব্বক বুদ্ধিস্থকরণ, তাঁহাদের ধর্ম্মনীতি ও তাহার আচরণ, তাঁহাদের উপাসনা ও চিত্তসাধন, অভিন্নভাবে মিশ্রিত। এই সকল অনুষ্ঠান বহু অভ্যাসে আয়ত্ত হইতে পারে, কারণ অনুষ্ঠানমাত্রই কিছু না কিছু কষ্টকর। তাই বলিতেছিলাম, এই অনুষ্ঠানসাধ্য দুরূহ ধর্ম্ম বা নীতি কিরূপে অধুনাতন ক্লেশ-ভীরু, আরামপ্রিয়, ফলমাত্রলিপ্সু শিক্ষার্থী যুবকবৃন্দে প্রত্যাশা করা যায়?

কিন্তু ইহাঁদিগেরই পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষগণ, এককালে কেমন সন্তোষের সহিত উক্ত কষ্টকর ব্রতে অভ্যস্ত হইতেন! আমরা শাস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখিতে পাই, আচার্য্য, বেদাধ্যাপনের নিমিত্ত, শিষ্যকে উপনীত করিয়া বাহ্য ও আভ্যন্তর শুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমতঃ তাহাকে শৌচ, আচার, অগ্নিচর্য্যা ও সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষা করাইতেন। ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে যাহাদের দেহ ও আত্মা পবিত্রীকৃত হইয়াছে; শৌচ, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, একাগ্রতা, যাহাদের অন্তঃকরণে স্থিরতর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকেই ব্রহ্মবিদ্যোপদেশের অধিকারী করিতেন। ভগবান মনু কহিয়াছেন, যিনি বিষয়সেবায় সঙ্কল্পশীল, তাঁহার বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যাদি কিছুই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। এবং যিনি উক্তবিধ শৌচসম্পন্ন, নিয়তব্রতচারী ও বিদ্যারূপ অমূল্যরত্নের রক্ষক নহেন, তাঁহাকে বিদ্যাদান করাও নিষিদ্ধ। কেন না, ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয় ক্ষরিত হইলে, চর্ম্মনির্ম্মিত জলপাত্র হইতে যেমন একটী ছিদ্রদ্বারা তাবৎ জল নিঃসৃত হইয়া যায়, তেমনি তাহার তাবৎ প্রজ্ঞা প্রচ্যুত হইয়া থাকে। অতএব সিদ্ধিকাম ব্যক্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, বিলাস, নৃত্য, গীত, বাদ্য, দ্যূত, নিষ্প্রয়োজন বাক্‌কলহ, পরপরিবাদ ও পরহিংসা, মিথ্যা ও মর্ম্মো-পঘাতী বাক্য, স্ত্রীসম্বন্ধে সানুরাগ দর্শন ও স্পর্শন ইত্যাদি দূরে পরিহারপূর্ব্বক সাধনাপথে অগ্রসর হইবেন। এইরূপ কত নিয়ম ও সংযম এবং গুরু-সম্বন্ধে, শিষ্যের কত কত সুমহৎকর্ত্তব্য, তাঁহাদের নিত্যকার্য্যমধ্যে পরি-গণিত ছিল, এ পত্রিকায় বেশী স্থান থাকিলে আমি তত্তাবৎ উদ্ধৃত করিয়া তুলনায় সমালোচনা করিতাম। কুতুহলী পাঠক, একবার মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়টী পাঠ করিয়া দেখিবেন। ক্রমশঃ।

ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী কে?

বিহঙ্গম শিশু ডিম্ব নির্ভেদ করিয়া বহির্গত হইল, চঞ্চু সাহায্যে আহার গ্রহণ করিতে করিতে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ক্রমে বিচিত্র পালকে সজ্জিত হইয়া উড্ডয়ন অভ্যাস করিতে লাগিল। পরিশেষে আত্ম নির্ভর ক্ষমতায় পক্ষিজীবন অতিবাহিত করিতে, তাহার কিছুই ক্লেশ পাইতে হয় না। পাখীর কার্য্যকলাপ, পাখীর সহজ জ্ঞানের উপর, নির্ভর করে; তথাপি প্রথমে কিছু উপদেশের অপেক্ষা করে। অভ্যাসের আবশ্যকতা আছে।

গোবৎস সহজজ্ঞানে প্রণোদিত হইয়া, উঠিতে, উঠিয়া দাঁড়াইতে ও কূর্দ্দন
করিতে অভ্যাস করিয়া, কৃতকার্য্য হয়। মানবগণও ভূমিষ্ঠ হইয়া, সহজজ্ঞানে
মুখ প্রদত্ত চুচক (স্তনের বোঁটা) চোষণ করিতে থাকে, কিন্তু কেবল সহজজ্ঞানে
মনুজসন্তান মানুষ হইতে পারে না। পদে পদে উপদেশ ও অভ্যাস আবশ্যক।
দাঁড়ান, দৌড়ান, কথা বলা প্রভৃতিও মানুষের শিক্ষা করিতে হয়, নচেৎ মানব
সন্তান কিম্ভূত কিমাকার হইয়া উঠিত। শিক্ষা সাহায্যে মানব, মানুষ।
এইরূপ যে কোন বিষয়ে আমরা অভিজ্ঞ হইতে অভিলাষ করি, উপদেশ, অধ্য-
বসায় ও অভ্যাস প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজন। অতি অল্প লোকেই একদিনে
বড় মানুষ হইতে পারে।—আবার যে কোন বিষয়ে আমরা দীক্ষিত হইতে
চাই, তৎপূর্ব্বে তাহার উপযুক্ত হইয়াছি কিনা, সে বিষয়ে শক্তি সামর্থ্য কিরূপ
আছে, তাহারও বিবেচনা করিতে হইবে, বিবেচনা করিয়া দীক্ষা গ্রহণ
করিতে হইবে। তাহা না হইলে প্রয়াস বিফল হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয়
বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের পটুতা একান্ত প্রয়োজন। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের উপলব্ধির
পূর্ব্বেও তদুপযুক্ত অধিকার প্রাপ্ত হওয়া চাই, এ কথা বোধ হয় সকলেরই
স্বীকার্য্য! যেমন বস্ত্রবয়ন শিক্ষা করিতে হইলে, তন্তুবায়ের নিকট থাকিয়া
মনঃসংযোগে বয়নকার্য্য অভ্যাস করিয়া শিক্ষিত হইতে হইবে; উপদেশ
সাপেক্ষ না হইয়া তন্তুর আতান বিতান করিলেই বস্ত্র নির্ম্মাণ ঘটিয়া উঠে
না। আবার বস্ত্র বয়ন শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে ইহাও দেখিতে হইবে, যে তদ্বি-
ষয়ে তাহার অনুরাগ, বুদ্ধি ও সামর্থ্য প্রভৃতি কতদূর আছে। তেমন, ব্রহ্ম-
জ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে তাহার অধিকারী হইতে হইবে, অধিকারী হইয়া
শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর অন্তিকে উপস্থিত হইতে হইবে, তখন গুরু যথা-
উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞ করিবেন।*

পুরাকালে ঋষিগণ অধিকারি ভেদে উপদেশের তারতম্য করিতেন।
প্রকৃতি ও ধারণা শক্তি অনুসারে সকলে সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিতে সমর্থ
হয় না। কারুণিক ঋষিগণও উপযুক্ত অবস্থানুরূপ শিক্ষা প্রদান করিতেন। কালে
কালে নানোপায়ে চিত্তের কষায়াদি দোষ দূর করিতে শিক্ষার্থিগণ যত্ন করিতেন।
আজন্ম চেষ্টা করিয়া, যে অধিকারী হইতে পারে নাই, সে কিরূপ উপদিশ্য-

* তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম নিষ্ঠং।
শ্রুতিঃ।

মান বিষয় অধিগত করিবে? ভগবান বেদব্যাসের নিকট জৈমিনি সামবেদ
শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সুমন্ত অথর্ব্ব বেদ ভিন্ন, আর কিছু শিখিতে পারি-
লেন না। কঠোর সাধনা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ হয় না। সাধনার জন্য, অবশ্যক
হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে হয়। সদগুরুর নিকট বেদান্তাদি অধ্যাত্ম
শাস্ত্র প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এবং ব্রহ্মলাভ করিবার
পূর্ব্বে শাস্ত্রানুমোদিত উপায়ে অনুরূপ অধিকারী হইতে হইবে। 'ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম'
নাম করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়না। পরোক্ষানুভবের ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় ক্ষমতা, এবং
শেষেও পরোক্ষানুভব হওয়া চাই। 'ঔষধ, 'ঔষধ, বলিলেই ব্যাধি অপসা-
রিত হয়না, উপদেশানুসারে অনুপান ও সহপান যোগে ঔষধ সেবন করিতে
হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্ম জ্ঞানের আদৌ অধিকারীর আবশ্যকতা
হয়না। এ বড় সহজ পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সকলেই অধিকারী। ইহাও
উনবিংশ শতাব্দীর এক গৌরব সামগ্রী। নববিধ ব্রহ্মজ্ঞানের পথ আবিষ্কার
সুকৃতি কি দুষ্কৃতির ফল, কি পাশ্চাত্য লোকের তীব্রচ্ছটা, অথবা কোন
"মেসিন" বাহির হইয়াছে আমরা বুঝিতে সক্ষম নহি।—

ঐ যে আপাদ-কঞ্চুক-পরিহিত, শৃঙ্খল-শোভিত বক্ষ, যুবক অকালে অক্ষিতে
উপাক্ষ ধারণ করিয়া প্রচণ্ড-সারদ-মার্ত্তণ্ড-ময়ুখ-মালায় বিচরণ পূর্ব্বক, উন-
বিংশ শতাব্দীর গর্ব্বিত বিজ্ঞান লহরী, উত্তালিত করিতেছেন, উনিও ব্রহ্মজ্ঞানের
অধিকারী!!! পুস্তকৈক-কক্ষ' অজাত শ্মশ্রু কিশোর বিদ্যার্থীও ব্রহ্মজ্ঞানের
অধিকারী!! আর বন্য অশিক্ষিত কেল্টনস্যও (?) ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী!
সকলেই সমবেত হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হৃদয় মন্দিরে উপনীত
হয়। আর সাধনার প্রয়োজন নাই, ভাবনার তাদৃশ আবশ্যকতা নাই, চিত্তশুদ্ধির
ত কথাই নাই, তাহা কেবল কথার কথা। ইহা বালকের ক্রীড়ার ন্যায় বাল-
কত্তা ভিন্ন আর কিছু বলিতে রুচি হয়না। যিনি যাহাই বলুন না কেন,
ইহাতে দেশের কখনও ইষ্ট লাভ হইবেনা প্রত্যুত নাস্তিকতার বৃদ্ধি ও উপ-
ধর্ম্মের প্রশ্রয় মাত্র।

এখন দেখা উচিত, সনাতন বেদ বেদান্ত ও ঋষিগণ, অপার জ্ঞান বলে নির-
ন্তর অনুধ্যানের ফলে কি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বেদান্তের চারিটী অনুবন্ধ,
তাহার একটীর নাম, অধিকারী। অধিকার হওয়ার জন্য সকলেই ভূয়োভূয়ঃ
আদেশ করিয়াছেন। আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, অধিকারী না হইলে, তাহার
কোন সুফল বা সিদ্ধি ঘটিয়া উঠে না। পাশ্চাত্য বিদ্যাই অভ্যাস কর, বিজ্ঞানই

শিখ, বড় বড় চাকুরীই কর, আর সংস্কৃত কলেজের অনুগ্রহে, এমে হইয়া বেদের অপার পার পাইয়াছ বলিয়া আস্ফালন কর, অধিকারী না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, হইবে না। যদি পূর্ব্বজন্মের জ্বলন্ত সুকৃতি পুঞ্জ সঞ্চিত থাকে, তবে অনায়াসে অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু তাহা কদাচিৎ। রীতিমত অধিকারী হইতে হইলে, সাধনচতুষ্ঠয় সম্পন্ন হইতে হইবে; যথা নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ, শম দমাদি সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব।* বেদান্তসারে প্রথমই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়ার উপকরণ ও উপদেশ বর্ণিত রহিয়াছে। লিখিত সাধনচতুষ্টয়ে, কৃতকার্য্যতা ঘটিলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার জন্মে। সর্ব্বাগ্রে অধিকারী হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। বেদান্তসার ছাড়িয়া ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন কর প্রথমই দেখিতে পাওয়া যায় "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" এই সূত্রের ভাষ্যে, ভগবান শঙ্করাচার্য্য মধুর ও সুযুক্তি পূর্ণ বাক্যে কতই বলিয়াছেন। অথ শব্দের এস্থলে অনন্তর অর্থ। অনন্তর অর্থাৎ, উহার পরব্রহ্ম জিজ্ঞাসা অথবা, ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য। উহার পর, এই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির, এই উত্তর, যে, সাধন চতুষ্টয় সম্পন্নানন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করা উচিত। ব্রহ্ম সূত্রে বেদান্ত বাক্যই পরিগৃহীত হইয়া, সূত্রাকারে বিন্যস্ত হইয়াছে। শ্রুতিতেও স্পষ্টরূপেই রহিয়াছে যে, "শান্ত দান্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভুত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ"। সুতরাং বলা বাহুল্য যে ব্রহ্মবিষয়ক যাবতীয় শাস্ত্রই অধিকারী হওয়ার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রাকৃত ও একটী প্রবাদ রহিয়াছে "আটে পীঠে হও দড় তার পর ঘোড়ায় চড়"; অতএব কি লৌকিক কি আধ্যাত্মিক, যে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ কর, সর্ব্বাগ্রে অধিকারী হইয়া প্রার্থনা করিতে হইবে। আড়ম্বরে কোন কাজ হয় না। কেবল সাম্প্রদায়িকতা ঘটে। ইহা কাহারও বারণ করিবার সাধ্য নাই। শম দমাদি সাধনে যাহার অভ্যাস নাই, তাহার ব্রহ্মজ্ঞান ত অতি দূরের কথা, পবিত্র সঙ্গ লাভেও তাহাকে বঞ্চিত হইতে হয়। যৌবনের উদ্গমের পূর্ব্ব হইতেই ভোগ বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। ক্রমে ইন্দ্রিয় সতেজ

* "অধিকারীতু বিধিবদধীতে বেদবেদাঙ্গত্বেনা পাততো বিগতাখিল বেদার্থোস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্য নিষিদ্ধ বর্জ্জন পুরঃ সরং নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত নিখিল কল্মষতয়া নিতান্ত নির্ম্মল স্বান্তঃ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্নঃ প্রমাতা।" বেদান্তসার।

হইলে, সেই বাসনা আরও প্রাবল্য ধারণ করে। প্রবল ইন্দ্রিয়গ্রাম যাহার বশে নাই, অর্থাৎ শমদমরূপ অনুপম উজ্জ্বল রত্ন লাভ হইয়া উঠে নাই, সে নয়ন মুদ্রিত করিলে মানস পটে, অনুধ্যাত বিষয়ের মোহন ছবি দেখিতে পায়, রমনীয় ভাব উদিত হয়না। আবার যাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়াই সাধন সম্পত্তির অধিকারে বঞ্চিত, তাহারা যে কি করিয়া নির্গুণ, নির্লেপ, নিরঞ্জন মূর্ত্তির ধ্যান করে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ধারণা না হইলে ধ্যান হয় না। কাহার ধ্যান করিবে? যাহার মুর্ত্তি মানসক্ষেত্রে অঙ্কিত হইতে পারে, মনে যাহা ধরিতে পারিবে, তাহারই ধ্যান হইতে পারিবে, নচেৎ ভস্মে ঘৃতাহুতি ন্যায় তাবৎই বিফল। আর্য্যজাতির পরম পবিত্র মনন শাস্ত্র বেদান্ত ও পাতঞ্জলাদিতে ধ্যান, ধারণা সমাধি ও উপাসনার বিস্তর উপদেশ বিবৃত রহিয়াছে। প্রথম সবিকল্প বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সমাহিত হইলে, পরিণামে নির্ব্বিকল্প বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে। তখনই মুমুক্ষু, স্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক অতুল, অমেয়, ভুমানন্দ পান করিতে করিতে অমরতা লাভ করেন।

ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে, প্রলোভনে, ও স্বার্থ সাধনে, দল পুষ্টির প্রয়োজন হয়না। উপরে, যে সাধনের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই আবশ্যক করে, উহা যাহার সঞ্চয় হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী, অন্যথা নাম উচ্চারণ করিতে বাক্‌শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই শক্তি আছে। এখন ঐ সাধনচতুষ্টয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিয়া, প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্তদ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এবং উপাসনায় চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়, একাগ্রতা না হইলে কখনও পরমেশ্বরে মন সমর্পিত হইতে পারে না। সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানস ব্যাপাররূপ শাণ্ডিল্যঃ বিদ্যা প্রভৃতিকে উপাসনাবলে, এস্থলে মানসব্যাপার, মনের একাগ্রতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ব্রহ্মই নিত্য তদ্ভিন্ন যাবতীয় বস্তু অনিত্য এই প্রকার বিবেচনাকে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক বলে। বিষয়সুখ, যাহার নিকট নিত্য বলিয়া, অনুভূত হয়, সে কদাপি বিষয়সুখের আপাত মনোহর মোহজাল হইতে মুক্ত হইতে পারে না, বৈরাগ্য তাহার নিকট বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া থাকে। পদে পদে মমতা আসিয়া তাহাকে মুগ্ধ করে, অচিরস্থায়ী বিষয় বিনাশে, তাহার শোক উপস্থিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করে; তথাপি চেতনার সঞ্চার

হয় না, ক্ষণস্থায়ী বিষয় তাহার নিকট নিত্য বলিয়া, স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু নিত্যসুখ নিত্যপদার্থ পরব্রহ্মে বিরাজিত।

ইহ ও পরকালে ফলভোগ কামনায় বিরাগ আবশ্যক, যিনি ইহসংসারে যশ, চিত্ত, পুত্রকলত্রাদির কামনায় কোন কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার বন্ধন ভিন্ন মোচন নাই, এষণাত্রয় মনে জাগরূক থাকিলে ক্রমে গভীর বিষয়সুখ ও ভোগবাসনা মনোরাজ্যটি, সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া লয়, আবার পরকালের ফল, স্বর্গাদি সুখ বাসনায় যে কোন কার্য্য করা যায়, তদ্দ্বারা স্বর্গাদি সুখ-ভোগ হইয়া থাকে; ভোগান্তে পুনরাবৃত্তি ঘটে, সুতরাং বন্ধন থাকিয়া যায়, তাহারও মুক্তি হয় না; কর্ম্মাদি পরমেশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে, উহাকে নৈষ্কর্ম্ম বলে। সকামকর্ম্মে ফলভোগ করিতে হইবে; সুতরাং ইহকালে ও পরকালে ফলভোগাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি চাই।

শম দমাদি সাধনদ্বারা প্রবল ইন্দ্রিয়সকল বিষয় হইতে, প্রত্যাহৃত হইয়া বশ্যতা অবলম্বন করে। ইন্দ্রিয় যাহার বশে নাই, মন সতত ইতস্ততঃ ধাবমান, তাহার ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা কেবল মৌখিক আড়ম্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠে নাই। ঈশ্বর-বিষয়ক শ্রবণ, তদনুগুণ বিষয়ে নিগৃহীত মনের সমাধিকে, সমাধান বলে। গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। সুখ দুঃখাদি সহন ক্ষমতা প্রয়োজনীয়, সুখের জন্য ব্যাকুলতা, এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে অনুদ্বেগ আবশ্যক। সাত্বিক আহার বিহারে মন পবিত্র হয়। যে যেমন আহার করে তাহার মনের গতিও প্রায় তাদৃশ হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণোদ্রেককর দ্রব্য ব্যবহার, আলোচনা, সংসর্গ প্রভৃতি না হইলেও মনকে নিগৃহীত করা যায় না, প্রতি বিষয়েই ক্রমে পবিত্রতারক্ষা করিয়া, ইন্দ্রিয়ও মন যাহাতে পবিত্র হইয়া সংযত হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত; চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া চাই, কেবল মুখের কথায় কোন কাজ হয় না। মোক্ষের ইচ্ছা অন্তরে উত্তেজিত হইলে তাহার সিদ্ধি জন্য তদুপযোগী সাধন অভ্যাস করিতে স্বতই প্রয়াস জন্মে, যে, কোন বিষয়ের জন্য ব্যাকুল হয় তাহা প্রাপ্ত হইতে তাহার কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যথার্থ ব্যাকুলতা উপস্থিত হইলে ঈপ্সিত বিষয় প্রাপণ জন্য, অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে কেহ পরাঙ্মুখ হয় না। মোক্ষেচ্ছা বলবতী হইলে তাহার জন্য উপযুক্ত সাধন সকল সাধিতে হইবে, যে এরূপ সাধন সম্পন্ন হইয়াছে তিনিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকারী। সহজজ্ঞানে

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না, উপযুক্ত সাধন ও উপদেশ একান্ত প্রয়োজনীয়। এ সম্বন্ধে বেদাদিশাস্ত্র, অনাদিকাল হইতে পরিসেবিত হইয়া আসিতেছে কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিয়া স্বার্থানুরূপ নূতন পথে পাদবিক্ষেপ করিলে কথনও সুফল হইবে না, অনর্থক সময় ও আয়ুনাশ মাত্র। বৈরাগ্য, ভক্তি ও জ্ঞান চাই, সদালাপ, তত্বালোচনা ও সৎসঙ্গও একান্ত প্রার্থনীয়। অন্তরের সদ্গুণগুলি প্রবল হইলে রজঃ ও তমোভাব অভিভূত হইয়া, সত্বভাব প্রবলতর হইয়া থাকে, সত্বগুণে জীবকে ব্রহ্মজ্ঞানের পথিক করে, সুতরাং তিনিই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। অন্যথা স্বার্থ সাধনোদ্দেশে বিদ্বেষবহ্নি সন্ধুক্ষিত করিলে দেশের অনিষ্ট ভিন্ন আর কি হয়?

আলস্য।

প্রকৃতপক্ষে অলস কে? শিশু পাঠে অলস, কিন্তু ধাবন কুর্দ্দনাদিত নিতান্ত অনলস। যুবতী গৃহকার্য্যে অলস, কিন্তু বেশবিন্যাসে অনলস, সীমন্তে সিন্দুর (ওঁ বিষ্ণুঃ—ফোঁটা) পরিবার সময় কোন কোন যুবতী বিশ পঁচিশবার ফোঁটা মুছেন ও পুনরায় পরেন। ইহা কি অলসের পক্ষে সম্ভব? কিন্তু ঐ যুবতীই পান সাজিতেও আলস্য বোধ করেন। ন্যায়া-লঙ্কার মহাশয় তর্কে নিতান্ত অনলস। সাধারণ একটা বাজারের হিসাব করিতে বলুন দেখি; দেখিবেন, এ হিসাব করিতেও ন্যায়ালঙ্কার মহা-শয়ের আলস্য বোধ হয়। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান চপলাকান্ত নবেল পাঠে নিতান্ত অনলস; নূতন নবেল পাইলে বাবাজী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ত্রিকোণমিতির নাম শুনিলেই তাঁহার নয়নপল্লব নিদ্রাভরে নিমীলিত হইয়া আসে। আর সর্ব্বশেষে ইংরেজ মহাপ্রভুর কথা ধরুন; ইনি সাহারা মরু অতিক্রম করিয়া, মিসর জয় করিতেছেন এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা উত্তীর্ণ হইয়া, তিব্বতজয় করিতেছেন বা করিলেন বা করিবেন। কিন্তু ইংরাজকে একবার গির্জাঘরে বসাইয়া দিউন; দেখিবেন কখন বা উঁহার হাই উঠিতেছে, কখনবা গা ভাঙ্গিতেছে, কখন বা চক্ষু মুদিয়া আসিতেছে, কখন বা উঁহার নাসিকাধ্বনিতে ভজনালয় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কে অলস, কে অনলস?

ইহার উত্তরে এরূপ বলা যাইতে পারে, যে এক অর্থে, ইহারা সকলে অলস, ও অপরার্থে সকলেই অনলস। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে ইহাদের মধ্যে কাহার কাহার আলস্য নিন্দনীয়? এবং কি কারণেই বা ঐ ঐ আলস্যকে আপনি নিন্দনীয় বলেন। ভজনালয়ে ইংরাজের যে আলস্য, তাহাকে আপনি নিন্দা করিবেন কি না? যদি করেন ত কেন করিবেন? আপনি হয়ত বলিবেন, যে, যে আলস্যে পরিণামে অনিষ্ট হয়, সেই আলস্য নিন্দনীয়। বালক পাঠে অলস; ইহাতে তাহার ইষ্ট হইতে পারে, অনিষ্টও হইতে পারে। যুবতী বেশ-বিন্যাসে নিযুক্ত থাকিয়া, নিজ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে; হয়ত এই কারণে পৃথিবীতে সুন্দরী-সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া পরিণামে প্রভুত মঙ্গলের উৎপত্তি সাধন করিতে পারে। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের মনে, হয়ত সেক্ষপীয়রের ন্যায় কবিত্ব আছে; এবং নবেল পাঠদ্বারা হয়ত সে ঐ কবিত্বের বিকাশ করিতেছে। এবং যেভাবে ভজনালয়ে প্রার্থনা করা হয়, তাহা অনেক সময়ে না শুনাই ভাল। ঐ দেখুন ব্রহ্মদেশে ব্রহ্ম সন্তানগণ মাতৃ ভুমির উদ্ধারের জন্য পতঙ্গের ন্যায় বহ্নিমুখে প্রবেশ করিতেছে। আর ইংরাজ পাদ্রী ম্যাঞ্চেষ্টারে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছেন—"হে দয়াময়! মগ দস্যুদিগকে দলন কর।" পাদ্রী ভায়ার বোধ নাই যে যদিও নৃসিংহ অবতারে দস্যুদলন হইয়াছিল বটে, কিন্তু একালে আর হয় না। দয়াময় হরি দস্যুভয়ে পাতালে অনন্ত সর্পের ফণামধ্যে লুক্কাইত আছেন। দয়াময়-পাদ্রী মহাশয়ের প্রার্থনার সময়, যে নিদ্রা যায়, আমার বোধ হয় সেই ব্যক্তিই পুণ্যাত্মা। ফলতঃ আলস্যের ফলাফল ধরিয়া দোষগুণ বিচার করা বড় কঠিন; একরূপ অসম্ভব বলিলেও হয়।

তবে, আর এক উপায়ে আলস্যের দোষগুণ বিচার করা যাইতে পারে, কি কারণে আলস্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাযদি জানিতে পারা যায়, তাহা হইলেও আলস্য নিন্দনীয় কি না বুঝা যাইতে পারে। মনে করুন, শ্রমাধিক্যবশতঃ একরূপ আলস্য জন্মে; সে আলস্য নিন্দনীয় নহে। শ্রমরাহিত্যবশতঃ ও একরূপ আলস্য জন্মে; এ আলস্য অনেক স্থলেই নিন্দনীয়। পুত্রশোক বশতঃ একরূপ আলস্য জন্মে; এ আলস্যকে নিন্দা করা নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য। অনাহারে ও অপরিমিতাহারে, উভয়েই আলস্য জন্মে; এ উভয় প্রকার আলস্যই অনেক স্থলে নিন্দনীয়। আলস্যের সকল প্রকার কারণ উল্লেখ করা, বা ঐ সমস্ত কারণের দোষগুণ নির্দ্ধারণ করা একরূপ

অসম্ভব। আমি নিম্নে কেবল এক দিক হইতে আলস্যের কারণানুসন্ধান করিতেছি।

গুণের পার্থক্যানুসারে মনুষ্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তামসিক ব্যক্তি বৃক্ষলতাদির ন্যায় আহার বিন্মূত্র ত্যাগ, শয়ন, নিদ্রা তন্দ্রা প্রভৃতি শারিরীক ক্রিয়াতেই সর্ব্বদা ব্যাপৃত। বৃক্ষ যেরূপ যেখানকার সেখানেই থাকে, বায়ু সঞ্চালন ব্যতিরেকে যেরূপ বৃক্ষের গতিবিধি হয় না, সেইরূপ তামসিক ব্যক্তিগণ অন্যের সাহায্য, তাড়না ব্যতিরেকে গতিবিধি করিতে অক্ষম। নিগ্রোগন (কাফ্রি) এইরূপ তামসিক। বৃক্ষ যেমন কেবল আহার্য্য-সংগ্রহার্থে ইতস্ততঃ মূল অথবা শাখা প্রসারণ করে, এই নিগ্রোরাও সেইরূপ আহার্য্য সংগ্রহের জন্য কিয়ংকাল পরিশ্রম স্বীকার করে; তৎপরে আহারান্তে বৃক্ষ ও নিগ্রো একই ভাবে নিশ্চেষ্ট ও অলস। সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারে যাহাদের দেহ প্রধানতঃ পার্থিব ও রসাংশের আধিক্য ভাবে গঠিত তাহাদের মধ্যেই এইরূপে নিশ্চেষ্টতা লক্ষিত হয়।

পশুপক্ষীর সহিত রাজসিক ব্যক্তির উপমা দেওয়া যায়। পশুপক্ষী সর্ব্বদাই নিরলস; কিন্তু ইহাদের কার্য্যের কোন একটা স্থির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নাই। ঐ দেখুন সম্মুখে কপোত-শ্রেণী, ইহারা কত বার উর্দ্ধে উঠিতেছে, কতবার নিম্নে নাবিতেছে। কিন্তু কি জন্য? খাদ্যানুসন্ধান, পুত্রোৎপাদন প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় ভিন্ন, ইহাদের কোন লক্ষ্য নাই। অথচ ইহারা সর্ব্বদা অস্থির। অনেক মনুষ্য ও ঐরূপ লক্ষহীন অথচ ঐরূপ নিরলস। সর্ব্বপ্রকার সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিয়া মনুষ্য অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন, সমস্ত জীবনের মধ্যে সে একবার আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করে না যে সে কি জন্য এই ভুতের বেগার খাটিতেছে। অথচ সে অহোরাত্র অনলস। সংস্কৃত শাস্ত্র অনুসারে ইহাদের শরীরে তৈজস ও বায়বীয় অংশেই অধিক ভাবে গঠিত।

যাহারা সাত্ত্বিক তাঁহারাও অনলস, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের কি উদ্দেশ্য তাহা বুঝিয়াছেন। কিসে অমরত্ব লাভ করা যায়, কিসে প্রকৃত সুখের অধিকারী হওয়া যায়, তাহা তাহারা বুঝিয়াছেন। এজন্য সেই উদ্দেশ্যেরপ্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ইহারা অহোরাত্র কার্য্য করিতেছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারে ইহাদের শরীরে আকাশের পরিমাণ অধিক।

আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ঐ যে কাষ্ঠ খণ্ড সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে উহা তামসিক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত স্থল। ক্রিয়ার শক্তি আছে, ক্ষেত্র আছে, কিন্তু ক্রিয়া নাই। ঐ যে ধূমিত কাষ্ঠখণ্ড, যাহা হইতে অনবরত ধূমোদ্গার হইতেছে, উহা রাজসিক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত স্থল। উহাতে ক্রিয়া হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ ক্রিয়া বড় অস্পষ্ট। ঐ ধূমের অন্ধকারতায় আলোকান্বিত স্থলও তমসাবৃত হইতেছে। তাহার পর ঐ যে জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড যাহা হইতে নির্মল আভান্বিত অগ্নিশিখা নির্গত, উহাই সাত্ত্বিকতার দৃষ্টান্ত, উহার ক্রিয়া কেমন সুস্পষ্ট, কেমন পরিষ্কার। ধূমোদ্গার দ্বারা প্রকৃত রন্ধনের কিছুই সাহায্য হইতেছিল না, কেবল কতকটা গোলযোগ হইতেছিল মাত্র। যেই কাষ্ঠ জলিয়া উটিল, আর গোল যোগ নাই। ধীরে ধীরে রন্ধনকার্য্য কেমন সুসম্পন্ন হইতেছে। আমাদের দেশের ভট্টাচার্য্যেরা ইংরাজদিগকে রাজসিক বলেন। কেননা ইহাঁদের কার্য্যের কোন একটা স্থির লক্ষ্য নাই। ভারত-শাসনের এক অংশ আসাম কলঙ্কে পরিপূর্ণ। অন্য অংশ আত্ম-শাসন, স্বাধীন মুদ্রা মাত্র, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি সদলঙ্কারে বিভূষিত। ম্যাথিউ আরনল্ড সাহেব বলেন, যে ইংরাজের কার্য্যে—স্পষ্টতা (লুসিডিটি) নাই। যেখানে স্পষ্টতার অভাব, সেখানেই সাত্ত্বিকতারও অভাব বুঝিতে হইবে।

এই যে তিন প্রকারের লোকের কথা পূর্ব্বে বলা হইল, ইহার মধ্যে নিকৃষ্ট, উৎকৃষ্টের পদবীতে আরোহণ করার সময় অত্যন্ত আলস্য প্রকাশ করে। তামসিক নিগ্রো, রাজসিক ইংরাজের অনুকরণ করিতে নিতান্তই অলস। কোনরূপে উদর পূরণ হইলেই নিগ্রো বৃক্ষ লতাদির ন্যায় অলসভাবে পড়িয়া থাকে। ইংরাজের ন্যায় ধন মান যশঃ প্রভৃতি অর্জ্জন করিতে ইহারা নিতান্তই অনিচ্ছুক ও অলস। এবং আজি দুই হাজার বৎসর হইল খৃষ্ট কিয়ৎপরিমাণে সাত্ত্বিকতার ভাব রাজসিক ইয়ুরোপ প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজসিক ইয়ুরোপ সাত্ত্বিকগুণ অর্জ্জনে নিতান্তই অলস। আবার অন্যদিকে উৎকৃষ্ট, অক্লেশেই নিকৃষ্টের পদবীতে অবরোহণ করিতে পারে। দেখুন সাত্ত্বিক হিন্দু কত সহজে রাজসিক ইংরাজের গুণ সমস্ত অথবা দোষ সমস্ত শিক্ষা করিয়াছেন। কটন সাহেব একবার বলিয়াছিলেন যে, অনেক হিন্দুর গতিমতি ইংরেজ অপেক্ষাও ইংরাজী ধরনের। ইহাতে কিছুমাত্র বিস্ময়ের কথা নাই। কারণ যে প্রথম শ্রেণীতে ছিল, সে যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নাবিয়া আসিয়া সুযশঃ লাভ করিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি?

এইরূপে যে রাজসিক সে অক্লেশেই তামসিকের শ্রেণীতে আসিতে পারে। তাহাতে তাহার আলস্য হয় না, বরং আমোদ হয়। দেখুন কাষ্ঠ খণ্ড জ্বালিতে কত কষ্ট, কিন্তু জ্বলন্ত কাষ্ঠ খণ্ডে একটু বারি-নিক্ষেপ করিলেই ধূমোদ্গার আরম্ভ হয়, এবং তৎপরে কিয়ৎক্ষণের মধ্যে ধূমোদ্গারের নিবৃত্তি হইলেই কাষ্ঠ খণ্ড তাহার পূর্ব্ব আকার ধারণ করে।

তবেই এক্ষণে আমরা দেখিলাম, যে তামসিক ব্যক্তি রাজসিক গুণ উপার্জ্জনে স্বভাবতঃই অলস হয়। এবং রাজসিক ব্যক্তি সাত্ত্বিক গুণ উপার্জ্জনে অলস হয়। অতএব সৎকার্য্য সম্বন্ধে যে আলস্য তাহা সর্ব্বদাই নিকৃষ্টতার পরিচায়ক। অজগর সর্পের ন্যায় তাকিয়া ঠেস দিয়া গুড়ুক খাওয়া নবাবীর চিহ্ন, উহা তমোগুণের চিহ্ন, সাত্ত্বিক হিন্দু সন্তানের পক্ষে বড়ই কলঙ্কের কথা। কেননা উহা দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে হিন্দুসন্তান পূর্ব্ব উপার্জ্জিতসাত্ত্বিক গুণাবলী হারাইয়া এক্ষণে একেবারে তামসিকের শ্রেণীতে গিয়া পড়িয়াছে। যিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম, সৎকথা, সদনুষ্ঠান, পরোপকার, ভক্তি, বিনয়, মাধুর্য্য প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া পশু পক্ষীর ন্যায় বিনা উদ্দেশ্যে কেবল রাশি রাশি স্বর্ণ সঞ্চয় করিতেছেন, তাঁহার জানা উচিত যে তিনি হিন্দু সন্তানের সাত্ত্বিক পদবী হইতে অধঃপতিত হইতেছেন। যদি নিগ্রোরা ইংরাজের ন্যায় বিষয় লোভী হয়, তাহা হইলে, তাহা তাহাদের পক্ষে উন্নতি, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে মণিমাণিক্যে বিভূষিত, সে যদি পয়সার জন্য লালায়িত হয় তাহা হইলে, তাহা তাহার পক্ষে অবনতি সন্দেহ নাই। যাহারা তামসিক তাহারা রাজসিকের চাকচিক্যে বিলুব্ধ হয়, হউক। কিন্তু তুমি সাত্ত্বিক হিন্দুর সন্তান তুমি কি বলিয়া হীরক-মুকুট ত্যাগ করিয়া ধুচুনী মাথায় দিতেছ বুঝিতে পারি না।

আর একটী কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। ধর্ম্মালোচনা অথবা ধর্ম্মানুষ্ঠান অলসের কর্ম্ম নহে। ধন মান উপার্জ্জনে যেরূপ পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা শতগুণে পরিশ্রমী না হইলে, ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় না। যাহারা সভ্যতার পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছে অর্থাৎ ভীল কুকি প্রভৃতি ভিন্ন প্রায় পৃথিবীর সকল জাতিই ধনমান লাভের জন্য শ্রম স্বীকার করিতে পারে। পশু পক্ষীতেও যে পারে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কিন্তু সাত্ত্বিক শ্রম স্বীকার এক হিন্দুস্থান ব্যতীত আর কোথাও বড় দেখিতে পাই না।

হে হিন্দু সন্তানগণ। তোমরা সাত্ত্বিকপদে পদে তাহার সহস্র সহস্র প্রমাণ পাইবে। এই চিরন্তন সাত্ত্বিকতা ছাড়িয়া রাজসিক হইও না। আর এই যে আমাদের দেশে এক আলস্যের তরঙ্গ উঠিয়াছে, ইহাও অত্যন্ত ভয়াবহ। যাহারা ধর্ম্মের জন্য বিষয় লালসা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা সর্ব্বতো ভাবে প্রশংসনীয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে একদল লোক আছেন, যাহারা না সাত্ত্বিক না রাজসিক! দেশের হিত সম্বন্ধে কথা উঠিলে তাঁহারা ভারত উদ্ধারক বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়াদেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা উঠিলে, ইহারা বলেন ব্রাহ্ম। ইহারা চান যে অষ্টপ্রহর বালিসে ঠেসান দিয়া গুড়ুক ফুঁকিতে পারিলেই মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা হয়। কিন্তু ইহাদের জানা উচিত, যে ইহারা তামসিক, ইহাদের অপেক্ষা রাজসিকেরা অনেক ভাল। যে জমীদার নাম লইবার জন্য স্কুল সংস্থাপন করে সে নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যে দিন রাত্রি কুৎসিত বিলাসে নিমগ্ন আরো নিন্দনীয়। যে, ভারত উদ্ধার বলিয়া কেবল বালোচিত চীৎকার করিতেছে সে নিন্দনীয়। কিন্তু যে ভারত উদ্ধারও করে না, এবং নিজের আত্মারও উর্দ্ধার করে না, সে আরো নিন্দনীয়। আমাদের মধ্যে তামসিকতার বৃদ্ধি দেখিয়া বড়ই শঙ্কিত হইতে হয়। প্রথমে রোজ তিনবার করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক ছিল। ক্রমে তাহার স্থলে কেবল দুইবার হইল, পরে কেবল একবার হইল। তাহার পরে সপ্তাহান্তে একবার দুই ঘণ্টা বা তিন ঘণ্টা কাল মাত্র ঈশ্বর পূজার জন্য রক্ষিত হইল। তাহারও আবার বার আনা সময় গানে কীর্ত্তনে, হাত তালিতে কাটিয়া যায়। এক্ষণে আবার অনেকের তাহাতেও কষ্টবোধ হয়। তাঁহারা একবার ভজনালয়ে পদার্পন করিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। শাস্ত্রসম্বন্ধেও এই কথা। গোটা কতক মোটামোটী কথা শিখে রাখ; তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল; মিছে কিচিকিচি খিচিমিচির দরকার কি? মহাশয় যদি কিচি কিচি ছাড়িয়া অন্য একটা কিছু সৎকার্য্য করেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু যদি কিচি মিচি ছাড়িয়া কেবল গা ভাঙ্গেন ও হাই তুলেন, তাহা হইলে আপনি নিজেরও সমাজের নিকট ঘোরতর অপরাধে অপরাধী। আপনি যদি সিংহ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া গ্রাম্যসিংহের ন্যায় ব্যবহার করেন তাহা হইলে উহা লজ্জা ও কলঙ্কের কথা, প্রশংসার কথা নহে। নির্জ্জন স্থান অপেক্ষা ধুমিত কাষ্ঠখণ্ড বরং ভাল।

উন্নতি ও অবনতির অর্থ।

শিষ্য।—মহাশয়! আমার নিমিত্ত অনেকটা প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু আমার পূর্ব্বোক্ত সন্দেহের নিরাকরণেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী, এজন্য আবারও জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আপনার অনুগ্রহে অন্তঃসার বা আন্তরিক অস্তিত্বের স্বরূপ, তাহার স্বগত লক্ষণ, এবং বাহ্য লক্ষণাদি বেশ বুঝিতে পারিলাম এবং, অন্যান্য সম্প্রদায়ের উন্নতি অবনতিও অবগত হইয়াছি; কিন্তু জানিতে ইচ্ছা এই যে, যে অন্তঃসারের পরিপুষ্টি বা শ্রীবৃদ্ধিকে উন্নতি বলিয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা কি বাস্তবিক যুক্তিসঙ্গত, না একটা কথার কথা মাত্র, অর্থাৎ উন্নতি শব্দের যে প্রকৃত অর্থ তাহার সহিত উহার কি কোন সম্বন্ধ আছে, (ক)না আজকালকার প্রচলিত, পণ্ডিত, তর্কচুড়ামণি, এবং রাজা মহা-

---

(ক) পণ্ডিত প্রভৃতি কথা গুলি সংস্কৃত, এজন্য সংস্কৃত ভাষাতে উহাদিগকে যে ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই ঐ সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে, অতএব সেই অর্থের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে এই ভাবে যদি ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করা হয়, তবেই তাহাকে প্রলাপবাক্য বলিতে হয়। পণ্ডিত শব্দের অর্থ এই,—"তর্ক সাহিত্য বেদান্ত বেদ বেদাঙ্গ গামিনী, পণ্ডাবুদ্ধিরিতি খ্যাতা তদ্যোগাৎ পাণ্ডিতঃ স্মৃতঃ" দর্শন সাহিত্য বেদ, বেদাঙ্গ, ও বেদান্ত বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান হইলে তাহাকে "পণ্ডাবুদ্ধি" বলে এবং যিনি এই পণ্ডাবুদ্ধি বিশিষ্ট তাঁহাকে পণ্ডিত বলা যায়"। মহাভারত গ্রন্থে আবার কেবল শাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞানবান্‌কেও পণ্ডিত বলেন নাই, তাহাতে এইরূপ আছে যে।

আত্মজ্ঞানং সমারম্ভ্যস্তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা
নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।
অনাস্তিক শ্রদ্দধান এতৎ পণ্ডিত লক্ষণং॥

যাহার আত্মজ্ঞান আছে, অর্থাৎ এই দেহ, মন, বুদ্ধি, অভিমানাদি জড় পদার্থকে যাহারা আত্মা বলিয়া অভিমান করেন না, পরন্তু এতৎ সমস্ত জড় পদার্থের অতীত নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব চিৎস্বরূপ পদার্থকে যিনি আত্মা বলিয়া অনুভব করিতে পারেন, যিনি সাধু অধ্যবসায়বান, যাহার তিতিক্ষা অর্থাৎ শীতউষ্ণাদি দুঃখ-সহিষ্ণুতা আছে, যাহার চিত্ত সর্ব্বদা

রাজা প্রভৃতি সংজ্ঞার ন্যায়, উহাও একটা অর্থশূন্য প্রলাপোক্তি মাত্র, তাহা বুঝাইয়া দিন, আর অন্যান্য সংপ্রদায়ের অভিমত উন্নতি অবনতিই বা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহাও জানিতে ইচ্ছা।

আচার্য্য।—উন্নতি ও অবনতি শব্দের প্রকৃত অর্থ চিন্তা করিয়া দেখিলে, অন্তঃসার বা আন্তরিক আস্তিত্বের শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টিকেই মানুষের উন্নতি, আর তাহার বিপরীত অবস্থাকে অবনতি সংজ্ঞায় অভিহিত করা উচিত

ধর্ম্মপ্রবণ, যিনি বাহিরেও প্রশস্ত, অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যাহার দ্বারা নিন্দিত কার্য্য কখনই হইতে পারে না, যিনি নাস্তিক নহেন বেদাদি শাস্ত্রের যাবতীয় আদেশ অবনত মস্তকে পালন করেন, যিনি ঈশ্বরে শ্রদ্ধাবান, পণ্ডিত শব্দে তাঁহাকে বুঝায়।

ক্রোধো হর্ষশ্চ দর্পশ্চ হ্রস্তম্ভো মান্যমানিতা
যমর্থান্নপকর্ষন্তিস বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥

ক্রোধ, হর্ষ, দর্প, লজ্জা, স্তম্ভনশক্তি, মান, অপমানাদি প্রবৃত্তি সকল যাহাকে সত্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে না, পণ্ডিত শব্দে তাঁহাকে বুঝায়।

যস্যকৃত্যং ন জানন্তি মন্ত্রং বা মন্ত্রিতং পরে।
কৃতমেবাস্য জানন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে।

যাঁহার মনের সংকল্প ও সংকল্প সাধনের মন্ত্রণা প্রথমে কেহ জানিতে পারে না, অর্থাৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হইলে পর তাহা লোক সমাজে স্বতঃ প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে পণ্ডিত কহে।

যস্য কৃতং ন বিঘ্নন্তি শীতমুষ্ণং ভয়ং রতিঃ।
সমৃদ্ধিরসমৃদ্ধির্ব্বা স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে।

শীতের প্রবলতাই হউক বা প্রচণ্ড উত্তাপই বৃদ্ধি হউক, লোকে ভয় প্রদর্শনই করুক বা কোন প্রলোভনই সম্মুখে উপস্থিত হউক, অধিক বিভবেই হউক, বা কোন দুর্ব্বিপত্তি আসিয়াই পড়ুক, কিছুতেই যাহার শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠেয় কার্য্যসম্পাদনে বাধা জন্মাইতে পারে না, তিনি পণ্ডিত পদ বাচ্য।

যস্য সংসারিনী প্রজ্ঞা ধর্ম্মার্থাবনুবর্ত্ততে।
কামাদর্থং বৃণীতে যঃ সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥

যাঁহার সাংসারিক বুদ্ধি ধর্ম্মের সহিত অর্থানুগামিনী হয়, অর্থাৎ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ানুগামিনী হয় না, সাধু কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত যিনি বিষয়ের সংগ্রহ করেন, পণ্ডিত শব্দে তাঁহাকে বুঝায়।

বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং এস্থানে উহা প্রলাপবাক্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

শিষ্য।—উন্নতি ও অবনতি কথার প্রকৃত অর্থ কি?

আচার্য্য। ইহার অর্থ অতি সহজ, উহা নির্ণয়ের নিমিত্ত কোষাদি শাস্ত্রের সহায়তা অপেক্ষা করেনা।—উন্নতি আর অবনতি এই কথা দুটি যে পরস্পর বিপরীত অর্থের প্রকাশক, তাহা সকলেই অবগত আছেন; অতএব উন্নতির অর্থ নির্ণীত হইলেই—অবনতির অর্থ নির্ণীত হইতে পারে, আবার অবনতির অর্থ নির্ণীত হইলেও উন্নতির অর্থ স্থির করা হয়। কেহ

যথা শক্তি চিকীর্ষন্তি যথাশক্তি চ কুর্ব্বতে।
ন কিঞ্চিদবমন্যন্তে নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥

যতটুকু সাধ্যায়ত্ত, অর্থাৎ আপন শক্তি দ্বারা যতটুকু নির্ব্বাহ হইতে পারে, সেইটুকু পরিমাণ কার্য্য করিতে যিনি ইচ্ছা করেন, এবং নিজক্ষমতানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য অন্য অন্য লোকের কার্য্য অপেক্ষা নীচ হইলেও তুচ্ছ করেন না, এরূপ মহাত্মাগণ পণ্ডিতবুদ্ধিসম্পন্ন

ক্ষিপ্রং বিজানীতি চিরং শৃণোতি বিজ্ঞায়চার্থং ভজতে ন কামাৎ
নশং পৃষ্ঠাব্যুপযুঙ্‌ক্তে পরার্থং তৎ প্রজ্ঞানম্‌ প্রথমম্‌পণ্ডিতস্য॥

যিনি যে কোন বিষয়েই হইক, শ্রবনমাত্রই বুঝিতে পারেন, অথচ তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত শ্রবণ করেন, অর্থাৎ বুঝিয়াছেন বলিয়া সমস্ত বিষয়টী শুনিতে ক্ষান্ত হন না, যিনি বিশেষ মর্ম্ম অবগত হইয়া তবে কোনরূপ বিষয়ের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু লোভবশবর্ত্তী হইয়া নহে, অনুরুদ্ধ না হইয়া যিনি পরবিষয়ে হস্তার্পণ করেন না, (অর্থাৎ স্বভাব দোষে বা খোষামোদের জন্য নহে) তিনি পাণ্ডিত্যের প্রথম অবস্থার জ্ঞানসম্পন্ন।

নাপ্রাপ্যাভিবাঞ্ছন্তি সনেচ্ছন্তি শোচিতুম্
আপৎসু ন বিমুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥

যাঁহারা পণ্ডিত বুদ্ধি, তাঁহারা যে বস্তু পাইবার সম্ভবে নাই তাহার কামনা করেন না, বিনষ্ট বিষয়ের জন্য ও অনুতপ্ত হন না, এবং ঘোর আপৎ কাল উপস্থিত হইলেও স্খলিতপ্রজ্ঞ হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে বিমোহিত হন না

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেও, অবনত বলে ; অবার অবনতি কথার পরিবর্ত্তে অধোন্নতি কথাও ব্যবহৃত হয়, অতএব নীচের দিকে নামিয়া পড়াই অবনতি শব্দের অর্থ, আর তাহার বিপরীত অর্থাৎ উপরের দিকে উঠাই উন্নতি কথার অর্থ, অত্যুচ্চ বৃক্ষাদিতে সর্ব্বদাই উন্নতি কথায় ব্যাবহার হয়।

শিষ্য।—কথিত বিষয়ে এই অর্থ কিরূপে সম্পন্ন হয় তাহা বুঝাইয়া দিন।

আচার্য্য।—পূর্ব্বোক্ত বিবেকশক্তি আর পূর্ব্বোক্ত ধৃতিশক্তি, ক্ষমাশক্তি, দমশক্তি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহেয়শক্তি, ধীশক্তির, আত্মানুভূতির

নিশ্চিত্য যঃ প্রক্রমতে নান্তর্ব্বসতি কর্ম্মণঃ
অবন্ধ্য কালবশ্যাত্মাসবৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥

যিনি পরিণাম ফলের সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করিয়া কার্য্যের সূত্রপাত করেন এবং অসম্পূর্ণাবস্থায় কার্য্য পরিত্যাগ না করিয়া যিনি বৃথা সময় নষ্ট করেন না নিজ মনকে আপনার আয়ত্তাধীনে রাখিতে সমর্থ, তাঁহাকেই পণ্ডিত কহা যায়।

আর্য্য কর্ম্মণি রঞ্জন্তে ভূতি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতে।
হিতঞ্চ নাভ্য স্যুয়ন্তি পণ্ডিতা ভরতর্ষভ! ॥

যাঁহারা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কার্য্যানুসারে অনুরক্ত ঐশ্বর্য্য (শাস্ত্রোক্ত ষড়ৈশ্বর্য্য), বা প্রতাপ বর্দ্ধনে তৎপর, এবং পরহিত দর্শনে অসূয়া প্রকাশ না করেন, তাঁহারাই পণ্ডিত।

নহৃষ্যাত্যাত্মসম্মানে নাবমানেন তপ্যতে।
গঙ্গোদকমিবাক্ষুভ্যো যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে ॥

যিনি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াও প্রসন্ন হয়েন না, অর্থাৎ আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন না, ও অবমানিত হইয়াও খেদ বোদ করেন না, সর্ব্বদা গঙ্গা-কুণ্ডের ন্যায় নিশ্চল ও অক্ষুব্ধ থাকেন, তিনিই পণ্ডিত।

তত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতানাং যোগজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মাণাং।
উপায়জ্ঞো মনুষ্যাণাং নরঃ পণ্ডিত উচ্যতে ॥

যিনি জ্ঞান বিজ্ঞানাদি দ্বারা ভূত মাত্রেরই সমস্ত তত্ত্ব বিদিত আছেন, যিনি সকল কার্য্য কারণ ঘটনারই সম্ভাবনা সমন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, মনুষ্য জীবনের চেষ্টিত উপায় সকল অবগত আছেন, তিনিই পণ্ডিত বলিয়া উক্ত হন।

ক্ষমতা, ভক্তি, সরলতা, ও ঔদাসীন্য প্রভৃতি শক্তি গুলি বিকাসিত হইয়া ক্রমে পূর্ণ মাত্রার সঞ্চিত হইলে, ঐ সকল শক্তির সমষ্টী লইয়া যখন দেহের মধ্যে একটা জ্বলন্ত অস্তিত্বের প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন যে যে শক্তিগুলি দেহের পরিচালক, পরিপোষক এবং দেহের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে আবদ্ধ, সেই রাজসিক আর তামসিক শক্তিগুলি মাত্রেই অতিশয় দুর্ব্বল ও

প্রবৃত্তবাক্ চিত্রকথ উহাবান্ প্রতিভানবান্।
আশু গ্রন্থার্থবক্তাচ যঃ সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥

যিনি বক্তৃতা করিতে সমর্থ, যাঁহার কথন প্রণালী বিচিত্র, যিনি তর্কোত্থাপনে সমর্থ, আবশ্যক সময়ে যাঁহার বুদ্ধি শীঘ্র সচেতন হয়, গ্রন্থ দেখিবা মাত্র যিনি তাহার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত বলিয়া গণ্য।

শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্য প্রজ্ঞাচৈব শ্রুতানুগা।
অসম্ভিন্নার্য্যমর্য্যাদঃ পণ্ডিতখ্যাং লভেতসঃ ॥

বেদ শাস্ত্র যাঁহার বুদ্ধির অনুকূল, এবং যাঁহার বুদ্ধি শ্রুতির অনুগামিনী এবং যিনি সর্ব্বদা আর্য্য মর্য্যাদা রক্ষা অর্থাৎ আর্য্যদের অনুষ্ঠেয় কার্য্য সকল সম্পাদন করেন, তিনিই পণ্ডিত উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

অর্থং মহান্তমাসাদ্য বিদ্যামৈশ্বর্য্যমেববা।
বিচরত্যসমুন্নদ্ধো যঃ সঃ পণ্ডিত উচ্যতে ॥

বিপুল বিভব, বিদ্যা ও প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়া ও যিনি বিনম্র ভাবে বিচরণ করেন তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত পদবাচ্য।

এখন ভাবিয়া দেখুন আজ কাল যাঁহাদের উপরে এই "পণ্ডিত" কথাটি ব্যবহৃত হয় তাহাতে উহা প্রলাপ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে কি না। অসংলগ্ন, অনর্থক ও অযথা উক্তিকেই প্রলাপবাক্য বলে। গোকে মনুষ্য বলা, মনুষ্যকে হস্তী বলা, বৃক্ষকে ভূত বলা ইত্যাদি স্থলই প্রলাপবাক্যের উদাহরণ। অতএব যাঁহারা কেবল ব্যাকরণ, কেবল ন্যায়, কেবল স্মৃতি বা কেবল বেদান্তাদি অধ্যয়ন অধ্যাপন করিতেছেন, কিন্তু অবশিষ্ট শাস্ত্র রাশির নামও হয়ত অবগত নহেন এমন ব্যাক্তিকে পণ্ডিত শব্দে সম্বোধন করিলে উহা প্রলাপবাক্য হয় না কি? অথবা, নাহয়, কদাচিৎ কেহ বহুতর শাস্ত্রদর্শীই হইলেন, কিন্তু পণ্ডিতের অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ গুলিন আছে এমন ধারা লোক কি কেহ এপর্য্যন্ত দেখিতেছেন? আমরা কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে

নির্ব্বির্য্য হইয়া যায়। অর্থাৎ পরিচালনশক্তি এবং পরিচালকশক্তির বিকাশ দর্শনশক্তি, স্পর্শনশক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি, আর গ্রহণশক্তি, গমন শক্তি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়শক্তি নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, এবং পোষণশক্তি আর পোষণশক্তি হইতে সমুৎপন্ন, পাকস্থলী ও ফুসফুসাদি ক্রিয়ানির্ব্বাহক প্রাণাদিশক্তি অত্যন্ত মৃদুতা প্রাপ্ত হয়, উহার জল নিঃশেষিত হইলে যেমন ঝর্ণার জল সেই পূর্ব্ব

দেখিতে পাই না, প্রত্যুত উহার বিপরীত ও বিরুদ্ধ লক্ষণই সর্ব্বদা দেখি, অতএব বহুশাস্ত্রদর্শীকেও পণ্ডিত বলিলে প্রলাপোক্তি হয়।

তবে যদি, যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লইয়া, কুশগুচ্ছকে বৃক্ষ বলার ন্যায় ইহাঁদিগকে পণ্ডিত বলা যায়, এবং পাঠশালার গুরুমশাই প্রভৃতিকেও যে "পণ্ডিত শব্দে আহ্বান করা হয় তাহাকে প্রলাপ ব্যতিত কি বলা যায়?।

তৎপর "তর্কচুড়ামণি"। তর্ক শব্দে সচরাচর সমস্ত দর্শন শাস্ত্রই বুঝায়, আর যিনি সেই সমস্ত দর্শন বিষয়ে চূড়ামণি সদৃশ অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষায় উচ্চ, তিনিই তর্কচুড়ামণি; অতএব ভগবান শঙ্করাচার্য্যও এই পদবী গ্রহণের উপযুক্ত কিনা, সন্দেহ; সুতরাং এই মহোচ্চ উপাধিটি "যাঁহার" কিম্বা যাহাঁদের উপর চাপান হয়, তাহাতে উহা প্রলাপবাক্য মধ্যে গণ্য হইতে পারে নাকি? কিন্তু তথাপি কেবল তর্কচুড়ামণি বলিয়াই ক্ষান্ত নাই, তাহার পৃষ্ঠে আবার "পণ্ডিত" কথাটি ও জোড়া দেওয়া থাকে, জন্মান্ধকে কেবল পদ্মলোচন বলিয়া ও সন্তুষ্ট নহেন, সুতরাং "সিংহদৃষ্টি বিশেষণটি ও তাহারই উপর বিন্যস্ত হইল। বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যানিধি প্রভৃতি কথা গুলিও যে যে পাত্রে নিক্ষিপ্ত করা হয়, তাহাতে উহা প্রলাপবাক্য ব্যতিত আর কিছুই বুঝাইতে পারে না।

এখন মহারাজার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। রাজা মহারাজা প্রভৃতি কথাগুলি কেবল ঋগ্বেদের কথা নহে, ভাষাতেও উহার বিশেষ প্রচলন আছে; সুতরাং সকলেই উহার অর্থ বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত আছেন। যে ব্যক্তির, ভূমির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকে, প্রজাবর্গের উপরও যাহার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব ও দণ্ডবিধান ক্ষমতা থাকে, যিনি ইচ্ছাধীন প্রকৃতিবর্গের বিচার করিতে পারেন, দুর্গ এবং শত সহস্র সৈন্য সামন্ত দ্বারা যিনি আপন রাজ্যের রক্ষা এবং পর রাজ্যের আক্রমণাদি করিয়া থাকেন, এবং যিনি যুদ্ধবিদ্যা-বিসারদ, ইত্যাদি লক্ষণযুক্তব্যক্তি তিনি 'রাজা' শব্দের বাচ্য, ইহাও সকলেই জানেন। এবং এইরূপ

খাতের দ্বারাই অত্যল্প পরিমাণ অথচ অতি ধীরে ধীরে বহিতে থাকে সেইরূপ উক্ত শক্তি গুলিও মস্তীষ্ক বাসী আত্মা হইতে প্রকাশিত হইয়া স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা অতি ধীরে ধীরে মৃদুভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে।

কারণ এই সকল শক্তিগুলি রজ আর তমোগুণ হইতে বিকসিত, এবং অন্তঃসারের অন্তর্গত শক্তিগুলি সত্ত্বগুণ হইতে বিকসিত, ইহারা সকলেই

বহু সংখ্যক রাজগণের উপরও যিনি অনেকাংশে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন তিনি "মহারাজা", যেমন শ্রীমতী মহারানী-ভিক্টোরিয়া, ইহাও অনেকেই জানে। কিন্তু আমরা অনেক স্থানে যে যে পাত্রের শিরে এই রাজা মহারাজা প্রভৃতি শব্দগুলি চাপাইয়া থাকি, তাহাদের সহিত ঐ সকল অর্থের কোন প্রকার সংস্রব আছে কি? মনে করিয়া দেখ, যখন কোন প্রজা একবন্ধ ভূমি বার বৎসর ভোগ করিতে পারিলেই (৮ আইন অনুসারে) সেই ভূমিতে তাহার চিরস্থায়ী স্বত্ত্ব হইয়া গেল, আর তোমার (ভূম্যধিকারীর) ভূমির নিকট যাওয়ার ক্ষমতা নাই, আর যদি কোন প্রকারে ১২ বৎসরের অধিক ভোগ করিতে পারে তবেতো কোন কথাটিই নাই। তদ্ব্যতীত প্রজার অনিচ্ছা থাকিলে তুমি যথেচ্ছাক্রমে কোন ভূমির কর বৃদ্ধি করিতে পারিবে না। কালেক্টার সাহেব যাহা বলিয়া দেন তাহাই তোমাকে সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রজার অধিকৃত কোন ভূমিতে যদি তুমি বলক্রমে যাও তবে অনধিকার প্রবেশের দাবী হইতে হইবে। এই তোমার ভূমির উপরে আধিপত্য!! (অথচ তুমি মহারাজা!!!)

তৎপরে প্রজার উপরে আধিপত্যও কম নহে, কর বাকী থাকিলে অতি ধীরে ধীরে বিনয় ভরে প্রজার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহাতে যদি না হয় তবে কালেক্টর বা মুনসেফের নিকট অভিযোগ করিতে হইবে, তাহাতেও আবার ৩ বৎসর অতীত হইলে আর বাক্য ব্যয়ের জো নাই। কখনও কোন কারণেও প্রজাকে ডাকিতে পারিবে না, অনভিপ্রায়ে তাহার বাড়ী যাইতে পারিবে না, যদি তাহাকে অসম্ভ্রম সূচক কোন বাক্য বল, অর্থাৎ 'তুমির' স্থানে 'তুই' 'আপনির' স্থানে 'তুমি' বলা হয়, কিম্বা হস্ত পদ উত্তোলনাদি অন্য কোন অপমান জনক বা দুঃখজনক কার্য্যকর, তবে রাজদ্বারে মিথ্যা প্রমাণাদি না দিতে পারিলে, তোমাকেও কৌপীনধারী হইয়া ইষ্টক চূর্ণ করিতে হইবে। আর যদি এমত কোন তৃতীয়দরিদ্রব্যক্তিও ঐরূপ কদাচারণ করে, তাহাকেও ঐ সাজে ঐ বেশে ঐরূপ কার্য্য করিতে হয়।

পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া একত্রে সমাবেশিত হয় না। সত্ব শক্তি বা সত্বশক্তি জনিত বিবেকাদি শক্তির শ্রীবৃদ্ধি হইলেই রজ আর তমঃশক্তি জনিত সমস্ত শক্তিরই ক্ষীণতা হয়, আবার ইহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইলেও সত্ব শক্তির ক্ষীণতা হয় ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। এবিষয় ধর্ম্মব্যাখ্যাতেই অতি বিস্তারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অতএব এখন কেবল কএকটি দৃষ্টান্তমাত্রই উপস্থিত করিব। ক্রমশঃ।

প্রজার নিকট তুমিও যেমন, অন্য ব্যক্তিও তেমন, ইহাতে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই; তবে যদি তুমি রাজার অলক্ষিত ভাবে কিম্বা পুলিষ প্রভৃতিকে ঘুষ ঘাস দিয়া, গোপনে গোপনে কাহারও উপর দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, তাহাকেই তোমার প্রভুত্ব বলিয়া মনে কব, তবে আর উত্তর নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহাকে দস্যুবৃত্তি বা চৌর বৃত্তিই বলা যায়। প্রকাশিত মতে যদি প্রজাদিগের উপর কোন প্রকার আধিপত্য করিতে পারিতে তবে তাহাই প্রভুত্ব বলিয়া গণ্য হইত। এই গেল প্রজার উপর আধিপত্য! (অথচ তুমি মহারাজা !!)

তৎপরে সৈন্য সামন্তের মধ্যে, ধর, দুই চারিজন বাড়ীর পাহারাদার আছে, সুতরাং বসতির বাড়ীখানিকেই কেল্লা বলিয়া ধরিয়া লও, এবং বাহিরে যাওয়ার সময় যদি দুই চারি জন ঘোটকারোহী সঙ্গে যায় তবে তাহাদিগকে অশ্বারোহী সৈন্য বলিয়া ধরিয়া লও, নচেৎ আর সৈন্য পাইবে কোথায়? কারণ এই কয়েকজন ব্যতীত অধিক আর তরবাল, বা নালিক (বন্দুক) ধারী পুরুষ রাখিতে তোমার অধিকার নাই (পাসনাই)। কিন্তু ঐ করবাল কখনই কোষ হইতে নিষ্কাসিত করিতে পারিবে না। নালিকের মধ্যেও চুর্ণ (বারুদ) পুরিতে পারিবেনা; তাহা হইলে উপযুক্ত দণ্ডপ্রদানপূর্ব্বক তোমার ঐ তরবাল ও নালিক কএকটি সরকার হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে। অতএব মরীচা ধরিয়া ঐ যে তরবাল দুইখানি কোষের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধে মিলিয়া গেল! আর খুলিবার জো নাই, এবং নালিক কএকটির ও অগ্নিরন্ধ্র (রঞ্জান ঘর) বন্ধ হইয়া গেল! এই গেল সৈন্যসামন্তের সম্পত্তি। (তথাপি তুমি মহারাজা !!!)। তৎপর নিজের বীরত্বের তো যেন কথাই নাই? অতএব এই অবস্থায় যদি কেহ তোমাকে রাজা মহারাজা বলে, তবে তাহা প্রলাপ বা বিদ্রূপবাক্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আর তুমিও যদি ঐরূপ লোকের কথা দ্বারা আপনাকে রাজা, মহারাজা, বা পণ্ডিত, তর্ক চুড়ামণি ও বিদ্যাবাগীশ বলিয়া মনে কর, এবং সন্তুষ্ট হও, তবে যাত্রার দলের সং দেখিয়া হাস্য কর কেন? তাহারাও তো তোমার মত পণ্ডিত, তর্কচুড়ামণি বা রাজা মহারাজা উপাধি গ্রহণ করে এবং তাদৃশ পরিচ্ছদও গ্রহণ করে। ব্যাকরণ শাস্ত্রেও এজাতীয় কথা অর্থশূন্য কথার মধ্যে গণ্য করিয়া ইহার প্রাতিপদিক সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই। ব্যাকরণ বলেন, "অর্থ শূন্য শব্দের প্রাতিপদিক সংজ্ঞা হইতে পারে না। উহা কাককোকিলাদি অস্ফুট ধ্বনির মধ্যে গণ্য। অতএব ঐ সকল শব্দের পরে কোন প্রকার বিভক্তির সংযোগ হইবে না, উহা নির্ব্বিভক্তিই থাকিবে।

বেদব্যাস

বেদব্যাস।

১ম ভাগ। ১২৯৩ সাল। ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড।

মনুষ্য ও পশু।

আমরা আপাতত চারি প্রকার প্রাণী দেখিতে পাই, যথা উদ্ভিজ্জ স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ। ভূমি ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত উদ্ভিজ্জ। তরু গুল্ম লতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ। ইহাদিগের কিঞ্চিৎ পরিমাণে আভ্যন্তরিক জ্ঞান লক্ষিত হইয়া থাকে, মূলদেশে জলসেচন করিলে শাখা পল্লবাদি উদ্গম হয়, তন্নিবন্ধন আভ্যন্তরিক উল্লাস প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাই তাহাদিগের জীবিতাবস্থা। যখন মূল দ্বারা রস আকর্ষণ করিতে না পায় সেই সময় তাহাদিগের মৃত্যু হইয়া থাকে, অর্থাৎ শুষ্কভাবাপন্ন হয়। যখন উদ্ভিজ্জের আভ্যন্তরিক হর্ষবিষাদ পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে হর্ষবিষাদের অনুভবিতা চৈতন্য তাহাতে আছে, কিন্তু উপাধিদোষে চৈতন্য সম্যক্ প্রকাশ হইতেছে না। যদ্যপি উদ্ভিজ্জ সকল প্রাণীর জীবনোপায়, উদ্ভিজ্জ না থাকিলে কোন প্রাণীই জীবন ধারণ করিতে পারিত না, তথাপি ঘোর তমোগুণাচ্ছন্ন হইয়া সাধারণের অবজ্ঞাস্পদ হইয়াছে। কেবল লৌকিক হিত সাধন করিলেই আদরের পাত্র হয় না; যাহাতে সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণদ্বারা চৈতন্য সম্যক্ প্রস্ফুরিত হয়, সেই প্রাণীই আদরের বস্তু, তাহা হইতে ভাবী মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে, সেই সকল গুণে বর্জ্জিত বলিয়া সর্ব্ববিধ প্রাণী অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

যাহারা স্বেদে উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে স্বেদজ বলা যায়। যথা মশক মৎকুন প্রভৃতি স্বেদজ। ইহাদিগের অল্প পরিমাণে ইন্দ্রিয় আছে;

তদ্দ্বারা অল্প পরিমাণে বিষয়গ্রহণে সমর্থ; আহারাদির অন্বেষণও করিয়া
দেহের পুষ্টিসাধন করে এবং ইতস্ততঃ গতাগতি করিয়া থাকে। উদ্ভিজ্জ
অপেক্ষা অধিক চৈতন্যের প্রকাশ থাকায় ইহারা উদ্ভিজ্জ হইতে উৎকৃষ্ট
শ্রেণীভুক্ত।

যাহারা অণ্ড হইতে উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে অণ্ডজ বলে পক্ষী
সর্পাদি ভেদে অণ্ডজ নানাবিধ। ইহাদিগের স্বেদজ হইতে অনেকবিধ
বিষয় জ্ঞান আছে, এবং বহিরিন্দ্রিয়ও অধিক; অপেক্ষাকৃত অল্প অল্প
বিচার শক্তিও দেখা যায়; কেহ কেহ প্রসবার্থ যত্নপূর্ব্বক স্থান নির্ণয় করে;
ইত্যাদি অনেকগুলি কার্য্যদ্বারা স্বেদজ হইতে অণ্ডজশরীরে অধিক
পরিমাণে চৈতন্য প্রকাশ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ইহারা স্বেদজ হইতে
শ্রেষ্ঠ প্রাণি জাতি।

গর্ভ বেষ্ঠন চর্ম্ম জরায়ু; তাঁহাতে যাহাদিগের উৎপত্তি হয় তাহারাই
জরায়ুজ। ইহাদিগের সর্ব্ববিধ বিষয় গ্রহণের উপযোগী সকল ইন্দ্রিয়
আছে, ইহারা বহুপ্রকার বিষয় সুখ অনুভব করিয়া থাকে। যে সকল
উপকরণে জরায়ুজ দেহ গঠিত হইয়াছে, তাহা অন্যবিধ দেহ হইতে
বিশিষ্টগুণশালী। সর্ব্বপ্রকার দেহ হইতে জরায়ুজ দেহে অধিকতর ইন্দ্রি-
য়াদি থাকায় ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক পরিমাণে চৈতন্যের প্রকাশ
হইয়া থাকে, অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রাণী অপেক্ষায় জরায়ুজ শ্রেষ্ঠ। পশু
ও মনুষ্য ভেদে জরায়ুজ দুই প্রকার। প্রায়শঃ যাহারা দুই পদে গমন
করে এবং ব্যক্তশব্দ উচ্চারণে সমর্থ হয়, বিবাহ ভিন্ন পত্নী গ্রহণ করে না,
ক্ষুধার পূর্ব্বেই আহারের সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে মনুষ্য বলে;
এবং চতুষ্পদ দ্বারা গমন করে, অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে, কাম পরতন্ত্র
হইয়া স্ত্রীমাত্রেই উপগত হয়, ক্ষুধা হইলে স্বীয় বা পরকীয় বস্তু বিচার
না করিয়াই ভোজনাদি করে, এবং পর কালের নিমিত্ত সংগ্রহ করে না,
তাহারাই পশু। পশু হইতে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বত্রই মনুষ্যের প্রাধান্য
শুনিতে পাই, সমস্ত শাস্ত্রকারেরা মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।
জীব, মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইলে, আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে; কিন্তু কি
নিমিত্ত পশু হইতে শ্রেষ্ঠ তাহাই এই স্থানে আলোচনীয়। পশুগণ
ব্যক্তধ্বনি করিতে পারে না, মনুষ্য ব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে, তাহাতে
মানসিক ভাব প্রকাশ করা যায়, ইহা বলিয়া মনুষ্য শ্রেষ্ঠ হইতে পারে

না। মনুষ্যের ব্যক্ত শব্দই সমস্ত অনর্থের কারণ হইয়াছে; যেহেতু পরনিন্দা,
অন্তরে অন্তরে আঘাত দিয়া গাল প্রদান, এবং বিষয়ের গুণ বর্ণন করত
তাহাতে আসক্তি প্রভৃতি ঘোরতর অনিষ্টের নিদানই ঐ ব্যক্ত শব্দ।
পশুদিগের ব্যক্ত শব্দাভাবে পরনিন্দাদি দোষ না থাকায় তাহারা এক স্থানে
পরম সুখে কাল অতিবাহিত করে, তদ্বিষয়ে পশুরাই সুখী, মনুষ্য নয়।
মনুষ্যগণ পরম সুন্দরী স্ত্রী উপভোগ, নানাবিধ মিষ্টান্নাদি ভক্ষণ, এবং
দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়নাদি করিয়া যারপর নাই বিষয়সুখের পরাকাষ্ঠা
লাভ করিয়া থাকে, পশুজাতি কুৎসিত স্ত্রী উপভোগ, তৃণ বিষ্ঠাদি
ভক্ষণ, ও মৃত্তিকাদিতে শয়ন করিয়া থাকে, এই সকল কারণেও পশু হইতে
মনুষ্য শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না, বরং পশুই শ্রেষ্ঠ। কারণ এই সকল বিষয়
সুখ ভোগ পশুজাতির যেরূপ নির্ব্বাধে সম্পন্ন হয়, মনুষ্যের পক্ষে তাহা
ঘটে না। পশুগণ ইচ্ছামাত্রেই কামবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে, মনুষ্য
রাজদণ্ড ও সমাজ শাসনাদি ভয়ে ইচ্ছামাত্রেই সকল সময়ে অভিলষিত
স্ত্রীতে উপগত হইতে সমর্থ হয় না, এবং তাহাকে অনেক সময়ে স্বদারেও কাম-
বৃত্তি সম্পাদনে নিবৃত্ত হইতে হয়। ইচ্ছার প্রতিঘাত হইলে বিষয় সুখ
কোথায়? অপিচ স্বজাতীয় কামিনীতেই সকলের প্রীতি। রাজার রাজ-
মহিষীতে যে আনন্দ, শূকরের শূকরীতেও সেই আনন্দ, শূকরের নিকট
শূকরী এবং পরম সুন্দরী স্ত্রী উপস্থিত হইলে শূকর পরম সুন্দরী নারী
উপেক্ষা করিয়া শূকরীতেই সাভিলাষ হইবে সন্দেহ নাই। মনুষ্যজাতি পূর্ব্বে
আহারাদি সঞ্চয় না করিলে ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারে না, পশুগণ
ইচ্ছামত সর্ব্বত্রই কোমল তৃণাদি ভোজন করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিয়া
থাকে; তাহারা উপার্জ্জনের ক্লেশ অনুভব করে না। মনুষ্য মিষ্টান্ন
ভোজনে যাদৃশী প্রীতি লাভ করে, শূকরাদি প্রাণী বিষ্ঠাদি ভোজনেও
তাদৃশী প্রীতি লাভ করিয়া থাকে; বিষ্ঠা এবং মিষ্টান্ন এক স্থানে থাকিলে
শূকর কদাচ বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া মিষ্টান্নের প্রতি উন্মুখ হয় না।
মনুষ্য গৃহাভ্যন্তরে কোমল শয্যা না পাইলে নিদ্রা সুখ অনুভব
করিতে পারে না, প্রত্যুত নিদ্রাকর্ষণে দুঃখানুভবই করিয়া থাকে;
কিন্তু নিদ্রার আবেগ মাত্রেই পশুগণ যে কোন স্থানে পরম
সুখে নিদ্রাসুখ অনুভব করে। মনুষ্যগণ স্ত্রীপুত্রাদি বিষয় চিন্তায় নিরন্তর
উদ্বিগ্ন, পশুগণ উদর পূর্ত্তি হইলে কোন চিন্তাতেই আকৃষ্ট হয় না।

ইত্যাদিরূপে পশুগণ যেমন নির্ব্বাধে বিষয়সুখ আস্বাদন করে মনুষ্যের সে সুখ কোথায়? একটু স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, বিষয়সুখ পশুজাতিরই অধিক। তবে কেন মনুষ্যশ্রেষ্ঠ? একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে প্রকৃততত্ত্ব উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। পশুজাতির প্রায়ই ভবিষ্যৎ চিন্তা নাই, মনুষ্য কেবল মাত্র ভাবিতচিন্তাতেই চিত্তবৃত্তিকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। পশুজাতি আকণ্ঠ ভোজনে তৃপ্ত হইয়া পরম সুখে নিদ্রা যায়, অন্য চিন্তায় আক্রান্ত হয় না। কিন্তু ধনধান্যাদিতে গৃহ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, আহারে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে, তথাপি মনুষ্য ভবিষ্যতের জন্য অতিরিক্ত ধনাদি সঞ্চয়ার্থ সর্ব্বদা চেষ্টমান, এবং মনকে সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। কেবল মনুষ্য প্রকৃতিই ভবিষ্যৎ সুখার্থ সর্ব্বদা ব্যাকুল। আর বর্ত্তমান সুখাসক্তিই পশুপ্রকৃতির লক্ষণ। মনুষ্য কেবল বর্ত্তমান সুখে অভিলাষী নহে; একমাত্র ভাবিসুখ লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমানে অধিকতর ক্লেশ ভোগ করে, তাহাতে দুঃখবোধ না করিয়া ভাবিসুখচিন্তায় হর্ষই লাভ করে। মনুষ্য গৃহনির্ম্মাণ, দার পরিগ্রহ, পুত্র প্রার্থনা প্রভৃতি সমস্ত চেষ্টাই ভাবিকালের নিমিত্ত করিয়া থাকে। কারণ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কার্য্যে বর্ত্তমানে ক্লেশ ভিন্ন আর কিছুই অনুভব হয় না; কিন্তু পশু জাতিতে ইহার বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয়।

যে ক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছে, সমাপ্তি হয় নাই, তাহাকেই বর্ত্তমান বলে এবং যে ক্রিয়ার আরম্ভ হয় নাই তাহারই নাম ভবিষ্যৎ।

আমাদিগের শরীরে, গর্ভাধান সময়ে যে ক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছে তাহার সমাপ্তি হইলেই এদেহ চেষ্টাশূন্য হইয়া বিনষ্ট হইবে, যেমন একটী ঘড়ীর দম দিলে যে ক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছে তাহা যে পর্য্যন্ত স্প্রীঙ্গে দম থাকিবে সেই পর্য্যন্ত চলিবে, পরে নিশ্চেষ্ট হইবে, কিন্ত যাবৎ স্প্রীঙ্গের ক্রিয়া থাকিবে; পুনঃ পুনঃ ১২ টা বাজিলেও তাহার সেই সমস্ত কালই বর্ত্তমান। আর উক্ত ক্রিয়ার নিবৃত্তি হইলেই তখন অতীতকাল হইবে। আর যে ক্রিয়ার আরম্ভ হয় নাই তাহারই নাম ভবিষ্যৎ। এইক্ষণে বুঝিলাম আমাদিগের যে পর্য্যন্ত এই শরীর থাকিবে তাবতই বর্ত্তমান অবস্থা, তাহার পর ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ এই শরীর নাশের পর যে একটি সময় আসিবে তাহাই আমাদিগের ভবিষ্যৎ যাহাকে

পরকাল বলে। যদি জল না থাকিত কখনই পিপাসা হইত না, যদি অন্ন না থাকিত কখনই ক্ষুধা হইত না, তদ্রূপ পরকাল না থাকিলে তাহার নিমিত্ত আমরা ব্যাকুল হইতাম না, পরকালের নিমিত্তই আমাদিগের সঞ্চয়, তাহার নিমিত্তই আমাদিগের ভয়, সে সময়ে কি হইবে বলিয়াই সর্ব্বদা উদ্বেগ। আমরা এ জগতে যে স্ত্রী পুত্রাদিকে আত্ম নির্ব্বিশেষে যত্ন করিতেছি, যাহাদিগের হর্ষ দর্শনে স্বয়ং হর্ষ লাভ করিতেছি, যাহাদিগের সুখের নিমিত্ত শত অকার্য্য করিয়া ধনোপার্জ্জন করিতেছি; ভবিষ্যতে ইহাদিগের কাহারই সহিত সাক্ষাৎ হইবে না কেহই সঙ্গে যাইবে না এমন কি যাহাকে চিরকাল আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপনে ত্রুটি করিবে না সে শরীর ও এই জগতে পড়িয়া থাকিবে। ধর্ম্ম ভিন্ন পরলোকে আর কেহই সঙ্গে যাইবে না ভগবান্ মনু বলিয়াছেনঃ—

এক এব সুহৃদ্ ধর্ম্মো নিধনে প্যনুযাতিহি
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যচ্চগচ্ছতি॥

ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃৎ যেহেতু পরলোকে সঙ্গে গমন করে। তদ্ভিন্ন স্ত্রী পুত্র গৃহ ধনজনাদি সকল শরীরের পরিকর, শরীর নাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের বিনাশ হয় অর্থাৎ শরীর নাশের পর তাহাদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। এইক্ষণে বুঝিলাম যাঁহারা পরলোকে হিতকর ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন তাঁহারাই মনুষ্য। যাহারা কেবল ঐহিক সুখাভিলাষী তাহারাই পশু। শ্রুতিও বলিয়াছেন "পশুবৈ সনরাণাং"। যাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বিষয়সুখে রত তাহারাই মনুষ্য মধ্যে পশু। হস্তপদাদি বিশিষ্ট মনুষ্যাকারে আকারিত জড় পিণ্ড, মনুষ্য পদের বাচ্য নন, তাহা হইলে মৃণ্ময় মনুষ্যাকার পুত্তলিকাতেও মনুষ্য হইতে পারে। বস্তুতঃ প্রকৃতি অনুসারে মনুষ্য এবং পশু নির্ণীত হইয়াছে। পূর্ব্বতন আর্য্যগণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা পরলোক হিতার্থই বাক্যমনঃ এবং শরীর নিযুক্ত করিতেন। অতিথি সেবাদি পঞ্চযজ্ঞসম্পাদনার্থ গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন ভগবান্ কশ্যপ বলিয়াছেনঃ—

গৃহেষু যেম্বতিথয়ো নার্চ্চিতাঃ সলিলৈরপি।
যদি নির্যান্তিতেনূনং ফেরুরাজ গৃহোপমাঃ।

যে গৃহেতে অতিথি জলদ্বারা ও পূজিত না হইয়া ফিরিয়া যান সে

শৃগাল গর্ত্ত সদৃশ। আর্য্যগণের বিলাসিতা সম্পাদনের নিমিত্ত গৃহ ছিল না। পারলৌকিক ধর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত দার পরিগ্রহ করিতেন, এই নিমিত্ত স্ত্রীগণ সহধার্ম্মণী পদবাচ্য ছিলেন তাঁহাদিগের স্ত্রীগ্রহণ পশু ধর্ম্ম চরিতার্থের জন্য নয়। তাঁহারা বিলাসিতা সম্পাদনের নিমিত্ত অর্থ সঞ্চয় করিতেন না কিন্তু পারলৌকিক ধর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত অর্থ প্রার্থনা করিতেন। তাঁহারা পরলোকসুখার্থ পুত্র প্রার্থনা করিতেন এবং সেই পুত্রকে নরক হইতে পরিত্রাতা বলিয়া দেখিতেন তাঁহারা কেবল বর্ত্তমানের নিমিত্ত কিছুই করিতেন না।

যদ্যপিও শ্বেতদ্বীপের ঋষিগণ আর্য্যদিগের ন্যূনতা প্রতিপাদনার্থ কৃষক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা মনে করি তাঁহাদিগের কণ্ঠস্থ সরস্বতী সত্যই বলিয়াছেন, কারণ যাহারা ভাবি কালের উৎকৃষ্ট ফল লাভার্থ বর্ত্তমানে ক্লেশ স্বীকার করে এবং ভাবিফল নিশ্চয় করিয়া সেই সেই ক্লেশে পরমানন্দই অনুভব করে, হীনবীর্য্য ক্ষেত্রকে বিশিষ্ট উপায় দ্বারা বীর্য্যশালি করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক শস্য সম্পাদিত করে, এবং বর্ত্তমান সময়েই ভবিষ্যৎফল প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পায়, তাহারাই কৃষক। গৌণী-বৃত্তি দ্বারা এসকল গুণ আর্য্যঋষিগণেও উপলব্ধি হয়। যেমন "সিংহো দেবদত্তঃ" এই বাক্য প্রয়োগ করিলে সিংহ শব্দে চতুষ্পদ পশু, দেবদত্ত শব্দে দ্বিপদ মনুষ্য সুতরাং এই শব্দ দ্বয়ের সামানাধিকরণ্য হইতে পারে না এজন্য ইহা দ্বারা সোজা সোজী অর্থ প্রতীত হইতে পারে না, ইহার শব্দ বোধের নিমিত্ত সিংহগত শৌর্য্য বীর্য্যাদি গুণে লক্ষণা করিতে হইবে, এবং "সিংহের ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্যাদি গুণ বিশিষ্ট দেব-দত্ত" ইহাই বুঝাইবে। এখানেও তদ্রূপ, "কৃষক" শব্দে কৃষক গত কতকগুলি সদ্‌গুণে লক্ষণা করিতে হইবে কৃষকের ন্যায় গুণবিশিষ্ট আর্য্য-পুরুষ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আর্য্যেরা পরলোকে মনও সুখ স্বরূপ লাভার্থ ইহলোকে কঠোর তপস্যায় অনুষ্ঠান করিতেন তাহাতে পরমানন্দ অনুভব করিতেন হীনবীর্য্য ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীরটাকে বিহিত কর্ম্মানু-ষ্ঠানে বীর্য্যশালি অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্য করিতেন এবং বর্ত্তমান ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা ভাবি কালের শুভাশুভ নিশ্চয় করিতেন; সুতরাং কৃষকের সদৃশ হইলেন, তাই ম্লেচ্ছকণ্ঠস্থ স্বরস্বতী আর্য্য ঋষিদিগকে কৃষক বলিয়া থাকেন। যাঁহারা পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতেন অসাধারণ

প্রভাবে ভূসুর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, যাঁহাদিগের পাদরেণু স্পর্শে পৃথিবী ভৌমস্বর্গ হইয়াছেন সেই আর্য্যজাতিই প্রকৃত মনুষ্য। এই ক্ষণে বুঝিলাম যাঁহারা ঐহিক বিষয়ে আস্থাশূন্য হইয়া পারলৌকিক সুখের নিমিত্ত স্বাধিকারানুরূপ বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাই মনুষ্য, তদ্ভিন্ন সকল প্রকার জরায়ুজ প্রাণীই পশু পদ বাচ্য!

যাঁহাদিগের বাক্য কখনই মিথ্যা হয় না, যাঁহাদিগের কখনই মিথ্যা বিষয়ে মনোগতি নাই, যাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়গণ কখনই অসৎ পথে যায় না যাঁহাদিগের সোৎকণ্ঠ হৃদয়ে এক মাত্র ভগবানই আধিপত্য করিতেছেন সেই পরম পাবক আর্য্য ঋষিগণের চরণে কোটি কোটি প্রণতি।

জয় পরাজয়।

বিশ্বরাজ্যের সর্ব্বত্রই সুনিয়ম প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। সামান্য অঙ্কুরোদ্গম হইতে সুবিশাল গ্রহ নক্ষত্রাদির পরিভ্রমণ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই ও সমস্ত কার্য্যই কল্যাণকর নিয়মাবলী দ্বারা পরিপালিত ও পরিরক্ষিত হইতেছে। কিন্তু জয় পরাজয়ের নিয়ম কি? শুনিতে পাই "যতো ধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ"। কিন্তু কার্য্যকালে বা সংসারক্ষেত্রে তাহা দেখি কৈ? বরং সময়ে সময়ে ইহাই মনে হয়, যে যাহা কিছু উদার যাহা কিছু পবিত্র যাহা কিছু মহৎ তাহারই পরাজয় প্রাপ্ত হয়, আর যাহা কিছু ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়, ও মিথ্যাময় তাহাই সংসারে জয়ীহইয়া থাকে। নিরামিষাশী প্রাতঃ-স্নায়ী পুরোহিত ও মদ্যপায়ী বেশ্যারত উকীল বাবু এ উভয়ের মধ্যে বোধ হয় পুরোহিতই ধার্ম্মিক। কিন্তু সংসারে জয়ী কে? উকীল বাবুর অনুগ্রহকটাক্ষ লাভের জন্য পুরোহিত সদাই লালায়িত। তবে আর ধর্ম্মের জয় হইল কৈ? বরং দেখিতেছি যে "যতোহধর্ম্মোঃ স্ততোঃ জয়ঃ" যেখানে অধর্ম্ম সেখানেই জয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্ম কখন পরাজিত হন না। সর্ব্বদেশের পুরাণ ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখুন, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের জয় হইয়াছে। অধর্ম্ম অধর্ম্মের উপর জয়লাভ করিয়াছে, কিন্তু অধর্ম্ম ধর্ম্মের নিকট চিরকালই বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইয়াছে। ফলতঃ জয় পরাজয়ের নিয়ম

এই যে, তমোগুণাশ্রিত ব্যক্তিগণ রজোগুণাশ্রিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, এবং রজোগুণাশ্রিত ব্যক্তিগণ সাত্ত্বিক ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। দেখুন তামসিক বৃক্ষ, রাজসিক কীট পতঙ্গাদির খাদ্য, এবং রাজসিক হস্তী ও সাত্ত্বিক মনুষ্যের আজ্ঞাধীন। সুবিশাল বটবৃক্ষের সহিত কি সামান্য কীটপতঙ্গের তুলনা হয়? কিন্তু তথাপি বটবৃক্ষের ফল আহরণ করে কে? এইরূপ হস্তীর বলের সহিত কি মনুষ্যের বলের তুলনা হয়? তথাপি হস্তী মনুষ্যের অধীন। কোথায় এই দেবভূমি ভারতবর্ষ আর কোথায় সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ইংলণ্ড দ্বীপ? কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষ আজ ইংলণ্ডের পদানত কেন? ইহার উত্তর এই যে ভারতবর্ষ আজি তামসিক ও ইংলণ্ড আজি রাজসিক। তামসিক রাজসিকের নিকট চিরকালই পরাজিত হইয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক সম্বন্ধে যে সমস্ত লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, আমরা প্রথমে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

"অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রীচ কর্ত্তা তামস উচ্যতে।" গীতা।

অর্থাৎ "যাহারা তামসিক তাহারা চঞ্চলচিত্ত, অবিবেচক, নিশ্চেষ্ট, শঠ, পরাপমানী, অলস, শোকশীল, এবং দীর্ঘসূত্রী হইয়া থাকে।"

"লোভঃ স্বপ্নোঽধৃতিঃ ক্রৌর্য্যংনাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা।
যাচিষ্ণুতা, প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণং।" মনু

অর্থাৎ "দুষ্প্রাপ্য ও অবিহিত বিষয়ে লোভ, আলস্য, অধৈর্য্য, নাস্তিকতা, অনাচার, ভিক্ষাবৃত্তি, ও অনবধান এই কয়টী তমোগুণের লক্ষণ।" এই ক্ষণে মিলাইয়া দেখুন, আমাদের মধ্যে এই সমস্ত দোষ বাহুল্য জন্মিয়াছে কি না? আধুনিক বাঙ্গালী বাবুর ন্যায়, অস্থির, অধীর, অলস, নাস্তিক, অনাচারী জীব পৃথিবীতে অন্য কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এবং বাঙ্গালী বাবুর যে দশা, আজি ভারতবাসীর অধিকাংশেরই সেই দশা। সুতরাং ভারতবাসী সহজেই অন্যের নিকট পরাজিত হয়। এক্ষণে রাজসিক গুণাবলী কি দেখা যাউক।

"রাগী, কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ লুব্ধোহিংসাত্মকোঽশুচি।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

অর্থাৎ "বিষয়লোলুপ, ফলান্বেষী, লুব্ধ, হিংসুক, অশুচি, হর্ষশোকান্বিত

যে কর্ত্তা তাহাকে রাজস কর্ত্তা বলে।" এক্ষণে দেখুন ইংরেজদের চরিত্রে এই কয়েকটী গুণ ও দোষ পান কি না। ইংরেজরা যেরূপে হউক নিজ কার্য্যসিদ্ধি করিবেই করিবে।

নীচৈরনীচৈরতি নীচনীচৈঃ সর্ব্বৈরু পায়ৈঃ ফলমেব সাধ্যং।

যে কোন উপায়েই ফললাভ করিতে হইবেই হইবে।

ইংরাজেরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সুতরাং ইংরাজেরা নিরলস। এবং ইহারা সহজেই অলস ও নিরুদ্যম জাতির উপর প্রভুত্ব সংস্থাপন করিতে পারে। মনু রজোগুণের নিম্নলিখিত লক্ষণ সমস্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"আরম্ভরুচিতাধৈর্য্যং অসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণং।"

অর্থাৎ "কার্য্যসিদ্ধির প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ, অধৈর্য্য, অসৎকার্য্যে অভিলাষ, নিরন্তর ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টা এই কয়েকটী রজোগুণের লক্ষণ।" রজোগুণ নিজে নিন্দনীয় হইলেও তমোগুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সুতরাং এই দুইয়ে বিরোধ উপস্থিত হইলে রজোগুণেরই জয় হইয়া থাকে।

সাত্ত্বিক গুণ সম্বন্ধে সাধারণের মনে একটী বিষম ভ্রম আছে। সেই ভ্রমটীর অপনোদন হওয়া আবশ্যক। সাধারণে মনে করেন, যে, যে ব্যক্তি সাত্ত্বিক সে নিতান্ত "গোবেচারা ভালমানুষ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। সাত্ত্বিক রামচন্দ্রের চরিত্র আলোচনা করুন, তাহাতে দেখিবেন।

"বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্য্যে, সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নি সদৃশঃ ক্রোধে, ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ॥
হন্ত্যেব নিয়মাদ্বধ্যান্ অবধ্যেষু ন কুপ্যতি।
নাস্য ক্রোধঃ প্রসাদশ্চ নিরর্থোঽস্তি কদাচন॥"

ফলতঃ সাত্ত্বিক বলিতে খ্রীষ্টের ন্যায় সন্ন্যাসী বুঝিতে হইবে না। সংসারে থাকিয়া, বিনয় ও বীর্য্য, ধৈর্য্য ও শৌর্য্য প্রভৃতির যথাযথ ব্যবহারে ও লোকে সাত্ত্বিক বলিয়া পরিগণিত হইত। রামচন্দ্র ভরতকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

"রিপৌ শৌর্য্যং, ধৈর্য্যং বিপদি, বিনয়ং সদসি।
ইদং বর্ম্ম ভ্রাতঃ নিয়তং যাক্যাসি সদা"॥

যাহাদের শৌর্য্য বীর্য্য না থাকিত তাহাদিগকে হিন্দুরা ক্লীব ও দীন বলিতেন; তাহাদিগকে তাঁহারা প্রশংসার্হ মনে করিতেন না। বৃদ্ধেরা এখনও বলিয়া থাকেন।

"ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবঃ।"—"To be weak is miserable, doing or suffering,"। গীতায় সাত্বিক চরিত্রের লক্ষণ নিয়োক্ত রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্বিক উচ্যতে।"

"ফলাভিসন্ধি শূন্য, গর্ব্বরহিত, ধীর, উৎসাহশীল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ যে কর্ত্তা তিনি সাত্বিক কর্ত্তা।"

মনুতেও লিখিত আছে যে,

বিদ্যাভ্যাস স্তপোজ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধর্ম্ম ক্রিয়াত্ম চিন্তা যা সাত্বিকং গুণলক্ষণং॥

এখানেও দেখা যায় যে সাত্বিক ব্যক্তি একান্ত চিত্তে ধর্ম্মযুক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। এক্ষণে আমরা তিনটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

১। যে ব্যক্তি তামসিক, সে অলস ও নিষ্কর্ম্মা।
২। যে ব্যক্তি রাজসিক সে কর্ম্মঠ, কিন্তু অপবিত্র ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র।
৩। যিনি সত্বিক তিনিও কর্ম্মঠ, কিন্তু পবিত্র ও ধর্ম্মভীরু ও নিঃস্বার্থ।

সাত্বিক ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্য রামায়ণে দর্শিত হইয়াছে।

"রক্ষিতা জীবলোকস্য, ধর্ম্মস্য পরিরক্ষিতা।
রক্ষিতা স্বস্য ধর্ম্মস্য স্বজনস্য চরক্ষিতা॥"

ধর্ম্মরক্ষা, লোকরক্ষা, স্বজন প্রতিপালন প্রভৃতিই সাত্বিক ব্যক্তির জীবনর ব্রত।

সাত্বিক ব্যক্তির নিকট রাজসিক ব্যক্তি সর্ব্বদাই পরাভূত ও পরাজিত হন। আমেরিকা এক কালে ইংলণ্ডের অধীন ছিল। তখন আমেরিকার রণপোত বা সৈন্য সামন্ত প্রায় কিছুই ছিল না। তখন ইংলণ্ড অসংখ্য অক্ষৌহিণীর অধীশ্বরী ছিলেন। কিন্তু তথাপি আমেরিকা দেশহিত নামক সাত্বিক কার্য্যে ব্রতী হইয়া বারম্বার ইংলণ্ডকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সুইটজরলণ্ডের জন কয়েক লোক পূর্ব্বোক্ত সাত্বিক গুণের সাহায্যে বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়নকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র গ্রীস, জরাক্সিসকে নিজ

দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। ফলতঃ যখন শৌর্য্য ও সাত্বিকতা একত্র সম্মিলিত হয়, যখন লোকে লাভালাভ, জয়াজয় বিস্মৃত হইয়া কেবল কর্ত্তব্য পালনে রত থাকে তখন কেহই তাহাদিগকে দমন করিতে পারে না। আর যেখানে আলস্য, যেখানে দীর্ঘসূত্রিতা, যেখানে ভ্রম (অর্থাৎ শত্রুর প্রতি ভক্তি ও নিজের প্রতি অনাদর ও তাচ্ছীল্য) যেখানে অধৈর্য্য ও নাস্তিকতা, সেখানে পরাজয়। সাত্বিকতা ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার কল্যাণের নিদান।

হে স্বদেশবাসিগণ! তোমরা সাত্বিক হিন্দুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া আর কতকাল গাঢ় তামস অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিবে? তোমাদের ধন, ধর্ম্ম, মান, সম্ভ্রম, যশঃ, কীর্ত্তি, গৌরব, সমস্তই একে একে তিরোহিত হইতেছে। জগতে তোমারা ভীরু, কাপুরুষ এমন কি অনার্য্য বলিয়া বিঘোষিত হইতেছ, তোমরা যে ভীষ্ম দ্রোণ মনু অত্রি ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি বংশধর ইহা কি চিরকালই ভুলিয়া থাকিবে? তোমাদের শক্তি সামর্থ মহত্ত্ব ঔদার্য্য প্রভৃতির প্রতি কি একবারও দৃষ্টিপাত করিবেনা? যে যেখানে আছ একবার নয়ন উন্মীলন কর; তামসিকতা কে সাত্বিকতা বলিয়া মনে করিও না। শত্রুর কথা শুনিয়া আপনাদিগকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া মনে করিও না। সিংহের বংশে কি শৃগালের জন্ম সম্ভব? এবং সর্ব্বশেষে একমনে এক প্রাণে দেবাদিদেব মহাদেবের আশ্রয় গ্রহণ কর। যিনি ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন; সেই ত্রিপুরান্তক পুনরায় কুমার সম্ভবের অভিনয় করিয়া তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন।

স্বধর্ম্ম ত্যাগ।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যানাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসোভবতীত্যনুশুশ্রুম॥
গীতা ১ ম অধ্যায় ৪৩ শ্লোক।

হে জনার্দ্দন! আমরা শুনিয়াছি যাহারা কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট, তাহাদের নিয়ত নরকে বাস হয়।

এই ভারত মণ্ডলে, যাঁহাদের পাদরেণু লাভে বঞ্চিত দেশ সকল, অদ্যাপি পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ বলিয়া কটাক্ষিত; যাঁহাদের নীতি যৌধিষ্ঠিরী নীতি বলিয়া প্রসিদ্ধ; যাঁহাদের প্রভাব বংশপর বলিয়া পঞ্চসহস্র বৎসর পরেও আমরা হৃদয়ে গৌরব অনুভব করি এবং কোন প্রকার কুশাসনেই পরিতৃপ্ত হইতে পারি না; সেই কৌরবমাল্যার নায়ক মণি পাণ্ডব কুলের প্রাগুক্ত বাক্যের অভ্যন্তরে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির অতি গূঢ়তত্ত্ব সকল নিহিত আছে; যাঁহাদের জ্ঞান নয়নে উহা প্রতিভাত হইয়াছে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস স্বধর্ম্মত্যাগরূপ বিষম ব্যাপারে তাঁহারা কখনও প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে ভগবদ্গীতায় স্বধর্ম্মত্যাগের অনৌচিত্য বিষয়ে অতি গভীর উপদেশ সকল নিহিত আছে, ভারতবর্ষে, নানারূপে উহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে, আমরা অনেকে উহা অধ্যয়ন করিয়াও স্বধর্ম্মত্যাগের ভীষণ পরিণাম উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ; কাহারও বুদ্ধি বাণের ন্যায় তীক্ষ্ণ, অধীত বিষয়মাত্রেরই অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; কাহারও, প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় স্থূল, অনেক অধ্যয়ন করিলেও কিছুরই মর্ম্ম পরিগ্রহ হয় না।

"বহুস্পৃশাপি স্থূলেন স্থীয়তে বাহির শ্মরৎ" ॥ (মাঘ)

ইহাতে কি অনর্থের সূচনা হইতেছে দেখুন।

এইক্ষণ, এতদ্দেশীয় কতিপয় কৃতবিদ্য, (১) ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার ব্যপদেশে স্বজাতীয়গণকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন; "সসেমিরার" উপাখ্যানে বর্ণিত রাজকুমারের ন্যায়, তরল চিত্ত লোক বোধ হয় সকল দেশেও সকল সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; এতদ্দেশেও তথাভূত তরুণগণ, উহাদের প্রজ্ঞাবাদে বিমুগ্ধ হইয়া, জাতিধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ম্লেচ্ছ যবনাদির অনুকরণে, প্রবৃত্ত, উদ্যত, বা উন্মুখ হইতেছেন।

পক্ষান্তরে প্রাগুক্ত কারণে, লোকস্থিতিভঙ্গের উপক্রম দর্শনে

(১) সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, ইংরেজি ভাবী বৈদেশিক আচারানুরক্ত ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে কৃতবিদ্য বলিয়া থাকেন, আমরাও কৃতবিদ্য নামে তাঁহাদিগকেই নির্দ্দেশ করিলাম।

ব্যথিত চিত্ত সনাতন ধর্ম্মানুরাগী আর্য্যগণও স্বধর্ম্মরক্ষায় ব্যাপৃত হইয়া অগত্যা তাহাদের অতিক্রম নিবারণের যত্ন করিতেছেন। সুতরাং এক জাতি মধ্যে দুইটি বিরোধী সম্প্রদায় উৎপন্ন হইল; ভোগপরায়ণ স্থূলদর্শিগণ, হয়ত, এই ঘটনাকে অতি সামান্য জ্ঞানে উপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু আর্য্য সমাজের সহজ বৈরিগণ, আনন্দিত চিত্তে, উহার পরিণাম প্রতীক্ষা করিতেছেন; এবং স্বজাতির কল্যাণকামব্যক্তিগণ, বিষণ্ণচিত্তে, উহার ভাবিফল চিন্তা করিতেছেন।

আমাদের কৃতবিদ্যগণ, এই উপস্থিত গৃহবিচ্ছেদ বিষয়ে সবিশেষ উদ্বিগ্ন বলিয়া বোধ হয় না; অন্ততঃ তাঁহাদের কার্য্যে তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না; ইহার কারণ, বোধ হয়, যে তাহারা উন্নতিবাদী, এবং অচিরেই সমুদায় আর্য্য সন্তান তাঁহাদের নূতন মত অনুসরণ করিবে; সুতরাং গৃহবিচ্ছেদও তিরোহিত হইবে—এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

তাঁহাদের উন্নতিবাদ বিষয়ে, অদ্য কিছু বলিতে অভিলাষ নাই, কিন্তু সমুদায় আর্য্য সন্তান তাঁহাদের আবিষ্কৃত নবধর্ম্ম পরিগ্রহ করিবে ইহা বড় মারাত্মক ভ্রম; এমন কি অধিকাংশ লোক তাঁহাদের মত অনুসরণ করিবে—এই প্রকার বিশ্বাস করাও সঙ্গত বোধ হয় না।

আমরা দেখিতে পাই যে আর্য্য সমাজ, ভগবান পুরাণমুনির উপদেশ লাভে চরিতার্থ, কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রমুখ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক দীক্ষিত, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আহিতলক্ষণ যোগিগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সার্ব্বভৌমগণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত, অতএব কতিপয় পরতন্ত্র কৃতবিদ্য যে তাঁহাদের দুরধীত ইংরেজি বিদ্যাবলে উহাকে সনাতন ধর্ম্মচ্যুত করিয়া ম্লেচ্ছানুকরণে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা বোধ হয় সুবুদ্ধি লোক কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না। ম্লেচ্ছ যবন প্রভৃতি স্বাধীনচিত্তকৃতীধর্ম্মপ্রচারকগণ, যাহাতে বিফলপ্রয়াস হইয়াছেন; কৃতবিদ্যগণ তাহাতে কৃতকার্য্য হইবে না—এই "শৈল্যবলে পাণ্ডব জয়াশা,"—বালক হৃদয়েই স্থান পাইবার যোগ্য।

পক্ষান্তরে আর্য্যগণ আপনাদিগকে, যতই কেন সবল মনে না করুন; কৃতবিদ্যগণ যে সম্প্রদায় সংস্থাপন করিতেছেন তাহা যে কর্পূরাদির ন্যায় একবারেই বাতবিলীন হইয়া যাইবে তদ্বিষয়েও অখণ্ডনীয় প্রমাণ

আছে কি না জানি না। সত্য বটে কৃতবিদ্যগণ, সকল প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিশ্বাস করিতে উপদেশ প্রদান করেন, সুতরাং সকল ধর্ম্মাবলম্বীরাই ইহাদের বিরোধী; এবং কোন আপ্তবাক্য ও মহাপুরুষ ইহাঁদের মতের অনুমোদন করিতে প্রবৃত্ত নন বলিয়া, ইহাঁরা লোকের বিশ্বাস আকর্ষণে অক্ষম; সত্য বটে ইহাঁদের উপদেশ অনুসারে মানব সম্প্রদায় নিখিল ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিশ্বাসী হইলে ভূমণ্ডলে অতি ভীষণ ব্যসন উপস্থিত হইবে, এমন কি এই ভারতভূমি সজ্জনের বসতির অযোগ্য হইবে, এবং এই শঙ্কায় ইহাঁরা নীতিবিৎ পণ্ডিতগণের বিদ্বিষ্ট হইতেছেন ও হইবেন; সুতরাং এই সকল প্রতিবন্ধক নিবন্ধন ইহাঁদের আবিষ্কৃত নবধর্ম্মের বহুল প্রচার অবাঞ্ছনীয় এবং অসম্ভাবনীয় সন্দেহ নাই। তথাপি এই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সমূলে বিলোপ সম্ভাবনীয় বোধ হয় না। কারণ ইহা অতি অনায়াস সাধ্য; সুতরাং অলস ও অসাত্ত্বিক প্রকৃতি লোকের চিত্ত এই ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; ইহাতে ভোগপরায়ণ ব্যক্তি স্বভাবতই অনুরক্ত হইতে পারে; কারণ এতাদৃশ ভোগের অবিরোধী প্রত্যুত অনুকূল ধর্ম্ম জগতে আর আছে কি না সন্দেহ। এই ধর্ম্ম খৃষ্টান ধর্ম্মের অনেকাংশে তুল্য এমন কি এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে, ঈশাবর্জিত খৃষ্টান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; সুতরাং খৃষ্টানদিগের আনুগত্য ও প্রীতিসাধন ইহাঁদের পক্ষে অতি সুকর; অতএব রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহ প্রার্থী লোকের এই ধর্ম্মের অনুসরণ করা সম্ভবপর। বর্ত্তমান সময়ে খৃষ্টানদিগের সহিত দেশান্তর গমন এবং রাজসেবা দ্বারা সমধিক ধনোপার্জ্জন ইহাদের পক্ষে সুখসাধ্য; সুতরাং অন্নিবন্ধনও অনেকে এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে ইহা অনায়াসেই বিশ্বাস করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ হিন্দুগণ নিতান্ত পবিত্রতা প্রিয়; পৃথিবীর অন্য কোন জাতির হৃদয়ে পবিত্রতানুরাগ এই প্রকার বদ্ধমূল হইয়াছে কিনা সন্দেহের বিষয়; এই অনুরাগ হইতেই আর্য্য সমাজে বিধবা বিবাহ নিন্দিত, বাল্য বিবাহ প্রোৎসাহিত, জাতিভেদ সংস্থাপিত এবং আহারাদি বিষয়ে নানা নিয়ম প্রতিপালিত হইতেছে। এই পবিত্রতানুরাগ নিবন্ধনই, নরমান্ বিজিত ইংলণ্ডবাসীর ন্যায়, মোগল বিজিত হিন্দুগণ বিজয়িজাতির সহিত মিলিত হইয়া স্বাধীন জাতি বলিয়া অভিমান করিতে পারেন নাই। পবিত্রতাপ্রিয় হিন্দুগণ স্বীয়

সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধতা রক্ষার নিমিত্ত সময়ে সময়ে অনেক কদাচারী ও দুঃশীল ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। তখন আন্দামান দ্বীপ যেমন ভারতীয় অপরাধীদিগকে আশ্রয় দান করে। কৃত বিদ্য গণের নবধর্ম্ম ও তদ্রূপ হিন্দু সমাজ বিতাড়িত ব্যক্তিকে নিজ নিজ ক্রোড়ে স্থান দান করিবে।

এই সকল কারণে ও বংশবৃদ্ধিরূপ প্রাকৃত নিয়মে কৃতবিদ্যগণের অবলম্বিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং স্বজাতি বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য। যে স্থানে বিচ্ছেদ সেই স্থানেই বিরোধ হইবেই হইবে, ক্রমে পরস্পর অবজ্ঞা দ্বেষও হিংসার উদয় হইয়া থাকে। আমি অতি দুঃখের সহিত বলিতেছি কৃতবিদ্য প্রচারকদিগের অবিমৃশ্যকারিতা, অনধিকারচর্চ্চা, এবং অনুচিত বৈজ্ঞানিকত্বাভিমান নিবন্ধন এই বিরোধ উৎকটমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে।

ইহারা "ন বিগহ্য কথাং কুর্য্যাৎ" এই সনাতন নিয়মের সহিত কোন রূপে পরিচিত বলিয়া বোধ হয় না। কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার অভাবে অন্ধ ইত্যাদি মধুর বচনে হতভাগ্য পূর্ব্বপুরুষগণ এবং সজাতীয়গণকে এতদূর পরিতৃপ্ত করিয়াছেন যে উপেক্ষাগুণে চিরপ্রসিদ্ধ হিন্দুগণও আর ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং যে সময়ে সমুদায় বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক জাতীয় সমবায় সংস্থাপন একান্ত আবশ্যক, কতিপয় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির অবিমৃশ্যকারিতা দোষে তখন হিন্দুজাতি মধ্যে অন্তঃকলহানল সংধুক্ষিত হইতেছে। এইক্ষণ ইহার উপশমনের নিমিত্ত যত্ন না করিলে, ঐক্যবন্ধনের ব্যাঘাত উপস্থিত এবং পরিণামে ভীষণতর অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা।

একজন কবির লিয়াছেন,—

"নির্দ্দহতি কুলমশেষং জ্ঞানিনাং বৈর সম্ভবঃ কলহঃ।
বনমিব মলয়পবনাহত তরুবর সংঘট্ট সম্ভবো দহনঃ।"

প্রচণ্ড পবন দ্বারায় আহত তরুগণের পরস্পর সংঘর্ষণে উৎপন্ন অনল যদ্রূপ সমুদায় অরণ্যকে ভস্মসাৎ করে, এক বংশ প্রসূত ব্যক্তিগণের বিদ্বেষ-কলহ ও তদ্রূপ সমুদায় বংশকে দগ্ধ করিয়া থাকে।

এবং ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, যে জাতির মধ্যে স্বজাতিবিরোধ, বৈরিগণের ভেদোপায় উহাকে অনায়াসে ব্যাকুল ও বিপন্ন করিতে

সমর্থ ; হিন্দুসম্প্রদায় অন্তর্ভেদ জর্জ্জর বলিয়াই নানাগুণ সম্পন্ন হইয়াও শত্রু কর্ত্তৃক ভেদোপায়ে নির্জ্জিত, পাদদলিত ও অবহেলিত হইয়াছে। এইক্ষণ দেশহিতৈষীগণের সবিশেষ যত্ন করা আবশ্যক যে এই বিরোধ নিবন্ধন স্বজাতির অনিষ্ট না হইয়া যেন ইষ্টই সংসাধিত হয়। অনিষ্টকর বিষয়কে ইষ্ট সাধনে পরিণত করাই নীতি নৈপুণ্য।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব।

জগদম্বা ও ভোলা পাগলার কথোপকথন।

প্রাণপুর গ্রামে জ্ঞানানন্দ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী দুর্গোৎসব হইতেছে। ভোলাদাস আনন্দে উন্মত্ত হইয়া সনৃত্যে এই গান করিতে করিতে মায়ের দর্শন করিতে যাইতেছেন,—

(রামপ্রসাদী সুর, একতালা)

মন! চল শ্যামা মার নিকটে,
মা মোর অগতির গতি বটে।
যার যে বাসনা, মনেরি কামনা,
সেখানে সকলই ঘটে॥
অন্ন পুণ্যভরা, সাজায়ে পশরা,
এনেছ ভবের হাটে।
যার কর উপায়, পাঁচে সে মিলি খায়,
কলঙ্ক তোমারই রটে॥
কার রাজ্য লয়ে, আনন্দিত হয়ে
রাজত্ব কররে পাটে।
আছে এক জনা, লইতে খাজনা,
জমি যে বিকাবে লাটে॥
কমলাকান্ত, কি ভাবনা ভাব,
দাঁড়ায়ে নদীর তটে।
দেখ দুকুল পাথার, না জান সাঁতার,
তরণী নাই যে ঘাটে॥

পরে মণ্ডপ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার গান ধরিলেন,—

(রাং সিন্ধু, তাল ঢিমে তেতালা)

মা! আমি গো তোমারই অকৃতি তনয়,
আমার গুণাগুণ সম্বর হর সুন্দরি!।
বঞ্চনা অধীন ছেলে উচিত না হয়, মা!॥
মূঢ় জ্ঞানী অচেতন, আরাধিতে মম মন,
মা! অভয়চরণে মন কদাচ না রয়॥

এ দিকে সপ্তমী পূজা সমাপনান্তে, ভোগ নিবেদন হইলে, অন্যপ্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণ ভোজনাদি হইতেছে ; সুতরাং, বাড়ীর সমস্ত লোকই সেই খানে থাকিয়া, ব্রাহ্মণভোজনাদির পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। পূজা-প্রাঙ্গণে কেহই নাই, মণ্ডপেও মানুষ নাই, এককালে নির্জ্জন, তখন ভোলাদাস আস্তে আস্তে গিয়া জগদম্বার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন,—

ভোলাদাস। মা! ভোলা পাগলা কি তোর ছেলে নয়?

জগদম্বা। কেন বাবা, এ কথা বলিতেছ কেন? তুমি তো আমার কার্ত্তিক গণেশেরই সহোদর?

ভোলাদাস। তবে এই এক বৎসর দেখা দিস্ নাই যে?

জগদম্বা। ভোলাদাস! আমি হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বদাইতো তোমায় কোলে করিয়া রাখি। তুমিও তাহা দেখিতে পাও, তবে দেখা দিই না বলিলে কেন?

ভোলাদাস। তা তো জানি, কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে (বিষয়ারণ্যে) এক একবার কোল হইতে ছুড়িয়া ফেলিস্ কেন? তখন আমি প্রাণপণে চাপিয়া ধরিলেও তো ফেলিয়া দিস্?

জগদম্বা। তখনও আমি আড়ালে থাকিয়া তোমার কুশল চিন্তা করি, এজন্য তোমার কোন বিপদ হইতে পারে না, তবে আর তোমার ভয় কি।

ভোলাদাস। তোর নাকি মা নাই, তাই ইহা বুঝিতে পারিস না। মা! তোর যেন তিনটা চক্ষু আছে, তুই সমস্তই দেখিতে পাইস, কিন্তু আমি তো তোকে দেখিতে পাই না ; আমায় যখন এই অরণ্য মধ্যে একাকী পাইয়া এই সকল বাঘ ও ভল্লুকাদি হিংস্র পশুগুলি (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি বিষয় গুলি) মারিতে আইসে তখন তোকে না দেখিলে কিসের দ্বারা

প্রাণের ভরসা করিব? মা! তুই জানিস কি না, জানি না, আমি যে এইজঙ্গলের মধ্যে বৎসরে চারি দিন কাল তোকে দেখিতে পাই, এই সময়টার, যাহারা আমার শত্রু তাহারাই পরম মিত্র হইয়া পড়ে। এই ব্যাঘ্র ও ভল্লুকগুলি আমার প্রিয় সহচরের মত মনে হয়; এই যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি বিষয়গুলি যাহারা অন্য সময় বাঘ ভালুকের ন্যায় আমাকে গ্রাস করিতে চায়, মা! এখন তুই ইহার সঙ্গে থাকাতে এগুলি আমার বড়ই হিতকর মনে হয়। মাগো! তুই বোধ হয় সমস্ত জানিস; নহিলে ও ভাবে হাসিতেছিস্ কেন? যাহা হউক তথাপি তোকে বলি,—মা! অন্যান্য সর্প যেমন শঙ্খিনী সর্প দেখিলেই স্বভাব বশে তাহার মুখে প্রবেশ করিতে চায়, শঙ্খিনীরও উহাদের গ্রাস করাই কার্য, সেইরূপ আমার এই ইন্দ্রিয়গুলিও এক একরূপ বিষয় সর্পের কবলে সর্ব্বদাই প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে; আবার উহারাও আমাকে গ্রাস করিতে চায়। কিন্তু মা! এই চারিদিন নয়নের দ্বারা তোমারই অনুপম রূপ দেখিতে পাই। অবশ্যই ইহাও সেই নয়নেন্দ্রিয়ের বিষয়-সেই রূপই বটে, এবং সাধারণ রূপ লাবণ্য দেখিয়া নয়ন যেরূপ পরিতৃপ্তি লাভ করে, তদপেক্ষায় সহস্র কিম্বা অনন্ত গুণ তৃপ্তিসুখের অনুভব করে, তথাপি এই রূপের মধ্যে তোমাকে দেখিতে পাই বলিয়া উহা আমাকে সেই শঙ্খিনী সর্পের ন্যায় গ্রাস না করিয়া যেন অপূর্ব্ব অমৃতময় লোকে উন্নীত করে। তৎপর এই চারি দিন পর্য্যন্ত যে, মা, তোর প্রসাদ গ্রহণ করি, তদ্দ্বারাও রসনেন্দ্রিয় চরিতার্থ হয় সত্য, এবং ঐ প্রসাদের রসও সেই রসই বটে, কিন্তু মা! তোর প্রসাদ বলিয়া উহা আমাকে সাধারণ খাদ্যরসের ন্যায় অধোদিকে প্রত্যাকৃষ্ট করিতে পারেনা, প্রত্যুত আনন্দময় লোকের অধিকারী করে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তোর গুণের গান শুনিলে, উহা চিত্তবিমোহকারী মধুর ধ্বনি হইলেও, অন্যান্য সঙ্গীতের ন্যায় রজ ও তমোগুণের কবলে নিক্ষিপ্ত করিতে পারে না, অথচ শ্রবণেন্দ্রিয় অতি অনুপম আনন্দে অভিষিক্ত হয়। এইরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মা! তোর ভাবের বিমিশ্রণ থাকাতে কোন আপদই আমাকে সংস্পর্শ করিতে পারে না। অতএব যদি সর্ব্বদাই এইরূপে তোমায় দেখিতে পাই, তবে আর এ অরণ্যে কাহাকেও গ্রাহ্য করি না। কিন্তু মা! তোকে না দেখিতে পাইলে, এই অরণ্য মধ্যে সমস্তই আমার রিপু।

জগদম্বা।—ভোলাদাস! তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি নয়ন মুদ্রিত করিলে যেমন আমাকে দেখিতে পাও, এখন হইতে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বাহিরেও যে দেকে তাকাও, সেই দিকেই সর্ব্বদা আমাকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু তুমি এক কার্য্য করিও, তুমি আমার এক খানি প্রতিমা গঠন করিয়া লও, এবং প্রতিদিনই গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবিদ্য ও ভোগাদি দ্বারা অর্চ্চনা কর, তাহা হইলে ঐ সকল উপহার আহরনের নিমিত্ত তোমার হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিও উহাতেই নিয়ত থাকিবে। এবং রসনা, নয়ন, ঘ্রাণ, ও শ্রবণাদি সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ও যথোচিত চরিতার্থ হইবে, আবার শরীরযাত্রাও চলিবে, অথচ ঐ সকল বিষয় তোমাকে রজ ও তমোগুণের উত্তেজনা করিয়া দোষাবহ ভাবে বিলিপ্ত করিতে পারিবে না। যেমন এই চারি দিনের অবস্থার কথা বলিলে, এই অবস্থায়ই সর্ব্বদা থাকিতে পারিবে। কাল হইতে, তুমি খাদ্য বস্তু প্রভৃতির আহরণের নিমিত্ত যত প্রকার চেষ্টা করিবে, তৎসমস্তই আমার নিমিত্ত করিতেছ, এইরূপ নিশ্চয় ধারণা মনে রাখিও তবে যমও তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

ভোলাদাস। মা! বাবা (মহাদেব) বলিয়াছে যে, এ সংসারের সকলেই তোর ছেলে—

জগদম্বা।—তাহাই সত্য, তার পর?

ভোলাদাস। তুই কি সকলকেই সমান ভাল বাসিস্?

জগদম্বা। কীট পতঙ্গ অবধি দেবগণ পর্য্যন্ত সকলকেই আমি সমভাবে দেখিয়া থাকি।

ভোলাদাস। তবে এরূপ হয় কেন, অনেকে সম্বৎসরের মধ্যে এই চারি দিনের নিমিত্তও তোকে দেখিতে পায় না কেন? আমি জানি অনেকে তোকে দেখিতে আসিয়া কেবল মাটির পুত্তল দেখে, তাহারা বলে, ওটা, মাটির পুতুল, উহা কুম্ভকারে গড়িয়া রাখিয়াছে। হ্যাঁ মা! তোর এই অজর, অমর অমৃতময় দেহের মধ্যে উহারা মাটি পায় কোথা!! তুই কি উহাদের নিকট মাটীর পুত্তলের ন্যায় অচেতন হইয়া থাকিস, কিম্বা উহাদের চক্ষুর পীড়া বশতঃ ঐরূপ দেখিয়া থাকে?

জগদম্বা। আমি উহাদের উপর কোপ করিয়া দেখা দিই না, তাহা নহে, কিম্বা অচেতন হইয়াও থাকি না, কিন্তু উহারাই আমাকে দেখিতে

চায় না, তাই দেখা পায় না, সুতরাং মাটির পুত্তল মাত্রই দর্শন করিয়া থাকে, অতএব ইহা উহাদেরই দোষ।

ভোলাদাস। তবে তাহারা না দেখিল, কিন্তু যাহারা কত অর্থব্যয়, কত পরিশ্রম করিয়া তোকে বৎসরান্তে আনে, তাহারা কি সকলেই তোকে দেখে? আবার আর এক কথা, মা। তুই কতবার (চণ্ডীতে) বলিয়াছিস যে তোকে পূজা করিলে আর কোন প্রকার অশুভ হইতে পারে না এবং অন্তেও সে তোরই নিকট থাকে, তৎপর বেদ বেদান্তাদি সকলেই ইহার সাক্ষ্য দিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কোন ফলই দেখিতে পাই না কেন?

জগদম্বা। ভোলাদাস! উহারাও প্রায়ই আমায় দেখিতে চায় না, সুতরাং মাটির পুত্তলই দেখে এবং আমার পূজাও করে না, যাহা করে, উহা কেবল ওদের রুচির অনুযায়ী একটা ক্রীড়াবিশেষ; অতএব আমাকে দেখিতেও পায় না। পূজার ফলও লাভ করিতে পারে না। ঐ দেখ এই গ্রামে রমণীদাস আড্ডীর বাড়ী পূজা হইতেছে। উহার এই ব্যাপারে ২০০০ টাকা ব্যয় হয়, তন্মধ্যে পূজা বাবদে ১৫ টাকা মাত্র, আর সমস্তই বেশ্যা, মদ ও আলোর জন্য। ভোলাদস! "অর্চ্চকস্য তপো যোগাদর্চ্চন স্যাতি শায়নাৎ। অভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্য মৃচ্ছতি।" যে পূজাতে অর্চ্চকের তপস্যা যোগ থাকে এবং অর্চ্চনাটিও অতিশয়িতরূপে হয়, আর প্রতিমাখানিও সর্ব্বাঙ্গ হয় অর্থাৎ দেবভাব প্রকাশক হয়, সেই পূজাতেই দেবতার সন্নিধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ নরাধমের পূজাতে উহার কিছুই নাই। ঐ দেখ, উহার পুরোহিত বুধরাম ভট্টাচার্য্যের অবস্থা। বুধরাম গায়ত্রী বা আচমনটাও অবগত নহে, তাহাতে আবার অতিশয় কদাচারতৎপর এবং নিতান্ত অশুচি, মিথ্যাবাদী, বঞ্চক ও সমস্ত প্রকার কুপ্রবৃত্তির আধার এবং ঈশ্বর ও ধর্ম্মেতে বিশ্বাসবিহীন, অধিক কি, উহার যদি পৌরহিত্য ব্যবসা না থাকিত, তবে কুক্কুট গোমাংসাদি ভক্ষণেও নিবৃত্ত থাকিত না, কিন্তু এইক্ষণে প্রকাশিত মতে ঐ সকল কার্য্য করিতে গেলে উহার যজমান থাকিবে না, সুতরাং জীবিকার ব্যাঘাত হইবে, তাই প্রকাশিত ভাবে ঐসকল কার্য্য করিতেছে না। এইরূপ দুরাত্মা আমার মণ্ডপের নিকট আসিলেও তৎক্ষণাৎ আমি সেথান হইতে অন্তর্হিতা হই।

তৎপর যে নরাধম পূজার কর্ত্তা, উহার প্রকৃতি আরও ভয়াবহ, উহাকে মূর্ত্তিমান পাপপুরুষ বলিলেই হয়। উহার আমার প্রতি কিছুমাত্র শ্রাদ্ধা ভক্তি বা বিশ্বাস নাই; ও কেবল কতকগুলি বেশ্যা এবং ভণ্ড পাষণ্ড লইয়া নানাপ্রকার পাশব আমোদ প্রমোদ এবং নাম লাভ করিবে বলিয়াই আমার একটা মূর্ত্তি খাড়া করিয়াছে, ঈদৃশ নরাধমের বাড়ী আমি কখনই অধিষ্ঠিতা হই না। ঐ দেখ, উহার অদ্ভুত পূজা প্রণালী, ও আমার এই প্রতিমাটা সাজানের নিমিত্ত ৫০০৲ টাকার রাংতা, চুমকী, অভ্র, তবক ইত্যাদি আনিয়াছে। কিন্তু আমার পূজার নিমিত্ত ২৷৹ গজী ৮ খানি শাড়ী এইরূপ নৈবেদ্যাদি উপহার, সম্বন্ধেও জানিবে। ভোলাদাস! ঐ দেখ, আমার প্রতিমূর্ত্তিটিকে কি অদ্ভুত বেশে সাজাইরাছে, উহাতে দেবভাবের লেশমাত্রও নাই, উহা ঘোর রজ এবং তমোভাব প্রকাশক মনুষ্যাকৃতি মাত্র, অতএব উহাতে অধিষ্ঠান করিতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। ভোলাদাস! এইরূপ কর্ত্তাকে অসুর কর্ত্তা বলে, এইরূপ যজ্ঞ ও পূজাকে তামস যজ্ঞ ও তামস কর্ম্ম, এবং অসৎ কর্ম্ম বলে। সুতরাং উহা আমার পূজার মধ্যেই গণ্য নহে, তাই উহার সমুচিত ফললাভ হয় না, প্রত্যুত আমাকে লইয়া ঐরূপ খেলা করা নিবন্ধন উহাদের অধোগতি এবং ভয়ানক নরকযাতনা, আর ইহকালেও সর্ব্বনাশ ঘটে।

ভোলদাস। মা! অসুরকর্ত্তা এবং তামস যজ্ঞাদির কথা আমায় আর একটু বল, নতুবা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না।

জগদম্বা। ভোলাদাস! এ কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইতে অনেকটা সময় অতীত হইবে, কিন্তু এইক্ষণে আমার তত সময় নাই, তবে আমি কৃষ্ণাবতার গ্রহণ করিয়া শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত; অতএব সেই টুকুই তোমাকে এখন বলিতেছি,—অর্জ্জুনকে আমি এই বলিয়াছিলাম যে,—

"কামামাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমান মদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগ পরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১॥
আশাপাশ শতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধ পরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২॥

ইদমদ্য ময়ালব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথং।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥
অসৌময়াহতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্‌সুখী ॥ ১৪ ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া।
যক্ষ্যেদাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান বিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃকামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥
আত্মসম্ভাবিতাস্তব্ধা ধনমান মদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধি পূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥
অহঙ্কারং বলংদর্পং কামংক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মমাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়াততো যান্ত্যধমাংগতিং ॥ ২০ ॥

যাহারা অসুর তাহারা এই সকল লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে, এই লক্ষণ দেখিলেই তাহাদিগকে অসুরাকৃতি মনুষ্যেরা অতি দম্ভ, মান ও মদান্বিত হইয়া থাকে, দুষ্পূর অভিলাষের আশ্রয় লইয়া মোহপরবশে নানা প্রকার অসদুপায়ের অবলম্বন করে এবং তদ্দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকে, আর অত্যন্ত অশুচিব্রত হয়—(১০)। মরণকাল পর্য্যন্ত ইহারা অপরিমেয় বিষয়ার্জ্জন ও সংরক্ষণ-চিন্তাতেই ব্রিত থাকে, এবং কেবল বিষয় ভোগকেই অত্যন্ত সারপদার্থ বলিয়া মনে করে (১১)। ইহারা শত শত আশাপাশ দ্বারা নিবদ্ধ থাকিয়া ঘোর কাম ক্রোধ পরবশে নানাবিধ কাম্য ভোগের নিমিত্ত অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহারা অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া সর্ব্বদা কেবল "অদ্য এই লাভ করিলাম, কল্য অমুক মনোরথ পরিপূরণ করিব, আজ আমার এই সম্পত্তি আছে, পরে আমার এত হইবে, এই শত্রুকে আজ দমন করা গেল, অন্য শত্রুগণকেও এইরূপে পরাজিত ও নিহত করিব, আমি অত্যন্ত প্রভুত্বশালী, আমি ভোগী, আমি একজন জগতের মধ্যে সম্পৎশালী ও মহাকুলীন, এই সংসারে মৎসদৃশ্য কে আছে, আমি শত শত দান ও যজ্ঞ করিয়া যশ প্রতিভাদি দ্বারা সকলের উপরিস্থ হইব তখন কি অতুল আনন্দই হইবে" ইত্যাদি রূপ অসংখ্য কুকার্য্য ও কুপ্রবৃত্তির সেবক হইয়া থাকে (১২ ১৩ ১৪ ১৫।);

উক্ত কামোপভোগ প্রসক্ত ব্যক্তিগণ ঐরূপ বিবিধ কুসংস্কারদ্বারা ভ্রান্ত ও মোহজালে সমাবৃত্ত হইয়া ঘোর ও অশুচি নরকে নিপতিত হয়। যদি মনে কর যে উহাদের মধ্যে যাহারা কথিত ভাবে দান যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে তাহাদের নরক হইবে কেন, পরন্তু তত্তৎদান ও যজ্ঞাদি দ্বারা উহাদের স্বর্গ হওয়াই উচিত তাহা তোমার ভ্রান্তি; কারণ উহারা আপনাপনি আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া দম্ভ সহকারে ঐ সকল কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে (১৭) উহারা অহঙ্কার, বল, দর্প কাম ও ক্রোধের আশ্রয় লইয়া উহাদের দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী আমাকে (ঈশ্বরকে) বিদ্বেষ পূর্ব্বক অসূয়া করিয়া থাকে। ঈদৃশ ক্রূরমনা ঈশ্বর বিদ্বেষক অশুভদর্শী নরাধমদিগকে আমি সর্ব্বদা এই সংসারে আসুর-যোনিতে নিক্ষেপ করি; হে কৌন্তেয়!' ঐ মূঢ় ব্যক্তিগণ জন্মে জন্মেই অসুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে লাভ করিতে না পারিয়া নানা প্রকার অধমাগতি প্রাপ্ত হয় (২০)"। (ষোড়শ অঃ) এই হইল অসুর কর্ত্তার কথা এখন তামস যজ্ঞ সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলাম শুন;—

"বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীন মদক্ষিণং।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥

যে যজ্ঞ বিধিহীন, অন্নদান বিহীন, মন্ত্রবিহীন ও উপযুক্ত দক্ষিণাবিহীন এবং শ্রদ্ধাবিরহিত তাহাকে তামস যজ্ঞ বলে।" ১৩। (সপ্তদশ অঃ) অতঃপর অসৎকর্ম্ম কাহাকে বলে তাহাও শুন,—

"অশ্রদ্ধয়াহুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ নচতৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

যে যজ্ঞ, যে দান, যে তপস্যা অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক কৃত হইয়া থাকে, তাহাকে "অসৎ" বলে। তাদৃশ কার্য্যের দ্বারা না ইহকালে কোন ফল সাধন হয়, না পরকালেই কোন ফল সিদ্ধি হয়। অতএব হে অর্জ্জুন! তোমার যেন তাদৃশ মতি কখনই না হয়। ২৮।" (সঃ দঃ অঃ)।

এখন তামস কর্ম্ম যাহাকে বলিয়াছিলাম শুন,—

"অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষং।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥"

ভবিষ্যতের অশুভ ফল, এবং শক্তিক্ষয়, অর্থক্ষয়, আর পরিজনাদির ক্ষয়, প্রাণী হিংসা এবং আত্মসামর্থ্যাদি পর্য্যালোচনা না করিয়া অজ্ঞান, অবিবেক বশে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহাকে তামস ক্রিয়া বলে।" ২৫। (অঃ দঃ অঃ)।

পূর্ব্বে অসুর কর্ত্তার কথা বলিয়াছি, এখন তামস কর্ত্তার লক্ষণ শুন,—

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠোনৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘ সূত্রীচ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

যে ব্যক্তি অত্যন্ত অসমাহিত অর্থাৎ কোন কার্য্যতেই বিশেষরূপ মনঃসমাধান নাই, যাহার বুদ্ধি অত্যন্ত অসংস্কৃত অর্থাৎ নৈপুণ্য সহকারে বিচার না করিয়া প্রকৃতি বশে যে কোন প্রবৃত্তি মনোমধ্যে উদিত হয়, তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া ফেলে, পর্য্যালোচনাদি দ্বারা জ্ঞান কিছু মাত্র পরিমার্জ্জিত হয় নাই। সদুপদেশের দ্বারা যাহাদিগকে কোন প্রকারেই নমান যায় না, অর্থাৎ অন্তঃসারবিহীন, মায়াবী (অন্তঃকরণের ভাব গোপন করিয়া বাহিরে অন্যরূপ ব্যবহার করে) এবং পরবৃত্তিচ্ছেদনতৎপর, চিন্তা প্রভৃতিতে অলস, সর্ব্বদা অবসন্ন ভাব, আর দীর্ঘসূত্রী, এ প্রকার কর্ত্তাকে তামস কর্ত্তা কহে (২৮)। (অঃ দঃ অঃ)।"

এই কথাই আমি অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছিলাম। অতএব এইরূপ অসুরভাবাপন্ন তামস কর্ত্তা দ্বারা যে তামস যজ্ঞ বা উপাসনাদি কার্য্য হইয়া থাকে তাহা আমার অগ্রাহ্য।

ভোলাদাস। মা! তোর অমৃতবর্ষী দয়ামাখা হৃদয়ের মধ্যে কি রাগও আছে?

জগদম্বা। না ভোলাদাস, আমার কাহারও উপর রাগ হইতে পারে না।

ভোলাদাস। তবে যে বলিলি রমণীদাস আড্ডীর মত আসুরিক পূজা করিলে তাহার ইহকালেও সর্ব্বনাশ করিয়া আবার অন্তেও ঘোরতর নরকে ফেলিয়া দিশ?

জগদম্বা। আমি রাগ করিয়া উহাদের সর্ব্বনাশ করি না, নরকেও ফেলি না। কিন্তু উহারাই তাহা প্রার্থনা করে, তাই আমি ঐরূপ ফল দিই; কারণ আমি কল্পতরু স্বরূপা, আমার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই তাহাকে দিই এবং আমি বহুরূপিণী, আমাকে যে যেভাবে উপাসনা করে সেইভাবে তাহার নিকট অধিষ্ঠিত হইয়া তদনুযায়ী ফল দিয়া থাকি।

ভোলাদাস। মা! ভোলা কি তোর সত্যই খেপা ছেলে?

জগদম্বা। না বাবা, তোমাকে যে খেপা বলে সেই বাস্তবিক পাগল, তুমি আমার সুবুদ্ধি ছেলে।

ভোলাদাস। তবে যে বলিলি—"যে সর্ব্বনাশ ও নরকবাস প্রার্থনা করে, তাহাকে উহাই দিই"। মা! সর্ব্বনাশ নরকবাস কি কেহ কখন প্রার্থনা করে?

জগদম্বা। হ্যাঁ তাহাই করে, কিন্তু কথাটী একটু জটিল হইবে তুমি বুঝিতে পারিবে তো?

ভোলাদাস। তুই বুঝাইলেই বুঝিতে পারিব।

জগদম্বা। মানুষের মনের মধ্যে ভাল মন্দ যত প্রকার প্রবৃত্তি বা শক্তি বা প্রকৃতি আছে তৎসমস্তই আমার এক একটী রূপান্তর মাত্র। আমিই সকলের হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি রূপে অবস্থিতি করি; এবং আমিই শ্রদ্ধা, আমিই শান্তি, আমিই বিবেক, আমিই বৈরাগ্য, আমিই কাম, আমিই ক্রোধ, আমিই হিংসা, আমিই দয়া, আমিই অভিমান, ইত্যাদি সমস্তই আমি। অতএব আমার প্রতিমা গড়িয়া তাহার সঙ্গে বিমিশ্রণ করিয়া ইহার যে কোন ভাবের আরাধনা যে ব্যক্তি করিবে, আমি সেই রূপেই সাক্ষাৎ হইয়া তাহাকে তদনুযায়ী ফল দিয়া থাকি। আমার মূর্ত্তি নিকটে রাখিয়া যে তাহাতে বিমিশ্রিত ভাবে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিবেকাদি শক্তির উপাসনা করে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার হৃদয়ে মূর্ত্তিমতী ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিবেকাদি রূপে আবির্ভূতা হই। এবং আমার ভক্তি বিবেকাদি আকৃতির স্বাভাবিক ক্ষমতাই এইরূপ যে উহারা সাক্ষাতে আবির্ভূত হইলে, জীবকে উন্নত ও স্বর্গবাসী না করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। আবার যাহারা আমার প্রতিমূর্ত্তি নিকটে রাখিয়া তাহার সহিত বিমিশ্রিত ভাবে, বেশ্যা, মদ ও বদমাইসী প্রভৃতি উপকরণের আহরণ পূর্ব্বক, কাম প্রবৃত্তি, মত্ততা প্রবৃত্তি, অভিমান প্রবৃত্তি, দম্ভ প্রবৃত্তি, ঈর্ষ্যা প্রবৃত্তি, ক্রোধ প্রবৃত্তি এবং অন্যান্য নানা প্রকার কুপ্রবৃত্তি স্বরূপ আমার নানাবিধ আকৃতি বা অবস্থা বিশেষের আরাধনা করে অর্থাৎ ঐ সকল প্রবৃত্তি উদ্দীপনার চেষ্টা করে, তাহাদের ঐ উপাসনায় বাধ্য হইয়া আমি এই সকল প্রবৃত্তি রূপেই তাহাদের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূতা হই; এমন কি আমি এতই মূর্ত্তিমতী হইয়া এই সকল প্রবৃত্তি রূপে উহাদিগকে

দর্শন দিই, যে উহারা আমার এই দশভূজা আকৃতির মধ্যেও এই সকল প্রবৃত্তির আকৃতিই বা ভাব সন্দর্শন করে। তুমি আমার যে অবস্থা দেখিতেছ ইহা দেখিতে পায় না, উহারা এতই একাগ্রভাবে আমার ঐ সকল আকৃতির উপাসনা করে যে আমি সম্পূর্ণ মাত্রায় আবির্ভূতা না হইয়া কিছুতেই থাকিতে পারি না। কিন্তু আমার ঐ সকল আকৃতির স্বাভাবিক কর্ত্তব্যকার্য্য জীবকে অধোগত করা। তৎপর পূর্ণমাত্রায় কাম, ক্রোধ, মত্ততা ও অভিমানাদির উপাসনা করিলে সর্ব্বনাশরূপ ফলও তাহারাই দান করিয়া থাকে। অতএব উহারা যখন আমার ঐ সকল আকৃতির প্রাদুর্ভাবের নিমিত্ত আহার নিদ্রাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক অহোরাত্র ব্যাপিয়া ঐরূপ উপাসনা করে তখন, "সর্ব্বনাশ" "নরকবাস" এই কথাটী বলিয়া না হউক, কিন্তু প্রকারান্তরে সর্ব্বনাশই কামনা করা হইল। কারণ ঐ সকল প্রবৃত্তির পূর্ণমাত্রায় আবির্ভাব হওয়া আর সর্ব্বনাশ হওয়া ইহা একই কথা, ইহা একটু চিন্তা করিলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবে। অতএব আমার কোন দোষ হইতে পারে না।

ভোলাদাস। মা! তুই নাকি সকলেরই মনের কথা জানিতে পাইস্, তাই তোকে কেহ ফাকী দিতে পারে না, কিন্তু আমি তো তাহা বুঝি না, সুতরাং রমণীদাস প্রভৃতির বাহিরের আড়ম্বর দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, উহারা বুঝি তোর পূজাই করে, তাই উহাদের ফল লাভ না দেখিয়া সন্দেহ হইয়াছিল। এখন সে সন্দেহ বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মা! কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে তোর প্রকৃত আকৃতির প্রকৃত পূজা করা হয়, তাহাও বলিয়া দে।

জগদম্বা। সাত্ত্বিকশ্রদ্ধা, সাত্ত্বিকভক্তি, সাত্ত্বিকমন ও সাত্ত্বিকজ্ঞান সহকারে, সাত্ত্বিক কর্ত্তা যদি আমাকে সাত্ত্বিক উপাসনা করে, তাহাই আমার প্রকৃত পূজা বা প্রকৃত উপাসনা, তদ্ভিন্ন, রাজসিক শ্রদ্ধা, রাজসিক ভক্তি, রাজসিক মন, ও রাজসিক জ্ঞান সহকারে, রাজসিক কর্ত্তা যদি রাজসিক পূজা করে তাহাও আমি গ্রহণ করি, কিন্তু তাহা সাত্ত্বিক পূজার তুলনায় অতি নীচ। ইহাও আমি শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলাম, "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যা পহৃতং গৃহামি প্রয়তাত্মনঃ (ভঃ গীঃ)। যে ব্যক্তি সংযত চিত্ত এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া অতিশয় ভক্তি সহকারে, আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, ও জলাদি উপহার দ্রব্য অর্পণ করে, সেই ভক্তিদত্ত উপহার আমি সন্তোষ সহকারে গ্রহণ করিয়া থাকি"।

ভোলাদাস। মা! সাত্ত্বিক ও রাজসিক শ্রদ্ধা প্রভৃতি কাহাকে বলে তাহা আমি জানি না।

জগদম্বা।—এবিষয়ও আমি ধনঞ্জয়কেই বলিয়াছিলাম, তাহাই তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর,—"যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষ রক্ষাংসি রাজসাঃ। প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ" (গীতা)। "দেবগণের প্রতি যাহাদের স্বাভাবিক অনুরাগ দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, যাহাদের দেবগণ অপেক্ষায় যক্ষ রাক্ষসগণের প্রতি অধিকতর অনুরাগ থাকে, তাহাদের রাজস শ্রদ্ধা, আর ভূত প্রেতের উপর যাহাদিগের অনুরাগ, তাঁহাদের তামস শ্রদ্ধা বুঝিতে হয়"। অফলা কাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো যইজ্যতে। যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ। অভিসন্ধায়তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈবযৎ ইযাতে ভরত শ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ (ঐ) ঐহিক বা পারত্রিক সকল প্রকার ফল কামনা শূন্য হইয়া কেবল কর্ত্তব্যমাত্র বোধে শাস্ত্রীয় বিধি বিধানানুসারে সমাহিত মনা হইয়া যে পূজাদি করা হয় তাহাকে সাত্ত্বিক যজ্ঞ বা সাত্ত্বিক পূজাদি বলে। আর ইহকাল এবং পরকালের নানা বিধ সুখ সম্পদ কামনা করিয়া কিম্বা নিজের ধার্ম্মিকতাদি প্রতিপাদনের নিমিত্ত শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে পূজাদি করে তাহাকে রাজস পূজা রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে।" "সর্ব্বভূতেষু যে নৈকং ভাবমব্যয় মিক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু, তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্। পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্। বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্। (ঐ) যে জ্ঞান দ্বারা, মৃত্তিকা, পাষাণ জল, বায়ু, বৃক্ষ, লতা, কীট, পশু, পক্ষী, মনুষ্য এবং মেধ্য অমেধ্যাদি সমস্ত বস্তুতেই এক অদ্বিতীয় নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব পরমাত্মার অবলোকন করে সেই জ্ঞানকে সত্ত্বিকজ্ঞান বলিয়া জানিবে, আর যে জ্ঞানের দ্বারা জীবাত্মা এবং পরমাত্মার পার্থক্য দেখিতে পায়, যে জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা অবলোকন করে, কিন্তু দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য অনুভব হয় সেই জ্ঞানকে রাজস জ্ঞান বলিয়া জানিবে।" "প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্য ভয়াভয়ে। বন্ধং মোক্ষঞ্চ যাবেত্তি বুদ্ধিঃ সাপার্থ! সাত্ত্বিকা। যয়াধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেবচ। অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃসা পার্থ রাজসী। (ঐ) যে মনের দ্বারা সংসার বন্ধনের কারণ এবং মুক্তি সাধনের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, যে মনের দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় জানা যায়, যে মনের দ্বারা পাপ ও পুণ্যের তত্ত্ব অবগত

হওয়া যায়, যে মনের দ্বারা বন্ধনতত্ত্ব এবং মুক্তিতত্ত্ব জানাযায়, তাহাকে সাত্বিক মন বলে। যে মনের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্যের গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু অন্যরূপে মলিন ভাবে বুঝিয়া থাকে অর্থাৎ কেবল মাত্র ঐহিক পারত্রিক সুখসাধক বিহিত অনুষ্ঠানকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া জানে সেই বুদ্ধিকে রাজস বুদ্ধি বলে।” “মুক্ত সঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎ সাহ সমন্বিতঃ। সিদ্ধ্য সিদ্ধ্যো নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্বিক উচ্যতে। রাগীকর্ম্ম ফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোহশুচিঃ। হর্ষসোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। (ঐ) সুখ বা সুখজনক বিষয়ে যাঁহার কিছুমাত্র আসক্তি না থাকে এবং দুঃখ আর দুঃখ জনক বিষয়ে কিছুমাত্র বিদ্বেষ ভাব না থাকে, দেহ এবং পুত্র কলত্রাদিতে যাঁহার ‘অহং—মদীয়ত্ব ভাব” না থাকে, যিনি অতিশয় ধৈর্য্য ও উৎসাহ সম্পন্ন, লাভ এবং অলাভেতে যাঁহার কিছু-মাত্র চিত্ত বিকার না হয় তাঁহাকে সাত্বিক কর্ত্তা বলে। যিনি সুখ আর সুখসাধন বিষয়ে অনুরাগী, যিনি কর্ম্মফলের অভিলাষী, যথাশাস্ত্র দানে প্রবৃত্তি বিরহিত, যিনি পরপীড়ন স্বভাব, যাঁহার অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি নাই, যিনি লাভে সন্তুষ্ট এবং অলাভে দুঃখী হইয়া থাকেন, তাঁহাকে রাজস কর্ত্তা বলে।” ইহাই সাত্বিক শ্রদ্ধাদির লক্ষণ। উক্ত সাত্বিক শ্রদ্ধাদি সহকারে যে আমার পূজা করে তাহাকে সাত্বিক পূজা বলে, আর রাজ-সিক শ্রদ্ধাদির সহিত যে পূজা করে তাহা রাজসিক পূজা বলিয়া জানিবে।

ভোলাদাস।—মা! তোর সাত্বিক পূজা করলেই বা কি ফল হয়, আর রাজসিক পূজা করিলেই বা কিরূপ ফল হয় তাহা আমি জানি না।

জগদম্বা। সাত্বিকী পূজার দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধি হইয়া তত্ত্বজ্ঞান কিম্বা অহৈতুকী ভক্তির বিকাশ হয়, তৎপর আমাকে প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করে। আর রাজসিক পূজা যদি অকৃত্রিম ভক্তি সহকারে যথাশাস্ত্র মন্ত্রোচ্চারণ ও উপহারাদি দ্বারা যথাবিধি সুনিষ্পন্ন হয়, তবে যাহা কামনা করিয়া ঐ পূজা করে সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। যেব্যক্তি ইহকালে ধন, জন, আরোগ্য ও পুত্র কলত্রাদির প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়, যে, প্রভুত্ব ও যশঃ প্রভৃতির কামনা করে সে তাহা পায, এবং পর-কালে যে স্বর্গীয় সুখাদি কামনা করে সে তাহাই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আমাকে

প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহাও আমি অতি বিস্তারমতে শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলাম, তৎপূর্ব্বে শ্রুতিতেও শত শতবার নির্দ্দেশ করিয়াছি, তোমার স্মরণার্থ তাহার দুই একটি উল্লেখ করা যাইতেছে, “কামান্ যঃ কাময়তে মনুষ্যঃ স কামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র। পর্য্যাপ্ত কামশ্চ কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তী।” (শ্রুতি) সুরত রাজা ভোগৈশ্বর্য্যাদি কামনা করিয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত আমার পূজা করিয়াছিল, তাহার সেই কামনাই আমি পরিপূর্ণ করিলাম। সমাধি নামক বৈশ্য নিষ্কাম ভাবে আমার পূজা করিয়াছিল তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক এই ভবব্যাধি হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলাম। এই কথা লোকের অবগতির নিমিত্ত, আমার প্রিয় পুত্র শ্রীমান্ মার্কণ্ডেয়, চণ্ডীর মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। “ততো বব্রে নৃপো রাজ্য মবিভ্রংস্য ন্যজন্মনি। অত্রচৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বসাৎ। “সোপি বৈশ্য স্ততোজ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিন্ন মানসঃ। মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গ বিচ্যুতিকারকং।” “ইতি দত্ত্বা তয়োর্দ্দেবী যথাভিলষিতং বরং। বভূবান্তর্হিতা সদ্যোভক্ত্যা তাভ্যা মভিষ্টুতাং (চণ্ডী)।

ভোলাদাস। মা! যে পূজা করিলে তোকে পায় সেই সাত্বিক পূজাইতো সর্ব্বাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ, কারণ তোকে পাইলে ভব-বন্ধন ছাড়িয়া যায়, তবে সেই পূজা রাখিয়া, তুই বেদ বেদান্তাদিও অনেক স্থানে রাজস পূজা করিতে বলিলি কেন? সকলেই সাত্বিক পূজা করিলেই ত ভাল হয়।

জগদম্বা। ভোলাদাস! বাস্তবিক পক্ষে সাত্বিক পূজাই সর্ব্বাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ তাহা সত্য, কিন্তু সকলের তাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয় না, সকলের তাহাতে অধিকার নাই, করিতেও পারে না, এজন্য এক এক প্রকার লোকের নিমিত্ত আমি এক এক প্রকার পূজা করা বিহিত করিয়াছি।

ভোলাদাস। মা! ইহাতো আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, চিনি কি কাহার অম্ল লাগে, না ঘৃতই কাহার কটু লাগে, চিনি সকলের পক্ষেই মিষ্ট, ঘৃত সকলেরই প্রিয়। তোরে পাইয়া, মুক্তিও তেমনই সকলের প্রিয়, সকলেরই মিষ্ঠ, তাহাতে আবার অধিকারী অনধিকারী কি?

জগদম্বা। হ্যাঁ, ভোলাদাস, তাহাতেও অধিকারী অনধিকারী আছে; চিনি এবং ঘৃত কখনও অম্ল কটু হয় না সত্য, কিন্তু প্রকৃতিভেদে প্রিয় অপ্রিয়

হইয়া থাকে; ঐ দেখ, ঐ দুগ্ধপায়ী শিশুটি, চিনি গুড় বড় একটা ভাল বাসে না বরং অম্লরসকেই অধিকতর প্রিয় মনেকরে, আবার ঐ দেখ, ঐ ধাঙ্গর বাগদী প্রভৃতি শারীরিক শ্রমজীবী মনুষ্যগুলি গব্যঘৃত অপেক্ষায় মাংসাদি দ্রব্যই অধিকতর প্রিয় মনে করে। আমার সাত্ত্বিক এবং রাজসিকাদি পূজাও সেইরূপ প্রকৃতি ভেদে প্রিয় ও অপ্রিয় হইয়া থাকে, কাহার বা সাত্ত্বিক পূজাই প্রিয় বলিয়া মনে হয় কাহার রাজসিক পূজা প্রিয় হইয়া থাকে; সুতরাং সকলেই আমার সাত্ত্বিক পূজার অধিকারী হয় না, আবার রাজসিকাদি পূজার অধিকারীও সকলে নহে। উপদেশ বা অনুরোধের দ্বারা অপ্রিয় বস্তুকে প্রিয় বা অনধিকারীকে অধিকারী করিয়া তোলা যায় না। লোকের প্রকৃতি কখনও উপদেশ বা অনুরোধ দ্বারা বাধিত বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। তাই আমি পৃথক পৃথক প্রকৃতি ও পৃথক পৃথক অধিকার অনুসারে সাত্ত্বিক ও রাজসিকাদি পূজার বিধি করিয়াছি। প্রকৃতি যে বিষয় অনুমোদন করে না, যাহাতে অধিকার নাই তাহা করিতে গেলে কিছু মাত্র ইষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে না প্রত্যুত ঘোর অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রকৃতি ও অধিকার ভেদে নানা প্রকার পূজাবিধি অনুমতি করিয়া আমি জীবের পরম উপকারই করিয়াছি। ভোলাদাস! তুমি আমার প্রিয় পুত্র তুমি সমস্তই বুঝিতে পারিবে, অতএব তোমাকে এবিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বলা যাইতেছে। আমার পূজাতে যত প্রকার উপহারের প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বপ্রধান উপহার; যাহার যে পরিমাণে ভক্তি থাকে সেই পরিমাণেই তাহার পূজা হইয়া থাকে, ভক্তি না থাকিয়া যদি পর্ব্বতাকার নৈবেদ্যাদি উপহার সমর্পিত হয় তাহাও আমি গ্রহণ করি না, আর ভক্তি করিয়া যদি কেবল মাত্র তণ্ডুল কণাদ্বারাও আমার অর্চ্চনা করে তাহাও আমি অমৃত জ্ঞানে গ্রহণ করিয়া থাকি। ভক্তির নামান্তর অনুরাগ, আমার প্রতি একান্ত অনুরক্তি হওয়া আর ভক্তি হওয়া এতদুভয় একই কথা। সাধারণের জ্ঞানের নিমিত্ত, প্রিয়তনয় সাণ্ডিল্য ভক্তিমীমাংসা গ্রন্থে এই লক্ষণেই লিখিয়া রাখিয়াছেন "অথাতো ভক্তি জিজ্ঞাসা" "সাপরানুরক্তি-রীশ্বরে।"

অনুরাগ, অনুরোধের দ্রব্য নহে; অনুরোধ কিম্বা উপদেশের দ্বারা কোন বস্তুর উপরে কাহারও অনুরাগ জন্মান যায় না, উহা আপনাপন

প্রকৃতির অনুবর্ত্তী। আপন প্রকৃতি অনুসারে যে বস্তুর উপর যাহার স্বার্থসিদ্ধির কারণতা বোধ থাকে সেই বস্তুর উপরই তাহার অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত জলন্ত দেহাভিমান থাকে অর্থাৎ দেহ হইতে অতিরিক্ত ভাবে আত্মার অস্তিত্ত্ব অনুভূত হয় না যে পর্য্যন্ত তমোগুণেরই অত্যন্ত প্রবলতা থাকে সেই পর্য্যন্ত সমস্ত দুঃখ ও সমস্ত সুখের অভাব অবস্থার এবং আমিত্বের বিনাশ অবস্থার, মুক্তি কখনই অভি-লষিত হইতে পারে না, দৈহিক-সুখ ভোগ, দৈহিক স্বচ্ছন্দতার উপরেই অনুরক্তি থাকে, কিন্তু তদপেক্ষায়ও পরের অনিষ্ট, পরের অপকারাদি বিষয়ে অধিক অনুরাগ থাকে, অর্থাৎ নিজের সুখ বৃদ্ধিতে যে পরিমাণে আনন্দানুভব করে, পরের শ্রীহানি নানা-প্রকার অপকার হইলে তদপেক্ষায় অধিক পরিতোষ লাভ করে অতএব মুক্তি বা নিজ সুখ অপেক্ষায় পরের অনিষ্ট বা অপকারই উহার প্রধানতমস্বার্থ, সুতরাং ঐরূপ ক্রুর মনা ব্যক্তি ঐ স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত যেরূপ একাগ্র ভাবে ডাকিবে মুক্তি বা আত্মসুখের নিমিত্ত তত একাগ্র হইয়া ডাকিতে পারিবে না, এবং উহার যদি বিশ্বাস থাকে যে আমাকে অর্চ্চনা করিলেই আমি উহার ঐ দুরভিসন্ধি সাধন করিয়া দিব, কিম্বা দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাহাতেই আমার প্রতি উহার অধিকতর অনুরক্তি হইবে; আমার ভববন্ধন-মোচনের ক্ষমতা দ্বারা উহার কিছুমাত্র অনুরাগ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহার মধুরতা সে কখনও আস্বাদন করে নাই, এবং তাহা স্বার্থ বলিয়াও পরিগণিত করে না। ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত ও উহার ততটা অনুরাগ হওয়া সম্ভবে না, ভোলাদাস! ভাবিয়া দেখ, এই পৃথিবীতে অনেকেই আমার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকে, যাহারা আমার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে তাহারা আমার ক্ষমতায়ও বিশ্বাস করে, আমি যে ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ ফল দানে সমর্থ তাহা জানে, তথাপি সকল সময় তো সকলে আমাকে ডাকে না, অনুরাগও দেখিতে পাও না, কিন্তু যখন ব্যাধি, মোকদ্দমা, অথবা দারিদ্র্য বা পুত্র কলত্রাদি-ঘটিত কোন প্রকার বিপদে নিপতিত হয় তখনই ঐ সকল স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে ডাকিতে থাকে, তখন বিলক্ষণ অনুরাগও পরিলক্ষিত হয়। আবার তাহার শান্তি হইয়া গেলে আর কিছুই থাকে না, অতএব স্বার্থসাধনই অনুরাগ উৎপত্তির মুখ্যতম কারণ। সংসারের দিকে লক্ষ্য

করিলেও ইহা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পার। সংসারেও, যাহার দ্বারা যে পরিমাণে স্বার্থসিদ্ধি হয় কিম্বা হওয়ার আশা থাকে তাহার প্রতি সেই পরিমাণে অনুরাগ হইয়া থাকে। ভার্য্যা ও পুত্রের দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর স্বার্থসিদ্ধি হয়, সুতরাং ইহাদের উপরেই সর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর অনুরক্তি থাকে, ভ্রাতাদির দ্বারা তদপেক্ষায় অল্পতর স্বার্থসিদ্ধি হয় এজন্য ভার্য্যা পুত্রাদি অপেক্ষায় তাহাদের প্রতি অল্পতর অনুরাগ থাকে, আবার যে পুত্র কলত্রাদি দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি না হয় তাহাদের প্রতিও তাদৃশ অনুরাগ পরিলক্ষিত হয় না, আমার প্রতি অনুরাগ সম্বন্ধেও এই রূপই নিয়ম ; আমার দ্বারা যাহার যতদূর স্বার্থসিদ্ধি হওয়া বিশ্বাস থাকে সে সেই পরিমাণে অনুরাগী হয়। এখন ভাবিয়া দেখ ! আমি যদি কেবল সাত্ত্বিক পূজার বিধান করিতাম ; সাত্ত্বিক কেন ? রাজস পূজারও যদি বিধি থাকিত, আর কেবল মুক্তি এবং স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তির বিষয় মাত্র বলা হইত, তাহা হইলে উক্ত প্রকার তামস প্রকৃতির নরাধম—যে দুরাত্মা সর্ব্বাপেক্ষায় পরানিষ্ট, পরস্ত্রী হানিকেই গুরুতর স্বার্থ বলিয়া মনে করে, সেকি আমার প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগী হইত ? কখনই না। অতএব ঈদৃশ নরপশুর জন্য আমি, তামস ফলদায়ক তামস পূজারই বিধি করিয়াছি, কারণ উহার প্রকৃতি অনুসারে ও ঐ তামস ফললাভের নিমিত্তই আমার প্রতি অনুরাগী বা ভক্তি সম্পন্ন হইবার সম্ভব আছে।

ক্রমশঃ—

বিদেশের অনুকরণে ভারতের কি ক্ষতি ?

অনুকরণ মাত্রেই দোষাবহ নহে। এক ভাবে দেখিলে অনুকরণ নহিলে জগৎ চলে না। আমরা যে দাঁড়াইতে, চলিতে, কথা কহিতে শিখিয়াছি ইহাও অনুকরণের ফল। শিশুকে যদি মনুষ্য সমাজ হইতে অন্তরিত করিয়া কোন পশু সমাজে রাখা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে হয়ত দেখিতে পাইতাম সে হামাগুড়ি দিয়া চলিতেছে ও শোকে, ক্ষোভে, দুঃখে, আহ্লাদে পশুর ন্যায় চীৎকার করিতেছে। সে যেমন দেখিয়াছে তেমনি শিখিয়াছে, আদর্শ যেমন হইবে অনুকৃতিও তদনুরূপ হইবে।

বস্তুতঃ শিশুর মনুষ্যত্ব লাভ একরূপ তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বয়স্ক মনুষ্যের অনুকরণের ফল। শুধু দাড়ান, চলা ফেরা, কথা কওয়া বলিয়া বলিতেছি না,

তির কি প্রভেদ তাহা বুঝিতে পারিলে ইউরোপের অনুকরণে ভারতে কি ক্ষতি তাহা ভাল রূপে বুঝা যাইবে।

যাঁহারা "ধর্ম্মব্যাখ্যা" পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন চতুর্দ্দশটী কারণে মানব প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহার মধ্যে স্থানীয় প্রকৃতি একটী প্রধান কারণ, এমন কি এক স্থানীয়প্রকৃতিই দেশ ভেদে মনুষ্যের প্রকৃতিভেদের মুখ্যতম কারণ বলিলে বলা যাইতে পারে।

অতএব এখন ইংলণ্ডের ও ভারতের স্থানীয় প্রকৃতি যে কিরূপ তাহা একবার পর্য্যালোচনা করা যাউক। ইংলণ্ডের প্রকৃতি সম্বন্ধে একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।" Meditating upon general improvement I often think a great deal about the climate in there parts of the world; and I see that without much husbandry of our means and resources it is difficult for us to be any thing but low burbarians The defficulty of living at all in a cold, damp, destructive climate is great. Socrates went about with very scanty clothing and men praise his wisdom in caring so little for the good in this life. He eats sparingly and of mean food. That is not the way I suspect that we can make a philosoper here." বাস্তবিক শুদ্ধ এক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ইংলণ্ডীয় লোকদিগকে কত পরিশ্রম করিতে হয় ! যেখানে চিরকাল প্রচণ্ডশীত, রাজ্য বিস্তার করিয়া বহিয়াছি, যেখানে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই আকাশ মেঘ ও কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন রহিয়াছে, যেখানে সূর্য্যদেব হতভাগ্য বাঙ্গালী কেরাণী বাবুটীর মত দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কত সন্তর্পণে কত ভয়ে ভয়ে হাজির দিয়া যান, যেখানে একমুষ্টি গমের জন্য প্রকৃতির সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে হয়, সে এক দেশ ; আর যেখানে সূর্য্য প্রদীপ্ত, আকাশ নির্ম্মল, প্রকৃতি যথাক্রমে ষড়্ঋতুর সহিত বর্ত্তমানা, যেখানে অল্প পরিশ্রমে প্রভূত পরিমাণে শস্যোৎপাদিত হয়, যেখানে দয়াময়ী প্রকৃতি আপনিই বিবিধ ফলপুষ্প রত্ন সম্ভার লইয়া দণ্ডায়মানা সে আর এক দেশ। সেখানে প্রকৃতির সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেও এক মুষ্টি শস্য মিলে না ; আর এখানে বহুফলপ্রসূ, অযত্ন সম্ভূত একএকটী বৃক্ষের একএকটী ফলে তিন চারি

করিলেও ইহা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পার। সংসারেও, যাহার দ্বারা যে পরিমাণে স্বার্থসিদ্ধি হয় কিম্বা হওয়ার আশা থাকে তাহার প্রতি সেই পরিমাণে অনুরাগ হইয়া থাকে। ভার্য্যা ও পুত্রের দ্বারা সর্ব্বা-পেক্ষায় অধিকতর স্বার্থসিদ্ধি হয়, সুতরাং ইহাদের উপরেই সর্ব্বা-পেক্ষায় অধিকতর অনুরক্তি থাকে, ভ্রাতাদির দ্বারা তদপেক্ষায় অল্পতর স্বার্থসিদ্ধি হয় এজন্য ভার্য্যা পুত্রাদি অপেক্ষায় তাহাদের প্রতি অল্পতর অনু-রাগ থাকে, আবার যে পুত্র কলত্রাদি দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি না হয় তাহাদের প্রতিও তাদৃশ অনুরাগ পরিলক্ষিত হয় না, আমার প্রতি অনুরাগ সম্বন্ধেও এই রূপই নিয়ম ; আমার দ্বারা যাহার যতদূর স্বার্থসিদ্ধি হওয়া বিশ্বাস থাকে সে সেই পরিমাণে অনুরাগী হয়। এখন ভাবিয়া দেখ ! আমি যদি কেবল সাত্ত্বিক পূজার বিধান করিতাম ; সাত্ত্বিক কেন ? রাজস পূজারও যদি বিধি থাকিত, আর কেবল মুক্তি এবং স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তির বিষয় মাত্র বলা হইত, তাহা হইলে উক্ত প্রকার তামস প্রকৃতির নরাধম—যে দুরাত্মা সর্ব্বাপেক্ষায় পরানিষ্ট, পরস্ত্রী হানিকেই গুরুতর স্বার্থ বলিয়া মনে করে, সেকি আমার প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগী হইত ? কখনই না। অতএব ঈদৃশ নরপশুর জন্য আমি, তামস ফলদায়ক তামস পূজারই বিধি করিয়াছি, কারণ উহার প্রকৃতি অনুসারে ও ঐ তামস ফললাভের নিমিত্তই আমার প্রতি অনুরাগী বা ভক্তি সম্পন্ন হইবার সম্ভব আছে।

ক্রমশঃ—

বিদেশের অনুকরণে ভারতের কি ক্ষতি ?

অনুকরণ মাত্রেই দোষাবহ নহে। এক ভাবে দেখিলে অনুকরণ নহিলে জগৎ চলে না। আমরা যে দাঁড়াইতে, চলিতে, কথা কহিতে শিখিয়াছি ইহাও অনুকরণের ফল। শিশুকে যদি মনুষ্য সমাজ হইতে অন্তরিত করিয়া কোন পশু সমাজে রাখা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে হয়ত দেখিতে পাই-তাম সে হামাগুড়ি দিয়া চলিতেছে ও শোকে, ক্ষোভে, দুঃখে, আহ্লাদে পশুর ন্যায় চীৎকার করিতেছে। সে যেমন দেখিয়াছে তেমনি শিখিয়াছে, আদর্শ যেমন হইবে অনুকৃতিও তদনুরূপ হইবে।

বস্তুতঃ শিশুর মনুষ্যত্ব লাভ একরূপ তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বয়স্থ মনুষ্যের অনুকরণের ফল। শুধু দাড়ান, চলা ফেরা, কথা কওয়া বলিয়া বলিতেছি না,

তির কি প্রভেদ তাহা বুঝিতে পারিলে ইউরোপের অনুকরণে ভারতে কি ক্ষতি তাহা ভাল রূপে বুঝা যাইবে।

যাঁহারা "ধর্ম্মব্যাখ্যা" পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন চতুর্দ্দশটী কারণে মানব প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহার মধ্যে স্থানীয় প্রকৃতি একটী প্রধান কারণ, এমন কি এক স্থানীয়প্রকৃতিই দেশ ভেদে মনুষ্যের প্রকৃতি-ভেদের মুখ্যতম কারণ বলিলে বলা যাইতে পারে।

অতএব এখন ইংলণ্ডের ও ভারতের স্থানীয় প্রকৃতি যে কিরূপ তাহা একবার পর্য্যালোচনা করা যাউক। ইংলণ্ডের প্রকৃতি সম্বন্ধে একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।" Meditating upon general improvement I often think a great deal about the climate in there parts of the world ; and I see that without much husbandry of our means and resourees it is difficult for us to be any thing but low burbarians The defficulty of living at all in a cold, damp, destructive climate is great. Socrates went about with very scauty clothing and men praise his wisdom in caring so little for the good in this life. He eats sparingly and of mean food. That is not the way I suspect that we can make a philosoper h re." বাস্তবিক শুদ্ধ এক গ্রসাচ্ছাদনের জন্য ইংলণ্ডীয় লোকদিগকে কত পরিশ্রম করিতে হয় ! যেখানে চিরকাল প্রচণ্ডশীত, রাজ্য বিস্তার করিয়া বহিয়াছি, যেখানে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই আকাশ মেঘ ও কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন রহিয়াছে, যেখানে সূর্য্যদেব হতভাগ্য বাঙ্গালী কেরাণী বাবুটীর মত দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কত সন্তর্পণে কত ভয়ে ভয়ে হাজির দিয়া যান, যেখানে একমুষ্টি গমের জন্য প্রকৃতির সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে হয়, সে এক দেশ ; আর যেখানে সূর্য্য প্রদীপ্ত, আকাশ নির্ম্মল, প্রকৃতি যথাক্রমে ষড়্ঋতুর সহিত বর্ত্তমানা, যেখানে অল্প পরিশ্রমে প্রভূত পরিমাণে শস্যোৎপাদিত হয়, যেখানে দয়াময়ী প্রকৃতি আপনিই বিবিধ ফলপুষ্প রত্ন সম্ভার লইয়া দণ্ডায়মানা সে আর এক দেশ। সেখানে প্রকৃতির সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেও এক মুষ্টি শস্য মিলে না ; আর এখানে বহুফলপ্রসূ, অযত্ন সম্ভূত একএকটী বৃক্ষের একএকটী ফলে তিন চারি

PAGE(S) MISSING

জন মনুষ্যের উদর পূর্ত্তি হইয়া যায়। সেখানে কিসে দুইটী উদরান্ন সংস্থান করিব, কিসে শীত বাত হইতে শরীরকে রক্ষাকরিব, কিসে বরফে না গলিয়া যাই এজন্য সুন্দর কঠিণ গৃহ নির্ম্মাণ করিব ইত্যাদির জন্য লোকে ব্যস্ত ; এখানে সামান্য ফলে, সামান্য বল্কলে বা কৌপিনে সামান্য বৃক্ষতলাশ্রয়ে সুস্থ শরীরে অবস্থান করা যায়।

প্রকৃতির নিয়মই এই, যেখানে যাহার অভাব সেখানে তাহা নিবারণের চেষ্টা। ইংলণ্ডে বা ইউরোপে বহিরিন্দ্রিয়ের সমস্ত বিষয়ের অভাব, তাই সেই অভাব নিবারণের চেষ্টা, তাই ইউরোপে ভৌতিক বিজ্ঞানের এত উন্নতি। তাই ইউরোপের চিন্তা এত স্থূল বিষয়িণী। যেথানে ইন্দ্রিয়-গণ অনবরত হা হা খাই খাই রবে বিষয়ের প্রতি ধাবমান সেখানে মানব প্রকৃতি কিরূপে স্থূলবিষয়িণী না হইয়া থাকিবে ?

ভারতবর্ষে দেখ, দয়াময়ী প্রকৃতি মাতার ন্যায় যত্নে, স্তরে স্তরে দ্রব্য সম্ভার সাজাইয়া রাখিয়াছেন। সন্তানকে যত্ন করিতে হয় না চেষ্টা করিতে হয় না, তাই এত প্রচুরবিষয়ে তাহার মমতা নাই, তাই তাহার মন, বহির্জগৎ ছাড়িয়া, বহির্জগতে বিরক্ত হইয়া—আর এক জগতে যাইতে ধায়, ও সেই জগতের অভাব অনুভব করিয়া সে অভাব নিবারণ জন্য যত্ন করে। তাই ভারতবর্ষে বাহিরের বিষয়ে ঔদাসীন্য ও অন্তরের বিষয়ে পরমানুরাগ। তাই ভারতবর্ষে যোগ সমাধি ধ্যান ধারণা, তাই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের এত জলন্তরূপে বিকাশ ; ইউরোপ শত চেষ্টা করিয়াও বাহিরের চিন্তা এড়াইতে পারে না, অন্তর্জ্জগতের সংবাদ কোথা হইতে রাখিবে ? তাই তাহাদের নিকট যোগ সমাধি পাগলের কল্পনা বলিয়া বোধ হয়।

তাহা হইলে বুঝা গেল, এক, স্থানীয়প্রকৃতি অনুসারে, দুইস্থানের মানব প্রকৃতির দুই বিভিন্ন প্রকার গতি। ইউরোপীয় মানব প্রকৃতির গতি মাত্রার, অল্প হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে, অধিক পরিমাণে বহির্ম্মুখান ; ভারতবর্ষে ঠিক তাহার বিপরীত। ইউরোপে ব্যুত্থানশক্তি* প্রবল, ভারতে নিরোধশক্তি* প্রবল। ইউরোপের চিন্তা স্থূল বিষয়িণী, ভারতের চিন্তা সূক্ষ্ম বিষয়িণী। ইউরোপ শরীর [illegible] ব্যস্ত, ভারত আত্মা লইয়া [illegible] আনুষ[illegible]

---

* "ধর্ম্মব্যাখ্যা" দেখুন।

তাহার বেশ ভূষা ও অন্তরের শিক্ষা সমস্তই অধিক পরিমাণে অনুকরণের উপর নির্ভর করে। আমরা যে 'ক' 'খ' উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছি তাহাও গুরু মহাশয়ের 'ক' 'খ' উচ্চারণের অনুকরণে। যে যত শিক্ষকের অনুকরণ করিতে পারে সে তত ভাল ছাত্র, যে শিশুর অনুকরণীবৃত্তি যত প্রবল সে ছাত্র তত ভাল। বেশ ভূষা পরিচ্ছদ লইয়া দেখ। আমরা পেণ্টুলান্ চাপকান্ কোরতা না পরিয়া, কাছা কোঁচা দিয়া কাপড় পরি ও উত্তরীয় ব্যবহার করি সে কেবল পিতা, পিতৃব্য, ভ্রাতা ও সমাজস্থ পুরুষের কাপড় পরা দেখিয়া ; আবার এখন পেণ্টুলান্ ধরিতেছি সে আবার আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা সাহেব মহোদয়গণকে দেখিয়া। পূর্ব্বে আমাদের সমাজের অনুকরণ করিয়া "শ্রীচরণাম্বুজেষু" বলিয়া পিতৃদেবকে পত্র লিখিতাম, এক্ষণে সাহেব দিগেয় অনুকরণে "My dear father" বলিয়া ,পিতাকে সম্বোধন করি। এইরূপ প্রত্যেক বিষয়ে দেখিতে হইবে। স্থূল কথায় বলিতে গেলে মনুষ্যত্ব শিক্ষা সাপেক্ষ, ও শিক্ষা অধিক পরিমাণে অনুকরণ সাপেক্ষ। তাহা হইলে হইল, অনুকরণ মাত্রেই দোষাবহ নহে। ভাল জিনিষেয় অনুকরণ করিলে ভাল হয় ও মন্দ জিনিষের অনুকরণ করিলে মন্দ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আদর্শ যে গুণ বিশিষ্ট অনুকৃতও তদনুরূপ গুণ বিশিষ্ট হইবে। অনুকরণের দোষ গুণ বিচার করিতে হইলে যে জিনিষের অনুকরণ হইতেছে তাহার দোষ গুণ বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে এই হইল যে, বিদেশের অনুকরণ ভারতের ক্ষতি বৃদ্ধি বুঝিতে গেলে বিদেশীয় জিনিষের ভাল মন্দ বিচার আবশ্যক।

কোন বিষয়ের দোষ গুণ বিচার করিতে গেলে, সেই বিষয়টী তাহার আনুষঙ্গিক ঘটনা বা বিষয়গুলির সহিত একত্রে বিচার করিতে হয়, নতুবা শুদ্ধ বিষয়গতভাল মন্দ বিচার কোন কার্য্যের নহে। প্রথমতঃ যে যে দোষ ও গুণের কথা হইতেছে তাহাই আপেক্ষিক শব্দ। দোষের সঙ্গে তুলনা করিলেই তবে গুণ গুণ, ও গুণের সঙ্গে তুলনা করিলেই তবে দোষ দোষ ; নতুবা এইরূপ তুলনা ব্যতিরেকে শুধু দোষ গুণ বলিয়া কোন পদার্থ আছে কি না সন্দেহ। তাহার পর যে বিষয়ের দোষ গুণ বিচার হইবে তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় বা ঘটনাবলীর সহিত তাহার সম্বন্ধ আনুসারে তাহার দোষ গুণ দেখিতে হইবে। একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাবলীর সাহচর্য্যে কখনও দোষের কখন বা গুণের হইয়া থাকে।

মনেকর আমাদের শাস্ত্রে মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ, আবার এমন অনেক স্থল আছে যেথনে মিথ্যা কথা বলিতে একরূপ ব্যাবস্থা দিয়াছেন; কেননা সেখানে মিথ্যা কথা বলিলে একটা মহদুপকার সাধিত হইবে ও সেখানে সে মিথ্যা কথা টুকু না বলিলে প্রত্যবায়গ্রস্থ হইতে হইবে। অবশ্যই মিথ্যা বস্তুতঃই দোষের, কিন্তু ঘটনাবলীর সাহচর্য্যে স্থান বিশেষে একরূপ গুণের হইয়া দাঁড়ায়। যেখানে একটা মিথ্যা কথা কহিয়া ব্রহ্মহত্যা নিবারণ করিতে পারা যায় সেখানে সে মিথ্যাকে গুণেরই বলিতে হইবে।

যে উদাহরণ দেওয়া গেল তাহাত একটী বড় কথা। একটা ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক্। এই পেণ্টুলান কোট ব্যবহারের কথা। আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর সহিত তুলনায় এগুলি বিলাতের পক্ষে গুণের কিন্তু ভারতের পক্ষে দোষের। যেখানে বারমাস প্রচণ্ড শীত, যেখানে মনুষ্যগণ কেবল বিষয় কার্য্য লইয়া ব্যস্ত, সেখানে ভাল করিয়া গায়ে আঁটিয়া থাকে এমন কোন পোষাকের দরকার; আর যেখানে নাতিমৃদু নাতিতীব্র ভাবে ষড়ঋতুর সমাগম, অথবা যেখানে গ্রীষ্মেরই প্রাধান্য, ও যেখানে লোকে বাহিরের বিষয় ভুলিয়া আধ্যাত্মিক চিন্তায় যত্নশীল, সেখানে ঐরূপ সর্ব্বশরীরাবরক ও উষ্ণতা বিধায়ক কোন পরিচ্ছদের আবশ্যক হয় না, আবশ্যক হওয়া দূরে থাকুক সেরূপ পরিচ্ছদে সেখানকার লোকের শারীরিক ও আন্তরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ারই সম্ভাবনা। তাহা হইলে দেখা গেল সেই একই পেণ্টুলান কোট বিভিন্ন ঘটনাবলির সাহচয্যে কোথায়ও গুণের এবং কোথায়ও বা দোষের হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপ সকল বিষয় বুঝিতে হইবে।

যতদূর বলা হইল, তাহাতে বুঝা যাইবে বিলাতী জিনিষের ভাল মন্দ দেখিতে হইলে, তাহার আনুষঙ্গিক বিলাতী ঘটনাবলীর সহিত তাহার ভাল মন্দ বিচার করিতে হইবে। আবার সেই জিনিষ ভারতের পক্ষে ভাল মন্দ কিনা তাহা দেখিতে গেলে তাহা আবার ভারতের ঘটনাবলীর সাহচয্যে দেখিতে হইবে। যাহা বিলাতে ভাল তাহা ভারতে ভাল না হইতে পারে আর ঐরূপ যাহা ভারতে ভাল তাহাও বিলাতে না হইতে পারে।

এইরূপ বিচার করিয়া দেখিতে হইলে প্রথমতঃ ইউরোপীয় প্রকৃতি ও ভারতীয় প্রকৃতির বিচার আবশ্যক, কেননা ভাষা বল, পরিচ্ছদ বল, আহার ব্যবহার সামাজিক রীতি নীতি যাহাই কিছু বলনা এমন কি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত দেশীয় প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। ইউরোপীয় প্রকৃতি ও ভারতীয় প্রকৃ-

ভগবান শঙ্করাচার্য্যের পদানুসরণ করিয়াছি, তাঁহারা তাহা করেন নাই। ইহাতে যে কিছু নূতনত্ব তাহাই, আমাদের। আমরা সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সাধুচিন্তাশাল প্রকৃতশাস্ত্রার্থাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের বিচার্য্য। যাঁহারা শাস্ত্রানুমোদিত অনুষ্ঠানসহ শাস্ত্র পাঠ করেন এবং শঙ্করাদি আর্য্যগণের ভাষ্যাদির ভাব গ্রহণে সমর্থ, তাঁহাদের নিকট অনুরোধ যদি তাঁহারা আমাদের ব্যাখ্যায় কোনরূপ ভুল ভ্রান্তি দেখেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া প্রদর্শন করাইলে সাদরে সংশোধন করিয়া দিব। আমাদের গীতার কিরূপ অনুবাদ হইয়াছে পাঠকগণের দর্শনার্থ নিম্নে নমুনা স্বরূপ কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

হে ভারত! ত্রিগুণাত্মিকা বা ত্রিশক্তি স্বরূপ প্রকৃতিকেই আমার (আত্মা বা ব্রহ্মের) যোনি (সন্তানোৎপত্তি স্থান) বলিয়া জানিবে; সেই প্রকৃতিতে আমি গর্ভাধান করিয়া থাকি, তাহা হইতেই সর্ব্ব ভূতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। (ক) অতএব, হে কৌন্তেয়! দেব মনুষ্যাদি কীট

(ক) শ্লোকটিতে অতি গুরুতর কথা নিহিত আছে, সেই মর্ম্ম বিস্তাররূপে বুঝাইতে গেলে দ্বিতীয় একখানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে এজন্য এখানে বলিলাম না, পরন্তু শ্রীযুক্ত তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মব্যাখ্যাতেই ইহা অতি বিস্তার মতে দেখিতে পাইবেন, কিন্তু এই গুরুতর বিষয়টি আপনাদিগকে কিছুমাত্র না বুঝাইয়া একবারে উপেক্ষা করিতেও মনঃকষ্ট অনুভূত হয়, অতএব সঙ্ক্ষেপে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

দুই প্রকার ঘটনা দ্বারা সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার একটিই, এখানে দৃষ্টান্তের অবতারণার নিমিত্ত আবশ্যক হইয়াছে, অতএব সেই একটি প্রণালীই এখানে বলা যাইতেছে। অতীব সূক্ষ্ম, কেবল শক্তি মাত্র স্বরূপে অবস্থিত জীব সকল, ঘটনা ক্রমে, বিবিধ খাদ্য দ্রব্য অথবা নিশ্বাস বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পিতার দেহে প্রবেশ করে, পরে তাহা এমত অভিন্ন ভাবে, পিতার আত্মার সহিত মিশাইয়া যায় যে, কোন প্রকারেও তাহাদের পার্থক্য অনুভব করা যায় না, যেন একবারে একই হইয়া যায়। পরে যখন স্ত্রী আর পুরুষের যোগ হয় তখম ঐ বিলীন শক্তিটুকু আবার বিশ্লিষ্ট হইরা পিতার দেহের অণুমাত্র ভৌতিক পদার্থের আশ্রয় পূর্ব্বক মাতৃ জরায়ুতে প্রবেশ করিয়া, আবার মাতার দেহে একবারে সমবেত হইয়া যায়, পরে মাতা হইতেই দেহের পুষ্টি সাধন পূর্ব্বক, আবার মাতা হইতে বিস্খলিত

পতঙ্গ পর্য্যন্ত নিখিল জাতির মধ্যে যত প্রকার আকৃতি দেখিতেছ তৎ-সমস্তেরই মূল মাতৃস্বরূপা একমাত্র ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, এবং আমিই (আত্মা বা ব্রহ্মই) তাঁহাদের বীজ দাতা পিতা স্বরূপ।

হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এক এক বার মহাপ্রলয়ের পর, ব্রহ্ম আর প্রকৃতি হইতেও ঠিক এইরূপেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মহত্তত্ব হইতে পৃথিব্যাদি যত প্রকার জন্য পদার্থ আছে এতৎ সমস্তই, মহাপ্রলয় কালে ত্রিগুণাত্মিকা বা ত্রিশক্তিস্বরূপা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, তখন কোন প্রকার জন্য বস্তরই অস্তিত্ব থাকে না, একমাত্র প্রকৃতিই বিদ্যমানা থাকেন। কিন্তু সেই প্রকৃতিও চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত অভেদভাবে মিশাইয়া যায়। প্রত্যেক জীবের পৃথক্ পৃথক্ জীবনী শক্তি আছে তাহাও ঐ প্রকৃতিতেই বিলীন হইয়া যায়, কারণ উহাও প্রকৃতির জন্য পদার্থ। এদিকে প্রত্যেক জীবের অবলম্বন স্বরূপ বা আত্মা স্বরূপ যে পৃথক্ পৃথক্ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত চৈতন্যের অনুভব হইতেছে, তৎসমস্তই সেই অপরিমিত চৈতন্য সমুদ্রে এক হইয়া যায়, ইহাদের কিছুমাত্র পার্থক্যের অনুভব হয় না, তখন একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান থাকেন। পরে যখন মহাপ্রলয়ের অবসান হয়, তখন ঐ মায়া বা ত্রিগুণাত্মিকা অথবা ত্রিশক্তিস্বরূপা প্রকৃতির সহিত ঐ চৈতন্য স্বরূপ আত্মা বা পুরুষের পূর্ব্বোক্ত অধ্যাস স্বরূপ সংযোগ থাকাতে, সেই পূর্ব্ব বিলীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত জীব চৈতন্যগুলি সেই সুবৃহৎ চৈতন্যস্বরূপ পিতা হইতে যেন পৃথক্‌ভূত হইয়া পড়ে। তখন তাহারা সেই পূর্ব্ব বিলীন আপন আপন জীবনী শক্তিও গ্রহণ করে এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি স্বরূপা মাতাতে সমবেত হইয়া যায়, এই হইল প্রকৃতি গর্ভাধান ব্যাপার। পরে ঐ প্রকৃতি হইতেই, জ্ঞান শক্তি, ক্রিয়াশক্তি, এবং পোষণশক্তি সংমিশ্রিত বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়াদি শক্তির সংগ্রহ করিয়া অসংখ্য জীবের পৃথক্ পৃথক্ কারণ দেহ বা লিঙ্গ দেহ বা সূক্ষ্ম দেহ সংগঠিত হয়, তখনই পৃথক্ পৃথক্ জীবের জন্ম হইল বলা যায়। তৎপর সেই জীব হইতেই, প্রকৃতির অংশ সকল গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে, ব্রহ্মা অবধি কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী দেহের বিকাশ হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মা বা আত্মাই জগতের পিতা, এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই এই জগতের মাতা। বলা বাহুল্য যে এই গুরুতর বিষয়ের কেবল একটু আভাস মাত্রই এস্থানে প্রদর্শিত হইল, বাস্তবিক ইহার সমস্ত কথাই বর্ণিতে অবশিষ্ট থাকিল।

মানব প্রকৃতিকে বহির্ম্মুখে লইয়া যাইতেছে, ভারতে আনুষঙ্গিক ঘটনা মানব প্রকৃতিকে অন্তর্ম্মুখে লইয়া যাইতেছে। ইউরোপীয় মানব প্রকৃতি অসম্পূর্ণ, ভারতীয় মানব প্রকৃতি সম্পূর্ণ।

যাহা বলা হইল ইহাতেই বুঝা যাইবে ইউরোপের অনুকরণে ভারতের কি ক্ষতি। মনুষ্যের কার্য্যসমস্ত প্রকৃতির অনুযায়ী হইলেই তাহার মঙ্গল। মনুষ্য যদি তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করে, তবে তাহার প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হয় ও তন্নিবন্ধন আয়ুক্ষয়, বীর্য্যক্ষয়, ও বিবিধ অনিষ্ট উৎ-পাদিত হয়। আজি যদি ইউরোপ বহির্ম্মুখীন চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া অন্ত-র্ম্মুখীন চিন্তায় নিবিষ্ট হয়, কালি দেখিবে তাহার বহির্জগতের উন্নতি ত লুপ্ত হইতেছে অথচ অন্তর্জগতেও সে উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না এবং প্রকৃতির অন্যায় নিষ্পীড়নে স্বাস্থ্যভঙ্গ ও বিবিধ অনিষ্ট উৎপাদিত হইতেছে! আমাদের সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। আমারা যদি ইউরোপের অনুবর্ত্তী হই তাহা হইলে আমাদের সূক্ষ্মবিষয়িনী চিন্তাই অভিভূত হইবে স্থূল জগতেও আমরা তত উন্নতি লাভ করিতে পারিব না। প্রত্যুত ধর্ম্মক্ষয়, আয়ুক্ষয় বীর্য্যক্ষয় প্রভৃতি বহুবিধ অনিষ্টের ভাগী হইব।

যাঁহারা ধর্ম্মব্যাখ্যার নিরোধশক্তির বিবরণ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন নিরোধশক্তিই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। ভারতবর্ষ স্বীয় প্রকৃতি গুণেই নিরোধ শক্তির বিকাশ স্থল। আজি যদি আমরা আমাদের প্রকৃত্যানু-মোদিত আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব স্বরূপ সেই নিরোধ শক্তি বিদেশীয় অনুকরণ প্রভাবে হারাইতে বসি তাহা হইলে আমাদের মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে চলিল। ইহাপেক্ষা বিদেশীয় অনুকরণে আর কি অধিক ক্ষতি হইতে পারে?

ইউরোপের ভাষা, ইউরোপের ভাব, ইউরোপের রীতি নীতি সমস্তই ইউরোপীয় প্রকৃতির অনুমোদিত। সেই ভাষায়, সেই ভাবে, সেই রীতি নীতিতে তাহাদের উন্নতি, আমাদের নহে। আমরা যদি সেই ভাষা, সেই ভাব, সেই রীতি নীতি অবলম্বন করি তাহা হইলে ক্রমে আমাদের নিজ প্রকৃতি হারাইতে বসিব, শুধু প্রকৃতি হারাইব তাহা নহে নিজ প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া শীঘ্রই ধ্বংস পুরের পথ পরিষ্কার করিব। ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুজাতির বিনাশ সম্ভব পর হইবে।

যাহা বলা হইল তাহার কোন অংশ কাল্পনিক নহে। অতীতের ইতিহাস ও বর্ত্তমানের ঘটনা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভারতবর্ষে বিদেশী অনুকরণ আজ নূতন হইতেছে না। যে দিন হইতে যবনগণ এই পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছে সেই দিন হইতে ভারতে বিদেশীয় অনুকরণ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মুসলমানদের অনুকরণে ভারতের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা চক্ষুর উপর ধরিয়া দেওয়া কঠিন নহে। আবার যবনের পরে ম্লেচ্ছের অনুকরণে আরও কি কি নূতন অনর্থের উৎপত্তি হইতেছে তাহাও দেখাইয়া দেওয়া কঠিন নহে। বারান্তরে তাহা দেখাইয়া দিবার চেষ্টা রহিল।

শ্রীমদ্ভবদ্গীতা *।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রকাশিত হইল। ইহাতে মূল, শাঙ্করভাষ্য, ও শাঙ্কর ভাষ্যানুমোদিত বিস্তৃত বাঙ্গলা ব্যাখ্যা আছে। পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বাঙ্গালা ব্যাখ্যাটি বিশেষরূপে সংবর্দ্ধিত ও সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি গীতা প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থ এরূপ নানাভাবে নানা রকমে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত হিতলাল মিশ্র মহাশয় প্রথম শ্রীধরস্বামীর অবলম্বনে গীতার বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ যাবৎ যতগুলি গীতানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে (আমাদের বিবেচনায়) মিশ্র মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ সর্ব্বোত্তম বলিতে হইবে। তৎপর আরও অনেকে বঙ্গানুবাদ সহ গীতা প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। যখন এতগুলি বিভিন্ন প্রকার বঙ্গানুবাদ সহ গীতা সমাজে স্থান পাইয়াছে, তখন আমাদের প্রকাশিত গীতাখানিও একটু স্থান পাইতে পারে, এই সাহসে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বঙ্গানুবাদ সহ গীতা প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য অনুবাদের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে আমরা

---

* ৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। মূল্য ও আর ডাঃ মাঃ ২৷৷০ টাকা মাত্র।

এক ও অদ্বিতীয় পরমাত্মাই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরিদৃশ্যমান জীব চৈতন্য অংশস্বরূপ গুলি, উক্ত রূপে প্রকৃতির সহিত সম্বেত হইয়া, কি প্রকারে এই ঘোর সংসার বন্ধনে আবদ্ধ, তাহাও বলাযাইতেছে, —হে মহাবাহো! উক্ত প্রকৃতির তিনটি গুণ বা শক্তি আছে, তাহার একটীর নাম সত্ত্ব, আর একটীর নাম রজ, আর একটীর নাম তমঃ এই তিনটি গুণই বেণী বা রজ্জুর ন্যায় একত্রিত হইয়া নিত্য, বুদ্ধ, শুদ্ধ, মুক্তস্বভাব-সমস্তবিকারশূন্য-আত্মাকে এই দেহ মধ্যে অভিসম্বদ্ধ করে, ইহাকেই বন্ধন করা বলাগিয়া থাকে। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ বা সত্ত্ব শক্তি নিতান্ত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ, এনিমিত্ত উহা মানবের অন্তরে আত্মতত্ত্বের প্রকাশে সমর্থ, এবং প্রাণীর অন্তঃকরণে যত প্রকার বাহ্য বস্তুর জ্ঞান বা প্রকাশ হইয়া থাকে তাহারও কারণ এই সত্ত্বগুণ, তদ্ব্যতীত প্রাণীর যে অকৃত্রিম সুখের অনুভব হইয়া থাকে তাহারও এই সত্ত্ব গুণেরই স্বরূপ বিশেষ; সুতরাং এই সত্ত্বগুণের সহিত আত্মার পূর্ব্বোক্ত অধ্যাসস্বরূপ সংযোগ থাকাতে এই সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম স্বরূপ যে সুখ আর জ্ঞানাদি, তাহা আত্মাতে আরোপিত হইয়া, আত্মাই যেন সুখযুক্ত, আত্মাই যেন জ্ঞান বিশিষ্ট, এইরূপে ভান্ হইয়া থাকে, অতএব হে অনঘ! সত্ত্বগুণ তাহার নিজের ধর্ম্ম সুখ এবং জ্ঞানকে আত্মাতে আরোপিত করিয়া তাহাকে নিবদ্ধ করিল। হে কৌন্তেয়! রজোগুণ বা রজঃ শক্তিকে অনুরাগ বা অভিলাষ স্বরূপ বলিয়া জানিবে, এই রজোগুণ হইতেই অনুরাগ বা সমস্ত প্রকার কামনার বিকাশ হইয়া থাকে। এবং ইহা হইতেই অপ্রাপ্ত বিষয়ের নিমিত্ত তৃষ্ণা, আর প্রাপ্তবিষয় সংরক্ষণের নিমিত্ত আসক্তির উৎপত্তি হয়। এইরূপ ক্ষমতা সম্পন্ন রজঃ শক্তির সহিত আত্মার অধ্যাসিক সম্বন্ধ থাকা নিবন্ধন, এই রজঃশক্তির গুণগুলি আত্মাতে আরোপিত হইয়া, ঐ অনুরাগ, তৃষ্ণাও আসক্তি প্রভৃতি গুণগুলি যেন আত্মারই গুণ বলিয়া ভান্ হইয়া থাকে। আত্মাই যেন অনুরাগী, আত্মাই যেন তৃষ্ণাবান্, আত্মাই যেন আসক্তি সম্পন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। তখন আত্মাতেই যেন "আমি অমুক কার্য্য করিয়া অমুক ফল ভোগ করিব" ইত্যাদি অভিনিবেশ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং এই রূপ ক্রিয়াভিনিবেশের দ্বারা, রজোগুণ আত্মাকে নিবদ্ধ করিয়া থাকে। এখন তমোগুণের কথা শুন,—

প্রকৃতির আবরণ শক্তি হইতে তমোগুণের বিকাশ। ইহাকে সর্ব্বপ্রাণীর মোহজনক, অর্থাৎ অবিবেকের উৎপত্তি দ্বারা ভ্রান্তির উদ্ভাবক বলিয়া জানিবে।

হে ভারত! প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা প্রভৃতি এই তমোগুণের ক্ষমতা। এই সকল ক্ষমতা বা শক্তি, নির্ম্মল আত্মাতে আরোপিত হইয়া আত্মাই যেন মুগ্ধ আত্মাই যেন অলস, আত্মাই যেন প্রমাদশীল, আত্মাই যেন নিদ্রিত ইত্যাদি রূপে ভাস্ হইয়া থাকে; সুতরাং তথাবিধ ব্যবহারও হয়, অতএব প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রাদি শক্তির দ্বারা তমোগুণ আত্মাকে নিবদ্ধ করিয়া থাকে। হে ভারত! এই তিন শ্লোকের ফলিতার্থ এই যে, সত্ত্বশক্তি আত্মাকে সুখেতে সংশ্লিষ্ট করে, রজঃশক্তি ক্রিয়াতে সংশ্লিষ্ট করে, আর তমঃশক্তি, জ্ঞানশক্তি আবরণ পূর্ব্বক প্রমাদাদি অবস্থায় সংশ্লিষ্ট করে।

উক্ত সত্ব, রজ, আর তমঃশক্তি, ঠিক এক সময়েই একত্র সমভাবে লব্ধাস্পদ হয় না। ইহারা আপন বলের পরিমাণানুসারে অপর দুটিকে অভিভব করিয়া উত্তেজিত হয়। সত্ত্বগুণ যখন পূর্ণ মাত্রায় উত্তেজিত হয় তখন রজ আর তমঃশক্তিকে পূর্ণমাত্রার অভিভূত করিয়া ফেলে, আবার যখন মধ্যম বা সামান্য মাত্রায় সত্বশক্তির উত্তেজনা হয় তখন মধ্যম বা সামান্য মাত্রায় রজ ও তমঃশক্তিরঅভিভব হয়! হে ভারত! রজোগুণ যখন পূর্ণ, মধ্যম ও সামান্য মাত্রায় উত্তেজিত হয় তখন সত্ব ও তমগুণকে যথাক্রমে পূর্ণ, মধ্যম ও সামান্য মাত্রায় অভিভব করে। আবার তমোগুণও যখন পূর্ণ মধ্যম ও সামান্য মাত্রায় উত্তেজিত হয় তখন রজ আর সত্বশক্তিকে যথাক্রমে পূর্ণ, মধ্যম ও সামান্য মাত্রায় অভিভূত করে।

এই দেহের মধ্যে রজঃশক্তি জনিত ক্রিয়াশক্তি এবং তমঃশক্তি জনিত পোষণশক্তি এককালে নিস্তব্ধ হইলে (মস্তক অবধি পদতল পর্য্যন্ত যে কোন প্রকার জ্ঞানকার্য্য নিষ্পাদক স্নায়ু সমূহ আছে, যেমন চাক্ষুষ স্নায়ু, শ্রাবণিক স্নায়ু, রাসনিকস্নায়ু, এবং সর্ব্বদেহের চর্ম্মান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত স্পর্শশক্তি গ্রহণের স্নায়ু সমূহ ইত্যাদি; ইহাদের সকলের মধ্যেই যখন কেবল মাত্র প্রকাশ স্বরূপ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, অর্থাৎ সমস্ত দেহটার মধ্যেই যখন আত্মার অস্তিত্ব প্রকাশিত হয় অথবা) চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি যে কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন কোন না কোন বিষয়ের জ্ঞান বা একাগ্রভাবে প্রগাঢ়তম উপলব্ধি হইতে থাকে, তখনই সত্বগুণের প্রবলতাবস্থা জানিবে। হে ভরতর্ষভ! যখন কোন বিষয়ের নিমিত্ত লোভ, প্রবৃত্তি, উদ্যম, অশান্তি এবং স্পৃহাদির বিকাশ হয়, তখন রজোগুণের প্রবলতা জানিবে। আর যখন তমোগুণের প্রবলতা

হয় তখন, হে কুরুনন্দন! প্রমাদ, মোহ, অপ্রবৃত্তি, এবং অন্তরে অন্তরে এক প্রকার অপ্রকাশ অবস্থা যেন অন্ধকার অবস্থা, যাহাতে কোন প্রকার বিষয়েরই উপলব্ধি বা কোন প্রকার ক্রিয়া করা যায় না, দেহটা যেন অথর্ব্ব হইয়া আইসে, এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। (ক)

সত্ত্বগুণের উদ্রিক্তাবস্থায় যদি জীব এই দেহ পরিত্যাগ করে মৃত্যুহয় তবে, ঈশ্বরের স্থূল অবস্থাবিদগণ যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও সেই গতি (অমল স্বর্গলোক) লাভ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা রজোগুণের প্রবলতাবস্থায় মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়েন তাঁহারা বিহিত ও নিষিদ্ধ নানা প্রকার কর্ম্মাশক্ত মনুষ্যের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, পরিণামেও তাদৃশ অবস্থাপন্নই হয়েন। তমোগুণের উত্তেজনা কালে যদি মৃত্যু হয় তবে গো, অশ্ব, মহিষাদি পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

যাহারা সাত্বিক ভাবে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহারা দুঃখ মোহে অবিমিশ্রি নির্ম্মল সাত্বিক সুখের উপভোগ করে, যাহারা রাজসভাবে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহারা দুঃখ বিমিশ্রিত সুখভোগ করিয়া থাকে, আর যাহারা তামস ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহারা কেবল অজ্ঞান, এবং দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। কারণ সত্বশক্তি হইতে প্রকাশ স্বরূপ জ্ঞানশক্তির বিকাশ, রজঃশক্তি হইতে লোভের বিকাশ, আর তমঃশক্তি হইতে প্রমাদ, মোহ, এবং অজ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাহারা সত্বগুণের সেবক তাহারা পরকালে দেবলোকাদিতে গমন করিয়া থাকেন, যাঁহারা রজোগুণসম্পন্ন তাঁহারা মধ্যে অবস্থিতি করেন অর্থাৎ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন, আর যাহারা তমোগুণ-জনিত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে তাহারা ইহারা পরে পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে (খ)।

(ক) ইহার বিশেষ বিবরণ ধর্ম্মব্যায় দ্রষ্টব্য।

(খ) পূর্ব্বে, মৃত্যুসময়ে সত্বগুণ, রজোগুণ, ও তমোগুণের বিকাশ হইলে কাহার কিরূপ গতিলাভ হয় এবং সাত্বিক, রাজসিক, ও তামসিকের মধ্যে কোন ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কাহার কি ফল হয় ইত্যাদি বিষয় বলিয়াছেন; আর এক্ষণে, কোন্ স্বভাবাপন্ন ব্যক্তি অথবা সর্ব্বদা কোন গুণজনিত কার্য্য করিলে কাহার কি গতি হয় তদ্বিষয় বলিয়াছেন, অতএব পুনরুক্তি করা হয় নাই।

এখন, নির্ব্বাণযুক্ত কে তাহাও বলিতেছি;—যিনি এই প্রাণী ও অপ্রাণি জগতের মধ্যে যে কোন প্রকার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে তৎসমস্তই কেবল মাত্র এই সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ এবং ইহা হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি জড় পদার্থের কার্য্য, ইহারাই সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা, আত্মা কখনও কোন ক্রিয়া করে না, তিনি নিষ্ক্রিয় এবং ত্রিগুণাতীত পদার্থ, এইরূপ অনুভব (অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি) করেন, তিনি মদ্ভাব (ব্রহ্মত্ব) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,। তিনি দেহোৎপত্তির বীজভূত এই ত্রিগুণ অতিক্রমণ করিয়া জন্ম, মৃত্যু ও জরাজনিত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতোপভোগ করেন. (মুক্তিলাভ করেন)।

অর্জুন বলিলেন।—হে প্রভো! কি কি লক্ষণের দ্বারা এই ত্রিগুণের অতিক্রমণকারী ব্যক্তিকে জানা যাইতে পারে. অর্থাৎ কি কি চিহ্ন দেখিলে আমি নিশ্চয় করিব যে "ইনি ত্রিগুণকে অতিক্রমণ করিয়াছেন," এবং ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি কিরূপ আহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, কি প্রকারেই বা ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যায়, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন।

ভগবান্ বলিলেন। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও হোম প্রভৃতি যতকিছু এই ত্রিগুণজনিত বৃত্তি বা কার্য্য আছে, তাহারা যখন উদ্ভূত হইয়া আপনাপন কার্য্য করিতে থাকে, তখন ঐ সকল প্রবৃত্তিও কার্য্যকে আপনার আত্মার প্রবৃত্তি বা কার্য্য বলিয়া যিনি ধরিয়া লয়েন না, এবং যিনি এইরূপ দুঃখ বা বিদ্বেষ না করেন যে "হায়, এই আমার তামসী প্রবৃত্তি হইয়াছে এতদ্দ্বারা আমি বিমুগ্ধ হইলাম, এই আমার রাজসী প্রবৃত্তি হইয়াছে এতদ্দ্বারা প্রবৃত্তি সম্পন্ন হইয়া আমি প্রকৃত স্বরূপ হইতে বিস্খলিত হইলাম, এই সাত্ত্বিকী প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া আমাকে বিবেকাদিগুণসম্পন্ন করিতেছে, এতদ্দ্বারা ও আমি গুণবদ্ধ হইলাম ইত্যাদি"; আবার সমুচিত কারণ বশে এই সকল প্রবৃত্তির ক্ষয় বা অভাব হইলেও, "আমার আত্মার গুণ বিশেষের লয় হইল," এই মনে করিয়া উহাদের স্থায়ীত্ব আকাঙ্ক্ষা না করেন;—অর্থাৎ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি এবং তদীয় কার্য্যকে, আপনা হইতে দ্বিতীয় বস্তুর কার্য্য বলিয়া স্থিরতর ধারণাসম্পন্ন হইয়া, যিনি উহাকে অন্যের কার্য্যের ন্যায় এককালে উপেক্ষা করেন। এই দেহের মধ্যে থাকিয়াও যিনি উদাসীনবৎ অবস্থিতি করিয়া ত্রিগুণের দ্বারা বিচলিত না হয়েন; দেহের মধ্যে যে কোন প্রকার ক্রিয়া নিষ্পন্ন

হইতেছে তৎসমস্তই এক একটি গুণ বা গুণবিকারের কার্য্য; উহা আমার (আত্মার) কার্য্য নহে। এইরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট হয়েন; এই দেহের কোন ক্রিয়া বা জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির দ্বারা, কোন ক্রিয়া বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা, কোন ক্রিয়া বা প্রাণাদি শক্তির দ্বারা কোন ক্রিয়া বা মন ও বুদ্ধ্যাদির দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে; দর্শন স্পর্শনাদি ক্রিয়াগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা, গ্রহণ গমন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা, ফুস্ ফুস্, পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ প্লীহা প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়া সকল পোষণশক্তি জনিত প্রাণাদিশক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে, আর মনের দ্বারা চিন্তাকার্য্য, অভিমানের দ্বারা অহঙ্কার, বুদ্ধি দ্বারা অধ্যবসায় এবং অন্যান্য শক্তির দ্বারা অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে; সুতরাং ইহার কোন কার্য্যই আত্মার নহে, এইরূপ জানিয়া যিনি কোন কার্য্যে কোন ঘটনায় কিছু মাত্র বিচলিত না হয়েন, যিনি সমদুঃখ সুখ, যিনি সর্ব্বদা আত্মাতেই অবস্থিতি করেন, যিনি মৃৎপিণ্ড, পাষাণখণ্ড ও কাঞ্চনকে সমজ্ঞান, করেন, যিনি প্রিয় আর অপ্রিয় বিষয় এতদুভয়ের তুল্যতাদর্শী, যিনি অগাধ ধৈর্য্য সম্পন্ন, নিন্দা এবং স্তুতিকে যিনি সমজ্ঞান করেন, যিনি মান ও অপমানকে সমজ্ঞান করেন, শত্রু এবং মিত্রকে যিনি সমভাবে দেখেন, এবং যিনি সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী, তাহাকেই গুণাতীত বলাযায়, ইহাই গুণাতীতের লক্ষণ ইহাই গুণাতীতের আচার, এই জ্ঞানের অভ্যাস করাই গুণাতীত হওরার কারণ। পরন্তু গুণাতীত হওয়ার আর একটি মুখ্য কারণ আছে তাহা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ কোন মতেও গুণাতীত হওয়া যায় না, তাহাও তোমাকে বলিতেছি। যে ব্যক্তি, অব্যভিচরিত বিবেকজ্ঞানস্বরূপ ভক্তি যোগের দ্বারা অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান—জীবও ঈশ্বরের অভেদ জ্ঞান পরিশীলনের দ্বারা আমাকে (ঈশ্বরকে) সর্ব্বদা ধ্যান করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গুণ রাশিকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন। কারণ আমিই (ঈশ্বরই) অমৃত এবং অব্যায় স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা; আমারই একাংশ ব্রহ্ম বা পুরুষ, অপরাংশ প্রকৃতি, আমি প্রকৃতি পুরুষাত্মক পদার্থ, অতএব ব্রহ্ম আর প্রকৃতি এতদুভয়ই আমি (ঈশ্বর); এজন্য জ্ঞান নিষ্ঠাস্বরূপ, সাস্বত ধর্ম্মের আশ্রয়ও আমি (ঈশ্বর); আর তজ্জনিত ঐকান্তিক সুখের আকরও আমি (ঈশ্বর) সুতরাং উক্ত প্রকারে ঈশ্বরারাধনা দ্বারাই সমস্ত সংসাধিত হইতে পারে॥ চতুর্দ্দশ অধ্যায়॥

এখন, যাহা জানিতে পারিলে অমৃত (মোক্ষ) লাভ করিতে পারে সেই একমাত্র বিজ্ঞেয় অনাদিমৎ পরব্রহ্ম পদার্থটি কিরূপ তাহা বিশেষরূপে বলিতেছি,—তিনি ইন্দ্রিয় এবং মনোগোচর যে কোন প্রকার সৎ বা অসৎ পদার্থ আছে তাহার কিছুই নহেন, ইহাই তাহার প্রকৃত স্বরূপের লক্ষণ। কিন্তু ইহা দ্বারা, বোধ হয় তুমি কিছুই বুঝিতে পারিলে না; অতএব তটস্থ লক্ষণের দ্বারা (ক) তাঁহার বর্ণনা করা যাইতেছে তাহা হইলে অনেকটা বুঝিতে পারিবে।

(ক) প্রত্যেক বস্তুই দুই প্রকার লক্ষণের দ্বারা বুঝা যাইতে পারে,—এক স্বরূপ লক্ষণ, অপর তটস্থ লক্ষণ। কোন কথার অর্থ বুঝাইতে গিয়া, যে বিশেষণটি বলিলে বিশেষ কিছু মর্ম্ম না বুঝিয়া কেবল সেই একরূপ অর্থই বুঝায় অর্থাৎ পূর্ব্বের কথার দ্বারাও যাহা বুঝিয়াছিলাম, পরের কথার দ্বারাও ঠিক তাহাই বুঝা যায়, তাহাকে স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ বলে, যেমন কলস এবং কুম্ভ; এখানে কুম্ভ, কলসের স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ হইল, আবার কলসও কুম্ভের স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ হইতে পারে; কারণ, এখানে কুম্ভ শব্দের দ্বারা কলসের, কিম্বা কলস শব্দের দ্বারা কুম্ভের, বিশেষ কিছু মর্ম্মই বুঝা যায় না। কুম্ভ বলিলেও যেরূপ যেরূপ বুঝা যায় কলস বলিলেও সেইরূপই বুঝা যায়; বিশেষ কিছুই প্রতীতি হয় না, অথবা আর একটি দৃষ্টান্ত শুনুন—কেহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল যে "ফাঁক পদার্থটি কিরূপ, তাহা আমি জানিতে চাই," তখন আপনি বলিলেন যে "ফাঁকটা শূন্য পদার্থ," কিন্তু এই শূন্য কথাটার দ্বারা ফাঁকের কোন মর্ম্মই বুঝা গেল না; ফাঁক বলিলেও যেরূপ অর্থ বুঝা যায় শূন্য বলিলেও সেইরূপই বুঝা যায়; অতএব শূন্য কথাটা ফাঁকের স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ হইল। এই গেল স্বরূপ লক্ষণের বিবরণ। আবার অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে যদি অন্য কোন বস্তুর লক্ষ্য করা যায়; তবে তাদৃশ বাক্যকে তটস্থ লক্ষণ বলে; ইহাও ঐ ফাঁক বা শূন্যের দৃষ্টান্তেই ভাবুন;—আপনার নিকট কেহ ফাঁক বা শূন্য পদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করিলে; আপনি বলিলেন; "এই গৃহখানির অভ্যন্তরে তাকাও; যেখানে এই গৃহভিত্তির শেষ হইয়াছে তাহাই ফাঁক বা শূন্য" এখন এই গৃহভিত্তির সাহায্যে শূন্য পদার্থটা পরিজ্ঞাত হইল; অতএব আপনার এই কথাটি তটস্থ লক্ষণ হইল। ব্রহ্মকেও এইরূপ দুইপ্রকারে বুঝান যাইতে পারে "ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ;—সত্যস্বরূপ; অনন্তস্বরূপ" ইত্যাদি বলিলে তাঁহার

এই মনুষ্য; পশু পক্ষী প্রভৃতি যত প্রকার প্রাণী আছে ইহাদের যে হস্ত, পদ; নয়ন মস্তক; মুখ ও শ্রবণাদিই ইন্দ্রিয়গণ সচেতন ভাবে আপনাপন ক্রিয়া করিতেছে; ইহার কারণ তিনি; তিনি এই দেহ ইন্দ্রিয়াদি এবং সমস্ত জগতের মধ্যে অনুস্যূত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, লৌহাদি যেমন তাপ সংযোগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তোমাদিগের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণও তদ্রূপ তাঁহার সহিত মাখামাখি থাকাতে অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে—চেতন হইতেছে—চেতন হইয়া নিয়মমতে আপনাপন কার্য্য নিস্পন্ন করিতেছে। তিনি এইরূপে না থাকিলে প্রাণীগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির ন্যায় অন্ধভাবে থাকিত, সুতরাং নিয়মমতে বুঝিয়া শুনিয়া আপনাপন কার্য্য করিতে পারিত না। এইরূপে নিখিল প্রাণীর যাবতীয় হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, ও মুখাদির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকাতে, তাঁহাকে সর্ব্বপাণিপাদবিশিষ্ট, সর্ব্ব নয়ন বিশিষ্ট, সর্ব্ব মুখ বিশিষ্ট, সর্ব্ব মস্তক বিশিষ্ট, সর্ব্ব শ্রবণ বিশিষ্ট ইত্যাদি বলা যায়, এবং এইরূপেই তিনি অনন্ত পাণি পাদ, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত মুখ, অনন্ত মস্তক, এবং অনন্ত শ্রুতি সম্পন্ন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

প্রাণীগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির সহিত, তাঁহার, তাপ ও লৌহের ন্যায় সম্বন্ধ থাকাতে, যে যে ইন্দ্রিয়ে যে যে শক্তি বা গুণ আছে তৎসমস্তই তাহাতে (জীবাদি অবস্থায়) আরোপিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন স্পর্শনাদির কর্ত্তা, এবং ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট বলিয়া, ব্যবহার করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তিনি কিছুতেই বিলিপ্ত নহেন, অথচ এতৎ সমস্ত ধারণ করিয়া

স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশ করা হইল; কারণ ইহা দ্বারা তাঁহার বিশেষ কিছুই উপলব্ধি হয় না; সেই এক বস্তু মাত্রই বুঝায়; চিৎ বলিলেও যাহা বুঝায় সৎ বলিলেও তাহাই বুঝায়; আর ব্রহ্ম ইত্যাদি বলিলেও তাহাই বুঝায়। আর যখন বলা যায় যে "তিনি কর্ত্তা; তিনি হর্ত্তা; বিধাতা" তখন কর্ত্তৃত্ব; হর্ত্তৃত্ব; বিধাতৃত্বাদি গুণের সাহায্যে তাঁহাকে লক্ষ্য করা হইল, অতএব ইহা তটস্থ লক্ষণ বিশেষণ হইল। কারণ কর্ত্তৃত্বশক্তি ও পালয়িতৃত্বাদি শক্তি গুলি প্রাকৃত পদার্থ অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে বিকসিত হয়; সুতরাং ইহা ব্রহ্মের কোন গুণ বা শক্তি নহে; উহা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ; অতিরিক্ত বা পৃথকভূত কোন বস্তুর সাহায্য লইয়া অন্য কোন বস্তুর প্রকাশ করিতে হইলেই তটস্থ লক্ষণ বিশেষণ হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

রহিয়াছেন। তাঁহার কোন প্রকার গুণই নাই, অথচ বায়ু ও আকাশের কেবল সম্বন্ধ মাত্রের দ্বারা তাঁহাকে সুখ দুঃখাদি গুণের ভোক্তা বলিয়া (জীবাদি অবস্থায়) গণ্য করা হয়। তিনি সমস্ত প্রাণীর দেহের মধ্যেও বাস করিতেছেন, বাহিরেও অবস্থিতি আছেন, আবার যাহার অন্তর বাহিরে তিনি বাস করিতেছেন সেই স্থাবর জঙ্গম পদার্থরাশি ও তাঁহা হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তু নহে, রজ্জু যেরূপ মিথ্যা সর্পাকারে পরিণত হয়, তিনিও সেইরূপ এই মিথ্যাভূতজগৎ স্বরূপে পরিণত হইয়াছেন। অথচ তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সুতরাং অবিজ্ঞেয়, তাই তিনি নিতান্ত সান্নিহিত বস্তু হইয়াও অত্যন্ত দূরবর্ত্তী। তিনি প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে এক—অভিন্ন, তাঁহার বহুত্ব নাই তথাপি প্রতি দেহে মনও ইন্দ্রিয়াদি উপাধির পার্থক্য থাকাতে তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীব রূপে প্রতীয়- মান হইতেছেন, তিনি এই সমস্ত জগতের পালয়িতা অর্থাৎ তিনি আছেন বলিয়াই জগতের অস্তিত্ব আছে, এবং তিনি উৎপত্তির কারণ, অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্ব না থাকিলে জগতের বিকাশ হইতে পারে না। আবার রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান হইলে, যেরূপ সেই রজ্জুতে অরোপিত সর্পভাবের বিনাশ হইয়া কেবল রজ্জুই অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ তাঁহাতেই সমস্ত জগতের বিলয় হইয়া থাকে। তিনি সূর্য্যাগ্নিপ্রভৃতি জ্যোতিগণের পরম জ্যোতি স্বরূপ (প্রকাশস্বরূপ) তিনি প্রকৃতির পর, তিনি জ্ঞানস্বরূপ তিনিই (বিবর্ত্তের দ্বারা) * জ্ঞেয়স্বরূপ, তিনি দ্রড়বস্তুর সাহার্য্যে জ্ঞানের গম্য, তিনিই সকলের হৃদয়ে বিশ্বেষরূপে অবস্থিতি করিতেছেন (ইহাই জ্ঞেয় পদার্থ)। এই যে সকল বিশেষণের দ্বারা ব্রহ্মের বর্ণনা করা হইল, ইহাই তটস্থ লক্ষণ।

ক্ষেত্র, জ্ঞান, এবং জ্ঞেয় পদার্থ কি তাহা এই সঙ্ক্ষেপে বলিলাম। আমার যে ভক্ত এই বিষয় সবিশেষ অবগত হইতে পারেন তিনি আমাতে বিলীন হইয়া, এক হইয়া, নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন।

হে মহাবাহো! প্রকৃতি বা মায়া জগৎ বিকাশের মুলকারণ স্বরূপ শক্তিবিশেষ সত্ত্ব, রজঃ, তম, এই ত্রিশক্তির সাম্যাবস্থাবিশেষ, আর পুরুষ অর্থাৎ বীজ (জীবোপাধিক চৈতন্য) এতদুভয়ই অনাদি বলিয়া জানিবে। ইহার কাহারও উৎপত্তি হয় না। আর এই স্থূলভূতাদি যাহা কিছু বিকার পদার্থ এবং সুখ দুঃখাদি গুণ সকল দেখিতেছ, তৎ সমস্তই প্রকৃতি সম্ভূত বলিয়া জানিবে॥ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

* ৯ অধ্যায় ইহার বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাইবেন।

১ম ভাগ

বেদব্যাস।

৮ম খণ্ড

মাসিক পত্র।

অগ্রহায়ণ ১২৯৩

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

বিষয়	নাম	পৃষ্ঠা
দুর্গোৎসব। (ভোলা ও জগদম্বার কথোপকথন)	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি	১৬৯
সাধু দর্শন।	সম্পাদক	১৭৭
উন্নতি অবনতির অর্থ।	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি	১৮৪
জাতীয় একতাবন্ধন।	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত	১৯১

কলিকাতা।

২১ নং মিরজাফর্স লেন, "বেদব্যাস যন্ত্রে"

শ্রীশ্যামাচরণ বসু দ্বারা

মুদ্রিত ও শ্রীঅমৃত লাল চট্টোপাধ্যায়

দ্বারা প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, শাঙ্করভাষ্য, ও শাঙ্করভাষ্যানুমোদিত

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা সমেত।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যাটি

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কর্ত্তৃক

বিশেষরূপে সংবর্দ্ধিত ও সংশোধিত।

এরূপ বাঙ্গালা পূর্ব্বে কখন প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য মায় ডাঃ মাঃ ২॥০ টাকা। কিন্তু বেদব্যাসের গ্রাহকগণকে মায় ডাঃ মাঃ ২৲ টাকায় দেওয়া যায়। মূল্য "৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, বেদব্যাস কার্য্যাধ্যক্ষ্য" এইরূপ লিখিয়া পাঠাইবেন।

বেদব্যাস কার্য্যাধ্যক্ষ্য।

শুদ্ধি পত্র।

১৮৪ পৃ ১৫পুং—"উভয়ন্ধকার" স্থানে "উভয়প্রকার" হইবে।

১৮৯ „ ২২ „ "যখন" „ "এবং" „ ।

বেদব্যাস।

১ম ভাগ। ১২৯৩ সাল। ৮ষ্টম খণ্ড।

দুর্গোৎসব।

(ভোলা পাগলা ও জগদম্বার কথোপকথন)

(১৫২ পৃষ্ঠের পর).

ভোলাদাস।—মা! ঐরূপ তামসফলকামনায়, ঘোর তামসভাবের সহিত, তোর প্রতি যে অনুরাগ হয় সে অনুরাগের কি কোন ফল আছে? আমি ত বিবেচনা করি, ঐরূপ অনুরাগ বা ভক্তি না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। মা গো! ঐরূপ বিগর্হিত ফলকামনায় তোর উপাসনা করিলে, তুই কি সেই ফল দিস?

জগদম্বা।—বৎস! এবার অতি সুকঠিন প্রশ্ন করিয়াছ। আমার এখন সময় অতি অল্প, অন্যান্য লোকজন আসিবার সময় হইয়াছে। অতএব অতি সঙ্ক্ষেপে কিছু কিছু বলিয়া দিই। আপনাপন প্রকৃতি অনুসারে মনুষ্যের আট নয় প্রকার ফল কামনা সম্ভবে; তাহার সকল প্রকার ফল কামনার সঙ্গেই আমার ভক্তি বিমিশ্রিত করিলে বিশেষ ফল আছে, এবং না করিলে অধিক গুরুতর অনিষ্টেরই সম্ভব, তাই ঐরূপ ভক্তি করার বিধি লিখিত হইয়াছে। ইহা বিশেষ রূপে বলিতেছি শুন;—

এজগতে নানাবিধ প্রকৃতির মনুষ্য আছে, এবং তাহাদের কামনা ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যাহারা একবারে নরপশু, কেবল মনুষ্যচর্ম্মের আবরণমধ্যে অবস্থিতি করে; তাহাদের পরশ্রীহানি এবং পরানিষ্টই মুখ্যতম কামনা বিষয় থাকে (১)। যাহারা তদপেক্ষায় একটু ভাল, তাহারা তাহাদের লৌকিক স্বার্থ

অন্তরালে করিয়া পরবঞ্চনাকেই মুখ্যতম কাম্য বস্তু স্থির করিয়া সেইরূপ কার্য্য করে; উহারা নানা প্রকার মতলব সিদ্ধি মানসে সমাজের নিকট নিজের ধার্ম্মিকতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত বাহিরে বাহিরে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে এবং অন্তরে অন্তরে নানাবিধ কুচিন্তা ও করিয়া থাকে (২)। যাহারা তদপেক্ষায়ও একটু উচ্চ, তাহারা আপন অপেক্ষায় অন্যকে খর্ব্ব করাই মুখ্যতম স্বার্থ বলিয়া মনে করে এবং সে জন্যই "আমার" উপাসনাদি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, উহারা অন্যকে ধিক্কৃত করার নিমিত্ত অধিকতর ব্যয়াদি করিয়া ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করে (৩)। যাহারা তদপেক্ষায় একটু শ্রেষ্ঠ তাহারা বৈষয়িক সুখকেই মুখ্যরূপে কামনা করে এবং সেই জন্যই কায়-মনো-বাক্যের সহিত যথাবিধি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে (৪)। যাহারা ইহা অপেক্ষায়ও উচ্চ তাহারা বৈষয়িক সুখভোগ অপেক্ষায়, যশোলাভকে গুরুতর ফল মনে করে, তজ্জন্যই অকৃত্রিম চিত্তে যথা বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করে (৫)। যে ব্যক্তি তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সে আত্মার শক্তির উন্নতি দ্বারা আপনার মহিমা বিস্তার করাকে সর্ব্বাপেক্ষায় গুরুতর ফল মনে করিয়া অন্তঃকরণের সহিত, যথাবিহিত উপাসনাদি ধর্ম্মের অনুশীলন করে (৬)। যিনি তদপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ তিনি চিত্তের মলিনতা বা সমস্ত পাপ বিদূরিত হইয়া চিত্ত বিশুদ্ধিকেই মুখ্যতম ফল মনে করেন (৭)। আর তদপেক্ষায়ও উন্নত মনা ব্যক্তি, আমার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ থাকাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম সুখ বলিয়া কামনা করেন (৮)। তৎপর যিনি তদপেক্ষা ও উচ্চ তিনি অন্যান্য সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল মাত্র কর্ত্তব্যতা বোধেই সমস্ত ধর্ম্ম কার্য্যের অনুশীলন করেন (৯)। এই গেল নয় প্রকার কামনার বিষয়। তৎপর, যিনি সর্ব্বাপেক্ষায় উচ্চতম তিনি সমস্ত কামনা পরিশূন্য; অতএব কোন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন না; জীব যেমন, স্বভাবতঃই আপনার প্রতি অনুরাগবান্ হয়,—যাহা চন্দ্র আর তদীয় প্রভার ন্যায় সর্ব্বদাই অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে অবস্থিতি করে; তিনিও আমার প্রতি সেইরূপ স্বাভাবিক অবিচ্ছিন্ন অনুরাগবান্ হইয়া থাকেন, তখন আমি আর তাঁহার আত্মার কিছু মাত্র প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না, তাহার আত্মা এবং আমার একতা দর্শন করিয়া থাকে। ভোলাদাস! এই অবস্থাকে, ভক্তেরা অহেতুকী ভক্তি বলিয়া থাকেন, এবং জ্ঞানীগণ ইহাকে তত্ত্ব জ্ঞানাবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহার পরে আর কোন অবস্থা নাই, ইহাই মুক্তি অবস্থা।

উক্ত নয় প্রকার কামনার মধ্যেই যদি আমার পূজা, আমার উপাসনা এবং আমার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ বা ভক্তির সংস্রব থাকে, অর্থাৎ ঐ সকল কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত, যদি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া আমার উপাসনা ও পূজাদি করে, তবে সে ঐ প্রথমোক্ত নরপশু অবস্থার লোক হইলেও, ক্রমে ক্রমে শেষোক্ত উচ্চতম অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে। অতএব আমার প্রতি তামস বা রাজস অনুরাগও নিষ্ফল হইতে পারে না। ইহার প্রণালীও তোমায় বলা যাইতেছে, তাহা হইলেই সবিশেষ মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। ভোলাদাস! একথা তুমি সহজেই বুঝিতে পার যে, যে নরপশু, পরশ্রীহানি আর পরানিষ্টকেই সর্ব্বাপেক্ষায় গুরুতর স্বার্থ বলিয়া মনে করে, সে ক্রমে ক্রমে ঐ পাশবপ্রবৃত্তির পরিপুষ্টিদ্বারা উৎসন্নপথেই যাইতেছে,—তাহার পশুভাব ক্রমেই গাঢ়ভাব ধারণ করিতেছে; এখন যদি ঐ সকল তামস ফল কামনা করিয়া একান্ত অনুরাগের সহিত আমার উপাসনা করিতে থাকে, তাহাতে আপাততঃ কুপ্রবৃত্তিরই প্রশ্রয় হইল বলিয়া বোধ হইতে পারে সত্য, কিন্তু বাস্তবিক তাহা না হইয়া ক্রমে উন্নতি পথেই অগ্রসর হইতে থাকে। কারণ প্রকার উপাসনার অনুরোধে উহাকে, এইরূপ কতকগুলি নিয়মের অনুসরণ করিতে হয়,—যাহাতে অগত্যাই তামসভাব সংযত হইয়া ক্রমে সাত্ত্বিকভাবের বিকাশ হইতে থাকে।

ভাবিয়া দেখ! সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক যে কোন প্রকার ফল কামনা করিয়া, আমার যে কোন প্রকার উপাসনা করুক না কেন, তাহাতেই, সত্যবাদী, সংযতেন্দ্রিয়, সংযতচেতা, নিষ্ঠাবান্ এবং সদাচারবান্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নচেৎ আমার কোন প্রকার উপাসনায়ই অধিকারী হইতে পারে না। অতএব ঐ ঘোরতর নরপশুও যখন পরানিষ্টাদি কামনায় আমার উপাসনা করিবে, তখন সে ঐ গুরুতর স্বার্থ সিদ্ধির অনুরোধে অগত্যা অবশ্যই ঐ সকল কষ্টকর নিয়মের প্রতিপালন করিবে, সুতরাং অনিচ্ছা ক্রমেও উহার চিত্ত সংযম এবং ইন্দ্রিয় সংযমের ক্ষমতা অভ্যস্ত হইতে লাগিল, এবং মিথ্যা কথা বলা প্রভৃতি অনেকানেক কুকার্য্য হইতে ও বিনিবৃত্ত হইতে হইল; অতএব অলক্ষিত ভাবে ও উহার সাত্ত্বিকী শক্তির বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল, অগত্যা তমঃশক্তির ও হ্রাস হইতে লাগিল। তৎপর, যে সদাচারাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদ্দ্বারাও সাত্ত্বিক বলের বৃদ্ধি এবং তমোবলের হ্রাস হইতে থাকিবে। কিন্তু উহার ঐ স্বার্থ সিদ্ধির সঙ্গে

যদি আমার উপাসনার সংস্রব না থাকিত, তবে ঈদৃশ নরাধম প্রাণান্তেও ঐ সকল নিয়মের অনুশীলন করিত না।

দ্বিতীয়তঃ—আমার প্রতি একান্ত অনুরক্তি থাকা ও সকল প্রকার উপাসনারই মুখ্যতম উপকরণ; কিন্তু অনুরাগের এমত ক্ষমতা আছে যে, প্রথমে যে, যে ফল কামনা করিয়াই অনুরাগ করুক না কেন, পরিণামে আর সে সকল কামনা কিছুই থাকে না, তখন কেবল অনুরাগ মাত্রই বিদ্যমান থাকে। দেখ! এ সংসারে উদরাময়াদি শান্তি কামনায় অনেকেই, অতি বিস্বাদু ও বিরক্তি জনক অহিফেণাদি ভক্ষণ করিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইতে থাকে, কিন্তু ক্রমে যখন ঐ সকল দ্রব্যের উপর প্রবলতর অনুরক্তি হইয়া দাঁড়ায়, তখন উদরাময়ের শান্তিটা গৌণতম ফল হইয়া, অহিফেণের অনুরাগই মুখ্যতম হইয়া উঠে, তখন উদরাময়ের কথা বার্ত্তা ভুলিয়া, আফিং সেবা না করিয়াই থাকিতে পারে না। আবার দেখ! অনেকে নানা প্রকার সুখসম্ভোগ কামনায় স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হয়, স্ত্রীরও স্বামীর প্রতি অতিশয় অনুরাগ জন্মে; কিন্তু পরিণামে সেই সকল কামনা গৌণতম হইয়া অনুরাগই মুখ্যতম হইয়া দাঁড়ায়। অনেকের, যখন স্ত্রীর বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর আর স্বামীর বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসর হয়, তখন স্বামীরও অর্থার্জ্জনাদি ক্ষমতা কিছু মাত্র থাকে না আবার স্ত্রীর ও পতিশুশ্রূষা এবং গৃহকার্য্যাদির ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু তাই বলিয়া অন্যোন্যের অনুরক্তির কিছুমাত্র লাঘব দেখা যায় না, তখন কেবল কামনা শূন্য নির্ম্মল অনুরাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু প্রথমে নানা প্রকার সুখ কামনা হইতেই ঐ অনুরাগের সঞ্চয় হইয়াছিল। আবার যাঁহারা পতিব্রতা পতিপ্রাণা সাধ্বী এবং প্রকৃত পক্ষেই পতির সহধর্ম্মিণী ও অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপা ভার্য্যা, তাঁহাদের ও প্রথমে নানা প্রকার কামনা হইতেই দাম্পত্য অনুরাগ জন্মে, কিন্তু পরিণামে সমস্ত স্বার্থ ভুলিয়া গিয়া ঐ অনুরক্তি এতই স্ফীততা ধারণ করে যে, দম্পতির উভয় দেহ এবং উভয় আত্মাকে একত্বে পরিণত করিয়া ফেলে,—পতিপ্রাণা পত্নী, পতিদেহ এবং পতির আত্মাকে আপন দেহ-আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন না, এবং তাদৃশ স্বামীও স্ত্রীদেহ এবং আত্মাকে আপনার দেহ-আত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত মনে করেন না। তখন তাঁহাদের আপনাপন দেহ এবং আত্মার উপরে ও যেরূপ স্বাভাবিক অনুরাগ থাকে, স্বামী বা পত্নীর দেহ-আত্মার প্রতিও ঠিক সেইরূপ অনুরাগই হয়, এমন কি অনেক স্থলে এমন ও

ঘটে যে, পতিব্রতার স্বামীর কোন অসুখ হইলে তাঁহার ও সেইরূপ শারীরিক অসুখ হইয়া থাকে, কখন বা স্বামীর মৃত্যু হইলে পতিব্রতার প্রাণত্যাগ ও হয়। ইহার কারণ এই যে, উহাদের উভয়েরই প্রথম কামনা মূলক অনুরাগের পরিপুষ্টি হইয়া হইয়া অবশেষে কামনার ভাব বিদুরিত হইয়া সেই অনুরাগই উহাদের উভয় আত্মা ও উদয় মনকে এককরিয়া ফেলিয়াছে।

"এইতো গেল বৈষয়িক অনুরাগ; তৎপর আমার প্রতি অনুরাগ সম্বন্ধে ও ঠিক এই একই নিয়ম জানিবে। লোকে প্রথম "কু"ই হউক, আর "সু"ই হউক, নানা প্রকার বিষয়ের কামনা করিয়া আমার প্রতি অনুরাগ অভ্যস্ত করিতে করিতে ক্রমেই উহার পরিপুষ্টি হয় এবং ক্রমেই উহাদের আত্মার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হইতে থাকে, যেমন ঘনিষ্ঠতার বৃদ্ধি হয় তেমন তৎসঙ্গে সঙ্গে আমার প্রকৃতস্বরূপও উহার নিকট এক একটুক প্রতিভাত হইতে আরম্ভ হয়। হিমালয়ের উপত্যকাবাসি-লোকের পক্ষে, বর্ষাকালের চন্দ্রমা যেরূপ অত্যন্ত সমাচ্ছন্ন ভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু উহারা যতই অধিত্যকা এবং শিখর প্রদেশের দিকে অগ্রসর হইবে ততই মেঘ মালার আবরণ কাটিয়া গিয়া চন্দ্রমার প্রকৃতপ্রভা প্রকাশিত হইতে থাকিবে, ক্রমে সমস্ত মেঘ রাশিকে নিম্নস্থ করিয়া যখন অপেক্ষাকৃত চন্দ্রের নিকটবর্ত্তি-শিখর-প্রদেশে আরোহণ করিবে, তখন চন্দ্রের সমস্ত প্রভাই পরিলক্ষিত হইবে, ; সেইরূপ, আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধিদ্বারা, জীব যতই আমার নিকটপানে অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই তমঃ ও রজোগুণের আবরণ নিম্নস্থ হইয়া আমার প্রকৃতস্বরূপ তাহাদের চক্ষে প্রতিফলিত হইবে, এবং প্রকৃত স্বরূপ যতই এক একটু করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিবে, ততই উহার পূর্ব্বদৃষ্ট সেই মলিনাকৃতির প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া পূর্ব্বেকার মলিনকামনা ও ক্রমে বিপরীত হইয়া উচ্চ উচ্চ কামনায় পরিণত হইতে থাকিবে। অবশেষে যখন সম্পূর্ণ অনুরক্তি হইয়া আমার সহিত উহার আত্মার অভিন্নভাব প্রকাশ পাইয়া আমার প্রকৃত স্বরূপ সন্দর্শন করিতে পারিবে, তখন সমস্ত কামনা বিদুরিত হইয়া অহেতুক-ভক্তিমান্ বা তত্ত্বজ্ঞানী হইবে, তখনই জীব কৃতার্থ হইল। অর্থাৎ যে সর্ব্বাপেক্ষায় নরাধম, সে প্রথম পরানিষ্ট ও পরশ্রীহানি কামনায়, আমাকেও ঐ সকল কুফলের বিধানকর্ত্রী, ঘোরতরক্রূরা ও অত্যন্ত তমঃস্বভাবা বলিয়া একান্ত অনুরাগ এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মের সহিত পূজোপাসনাদি করিতে থাকে, তখন ঐ একান্ত অনুরক্তি দ্বারা আমার সহিত একটু ঘনি-

ষ্ঠতা হইয়া আমার প্রকৃতস্বরূপ পূর্ব্বাপেক্ষায় ঈষৎ প্রকাশিত হয়, তখন আর আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় ততদুর ক্রূররূপা ও তমঃস্বভাবা বলিয়া দেখিতে পায়না, সুতরাং তখন আমার নিকট পূর্ব্বেরমত অতিশয় ক্রূর কামনা করিতে একটু কুণ্ঠিত হয়। বিশেষতঃ, আমার যৎকিঞ্চিৎ অনুভূতির মাধুর্য্য আস্বাদ করিয়া তাদৃশ ঘৃণিত ফলের উপর একটু অরুচিও হইয়া থাকে, এবং আমার আকৃতির সেই আপেক্ষিক উন্নত ভাব উহার হৃদয়ে পরিস্ফুরিত হইঁতে হইতে নিজের তমোগুণ ও ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আমার উপাসনার সঙ্গে যেসকল অলঙ্ঘনীয় সৎনিয়মের প্রতিপালন করিতে হয় তদ্দ্বারাও উহার তমোগুণ ক্ষয়ের সাহায্য হইতে থাকে, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষায় একটু উন্নতি হইল। তখন, প্রথম কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বিতীয় কামনা (১৬৯ পৃ ১৭প) করিয়া আমার উপাসনা করে; তখন আবার পূর্ব্বোক্ত মতে আর একটু উন্নত হইয়া, পরে তৃতীয় কামনা (১৭০পৃ ২প) করিয়া আমার উপাসনা করিতে থাকে। (১ম, ২য়,৩য়, এই তিন কামনাই তমোগুণের প্রভাব হইতে সমুৎপন্ন জানিবে।) ৩য় কামনা করিয়া, উপাসনা করিতে করিতে যখন আমার সহিত আরও ঘনিষ্ঠতা হয়, তখন আমার প্রকৃত স্বরূপটি আরও অধিকতর প্রকাশিত হয়, তখন আর তাদৃশ ক্রূর রূপা ও তমঃ স্বভাবা বলিয়া আমাকে দেখিতে পায় না, অনুরাগের মাত্রার ও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে; সুতরাং তখন পূর্ব্বোক্ত নিয়মে, উহার হৃদয়ের তমোগুণের প্রভাব এক কালে বিনষ্ট হইয়া যায়, অগত্যা তামসিক কামনা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হয়। তখন উপাসক তমোভাব ছাড়িয়া রজোভাবে উপস্থিত হইল। তখন উহার হৃদয় চতুর্থ কামনা দ্বারা (১৭০ পৃ ৬প) পরি পুষ্ট হইতে থাকে এবং আমাকেও নানা প্রকার ভোগবিধাত্রী-রজোগুণ স্বভাবা রূপে সন্দর্শন করিয়া আপন অভীষ্ট ফল কামনায়, তীব্রতর অনুরাগের সহিত উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। তৎপর পূর্ব্বোক্ত রূপে উন্নত হইয়া হইয়া ক্রমে ৫ম, ৬ষ্ঠ,৭ম, ৮ম, ও ৯ম কামনায় (১৭০পৃ) উন্নীত হইয়া আমার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাইয়া অহেতুক-ভক্তি বা তত্ত্বজ্ঞান বিকাশদ্বারা কৃত কার্য্য হয়। অতএব ঘৃণিত ফল কামনায় কিম্বা শ্রেষ্ঠ ফল কামনায়, অথবা যে কোন প্রকারেই হউক, একান্ত অনুরক্ত হইয়া আমার উপাসনা করিলে তাহার কিছুই ব্যর্থ হইতে পারে না, প্রত্যুত ক্রমোন্নতি দ্বারা অবশেষে আমাকেও প্রাপ্ত হইতে পারে। ধ্রুব এবং শুকদেব প্রভৃতি ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল। ধ্রুব প্রভৃতি

মহাত্মগণ, রাজ্যভোগাদি কামনায় আমার উপাসনা করিয়া অবশেষে মুক্তিলাভ করেন।

ভোলাদাস।—মা গো! আর একটি কথা তো বলিলি না? ঘৃণিত ফল কামনায় তোর উপাসনা করিলে, সত্য সত্যই ঐ সকল ফল হয় কি না, আর তুই ই সেই সকল ফল দান করিস কি না, তাহা জানিতে পারিলাম না। আমার আর এককথা,' তোর যে নানা প্রকার ভাব ও অবস্থার কথা বলিলি তাহার ও কোন মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।

জগদম্বা।—কামনা করিয়া উপাসনা করিলে ঘৃণিত বা উৎকৃষ্ট, সকল প্রকার ফলই আমা হইতেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার রহস্য অতিশয় দুর্গম, সুতরাং উহা বুঝাইতে অনেক সময়ের আবশ্যক, আমার এখন আর অধিক সময় নাই, তুমি শীঘ্রই এ বিষয়, অন্যত্র, অতি বিস্তার মতে জানিতে পাইবে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ও অনেক সময়ের বক্তব্য, অতএব তাহাও সেই সময় শুনিও; তবে সঙ্ক্ষেপে একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি, ইহা স্মরণ রাখিও। আমারপ্রত্যেক আকৃতির মধ্যেই তমঃ, রজঃ, আর সত্ত্ব এই ত্রিগুণের ভাব ও অবস্থা নিহিত আছে, আবার সর্ব্বগুণাতীত অবস্থাও উহাতেই আছে। ভক্তগণ আপনাপন প্রকৃতি অনুসারে উহার এক একটী ভাব দর্শন করিয়া থাকে।

ভোলাদাস।—মা! তোর সময় থাকুক আর নাই থাকুক, আর একটি কথা না শুনিলে আমি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। মা গো! তুই বলিলি যে, তামস, রাজস, বা সাত্বিক যে কোন প্রকার ফল কামনা করিয়া তোর, তামসাদি যে কোন প্রকার পূজা করে তদ্দ্বারাই ক্রমে ক্রমে উন্নীত হইয়া অবশেষে তোকেই প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু মা! রমণীদাস আড্ডী, অবলাচরণ চক্রবর্ত্তী, এবং কামিনীপ্রসাদ কুণ্ড প্রভৃতি তো চিরদিনই তোর পূজা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু উহাদের ক্রমোন্নতি দুরান্তাং, প্রত্যুত ক্রমে ক্রমে উহারা আরও নরপশুর অবস্থায় পরিণত হইতেছে, এমন কি, সাধুগণ উহাদের নামোচ্চারণ করিতে ও আত্মাকে কলুষিত মনে করিয়া, তোর নাম স্মরণের দ্বারা সেই পাপের শান্তি করিয়া থাকেন, তবে আর পূজার ফল কি হইল?

জগদম্বা।—ভোলাদাস! তোমার ভ্রান্তি হইয়াছে, তুমি আমার কথা শুনিতে শুনিতে ঐ সকল পাপ পুরুষ-নরাধমদিগকে মনে করিয়াছিলে,

তাই তোমার ও চিত্ত কলুষিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমার উপদেশের নির্ম্মল ভাব গ্রহণ করিতে পার নাই। প্রকৃত পক্ষে, রমণীদাস আড্ডী প্রভৃতি যে পূজা (?) করে উহা, আমার কোন প্রকার পূজার মধ্যেই পরিগণিত হয় না, উহা কেবল একটা পাশ্ব ক্রীড়া বিশেষ মাত্র, উহাতে ভক্তি শ্রদ্ধার লেশ মাত্র ও নাই, মন্ত্র তন্ত্র বা উপযুক্ত উপকারণও নাই, কোন প্রকার আচার নিষ্ঠা ও নাই, সুতরাং উহা কিছুই না,— উহা না রাজস, না তামস।

কিন্তু, পূর্ব্বে পরানিষ্ট ও পরশ্রীহানি প্রভৃতি যত প্রকার কামনায় যত প্রকার পূজা বা উপাসনাদির কথা বলিয়াছি, তৎসমস্তের মধ্যেই আমার প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং সত্য বাদিতা, সংযতেন্দ্রিয়তা, বাক্য-সংযম, মনঃসংযম, ও আহারসংযমাদি অনেকগুলি নিয়মের নিতান্ত প্রয়োজন হয়, এবং উপযুক্ত পুরোহিত, উপযুক্ত প্রতিমা, যথা বিহিত উপকরণ ও বিশুদ্ধ মন্ত্র তন্ত্র, ও পূজা প্রণালীর আবশ্যক হয়, এই সকল গুলি না হইলে কোন প্রকার উপাসনাই নিস্পন্ন হইতে পারে না, তামসাদি সমস্ত উপাসনারই এই সকল উপকরণের সমভাবে আবশ্যক হইয়া থাকে। ভক্তি প্রভৃতি উপকরণের দ্বারা তামসাদি পূজার কিছু মাত্র পার্থক্য নাই, কিন্তু কেবল উপাসকের স্বভাবমূলক কামনা দ্বারাই তামস, রাজসাদি উপাসনার ভিন্নতা হইয়া থাকে, যে উপাসনায় পরানিষ্ট প্রভৃতি তামস কামনা থাকে, তাহা তামস উপাসনা, যাইতে বিষয় ভোগাদি রাজসিক কামনা থাকে তাহা রাজসিক উপাসনা, আর যাহাতে চিত্ত শুদ্ধি প্রভৃতি সাত্বিক কামনা থাকে তাহা সাত্বিক উপাসনা বলিয়া জানিবে। এতদ্ব্যতীত ভক্তি প্রভৃতি অন্যান্য উপকরণ গুলিসকল প্রকার উপাসনায়ই সমান। কিন্তু রমণীদাস প্রভৃতির পূজায়, উহার কোন উপকরণই নাই; অতএব উহা কোন প্রকার পূজার মধ্যেই গণ্যনহে। আমি পূর্ব্বে যে উহাকে তামস উপাসনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তাহা এই উপাসনা বিভাগের তামস উপাসনা লক্ষ্য করিয়া নহে, কিন্তু তমোগুণের চরম সীমাবস্থার খেলনা পূজালক্ষ্য করিয়া! ফলপক্ষে, উপাসনা বিভাগের তামস উপাসনায় তমোগুণের বিশেষ সংস্রব থাকিলেও তমোগুণের চরমা বস্থা হয় না, তাহাতে রজোগুণাদির ও কিছু কিছু সংস্রব আছে; পরন্ত তমোগুণের প্রবলতা মাত্র, এনিমিত্ত সে পূজাও আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, এবং তদ্দ্বারা ক্রমোন্নতি ফল ও হইয়া থাকে। কিন্তু তমোগুণের চরমা বস্থায় যে পূজাদি করে,-যেমন রমণীদাস প্রভৃতির পূজা,

তাহাতে অন্যান্য গুণের কিছু মাত্র সংশ্লেষ নাই, তাহা কেবলই তমোগুণ মুলক, তাহা আমি গ্রহণ করিতে পারি না; সুতরাং উহাদ্বারা উপযুক্ত ফল লাভ করিতে না পাইয়া ক্রমেই অধঃপতিত হয়। উহারা সর্ব্বস্বরূপিণী-আমার, কামপ্রবৃত্তি প্রভৃতি যে সকল আকৃতির আরাধনা করে,—যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই সকল রূপেই আমি আবির্ভূতা হইয়া উহাদের সর্ব্বনাশ সাধন্ন করিতে থাকি,. অতএব ভোলাদাস! তুমি বলিও, উহারা যেন আমার ঐরূপ পূজা কদাচ না করে।

জগদম্বার এই কথা শেষহইতে না হইতেই অন্যলোক জন আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদের সমীক্ষ্যে জগদম্বা আর কোন কথাই বলিলেন না, সুতরাং প্রথম দিনের কথোপকথন এই খানেই সমাপ্ত হইল। ভোলাদাস ও মায়ের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, লম্বমান-জটাকলাপ-পরিবেষ্টিত মস্তক ও ভস্ম বিভূষিত নগ্ন দেহটি দণ্ডবৎ ভূমিসাৎ করিয়া "মাকে" প্রণাম পূর্ব্বক আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ভক্তি বিহ্বল হৃদয়ে নৃত্যকরিতে লাগিলেন, এবং মুখ্ মস্তক ও করপদাদির নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী করিয়া অটল ভক্তি মাখা দর্পের সহিত, উচ্চৈঃস্বরে এই গানটি করিতে করিতে চলিলেন,—

(রাম প্রসাদী সুর)

মা'র ছেলে মায়ের কোলে থাকি,
আমি, বাজে লোকের ভয় কি রাখি।

মা আমার রাজরাজেশ্বরী, সবাই ধারে মায়ের বাকী। মায়ের ত্রিভুবন হুকুমে চলে, যম ব্যাটা তাকে ডরায় নাকি?॥

হাসি কাঁদি যাহা করি, তা, মায়ে খেলাদেয় খেলে থাকি। সদামায়ের কথায় খেলা ক'রে, আমি দায়ী হ'ব নাকি?॥

ভালমন্দ মা'ই জানে, ভোলা তাহার ধার ধারে কি? ছেলের "বুদ্ধি" হ'লে মা ছেড়ে দিবে, খেলা ধুলো সকল ফাঁকি *॥

সাধু দর্শন।

সদাচার, সদ্ব্যবহার, সদনুষ্ঠান, সাধুগ্রন্থঅধ্যয়ন সৎবার্ত্তালোচনা

* ভোলাদাসের ন্যায় জ্ঞান হইলে কেহই পাপপুণ্যে দায়ী হয় না। নচেৎ সকলেই দায়ী।

প্রভৃতি, পবিত্র জীবন গঠনোপযোগী উপায় সকল মধ্যে, সাধুসেবা, সাধু-সংসর্গ ও সাধু সন্দর্শন মুখ্যতম উপায়। শাস্ত্রই বলেন,—

"অম্ময়ানিচ তীর্থানি যে দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥

"গঙ্গা প্রভৃতি যে সকল জলময়তীর্থ এবং গদাধর অন্নপূর্ণা প্রভৃতি যে সকল পাষাণাধিষ্ঠিত দেবতা, তাঁহাদিগকে সেবা করিলে বরং দীর্ঘকালে তাঁহারা মনুষ্যকে পবিত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধুগণ দর্শন মাত্রেই জীবকে নিখিল কলুষ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হন"। সাধুগণ, যে স্থানে উপবেশন করেন, যে স্থানে স্নানাহার করেন, যে দেশদিয়া গমন করেন, সে স্থান, সে দেশ, পবিত্র হইয়া যায়; এমনিই সাধু হৃদয়, সাধু আত্মার শক্তি।

যদিও পূর্ব্বোক্ত উপায় গুলির, আমাদের সমাজে অনেক স্থলে অনেক সময় অনেকাংশে, সদ্ভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু শেষোক্ত বিষয় গুলির, যে প্রায়ই অসদ্ভাব, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সদাচার, সদ্ব্যবহার প্রভৃতি নিজের আয়ত্তাধীন কার্য্য, ইচ্ছা করিলে ও চেষ্টা থাকিলে একদিন না একদিন সাধিত হইতে পারে, কিন্তু সাধু-সন্দর্শন, কিম্বা সাধুসঙ্গ লাভ, সহস্র ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলেও, সংসিদ্ধ হওয়া নিতান্তই সুদুরূহ,—অথচ পারমার্থিক কল্যাণ পক্ষে সাধুসঙ্গ দ্বারা যত সহজে আত্মা উন্নতি লাভ করিতে থাকে, উল্লিখিতরূপ অনুষ্ঠানাদি দ্বারা ততসহজে কদাচ সম্ভবে না। প্রথমতঃ শাস্ত্রোক্ত গুণ সম্পন্ন, প্রতিভাশালী, মনস্বী মুনি ও ঋষি-মণ্ডলী কখন এপাপ-কলুষ দুষিত ঘোরকপটাচার পরিপূর্ণ সংসারারণ্যে বিচরণ করেন কি না তাহাই সন্দেহ। তৎপর, কত শোকতাপাক্রান্ত সংসারী-জীব সাধুদর্শন লালসায়, চিত্তোদ্বেলিত হৃদয়ে অতি কঠিন আয়াশও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক, পূর্ণ অধ্যবসায়ের সহিত, নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি সেরূপ চক্ষু-মন -তৃপ্তিকর, আত্মার নির্ম্মল-শান্তিপ্রদ-মূর্ত্তি দেখিতে পান নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি ইহসংসারে সেরূপ ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন সাধু পুরুষ আর নাই? শাস্ত্র কি তবে মিথ্যা? তাহা কখনই হইতে পারে না। আমাদের অদৃষ্ট দোষে এবং সংসারের বিকৃত পরিবর্ত্তনে, তাঁহাদের প্রকৃতিস্থ দেহ, মন, আত্মা এই সমস্ত অপ্রকৃতিস্থ লোকসংসর্গে আসিতে নিতান্তই সঙ্কুচিত হয়, তাহাই তাঁহারা সমস্ত নগর প্রান্তবর্ত্তি-অরণ্য পর্ব্বত পরিহার পূর্ব্বক কোন নিভৃত

গুহাদি আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া, সেস্থান আমাদের দুরধিগম্য; সুতরাং আমরা তাঁহাদের বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা দেখিতে পাইনা বলিয়া কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব যে, সে অজর অমর নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব পুরুষ সমুহ, ঈশ্বরের নিয়ম অতিক্রম করিয়া, অন্তর্হিত হইয়াছেন? তাহা হইলে এরূপ সমভাবে দিন রাত্রি বহিত না সংসার সুশৃঙ্খলায় অতিবাহিত হইত না। সকলেই আছেন, কিন্তু পাপী আমরা, অদৃষ্ট বিপাকে পড়িয়া, সে সৌম্যমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া হৃদয় মন চরিতার্থ করিতে পারিনা।

উল্লিখিত সাধুদের দর্শনাকাঙ্ক্ষা করা আমাদের দুরাশা মাত্র! ইহা নিশ্চয়, যে, কত সংসারত্যাগী ধর্ম্মপিপাসু পরিব্রাজকগণও যখন, কত ব্যাকুল হৃদয়ে, বহুতর কষ্টে, অতি নিভৃত প্রদেশে গমন করিয়া, তবে যাঁহাদের দর্শন লাভ করিতে পান, অন্যদিকে, দেবতারাও সময়ে সময়ে যাঁহাদের আরাধনা করিয়া পান না, তখন, তাঁহারা যে সর্ব্বদা আমাদের ন্যায় বিষয় লিপ্সু সংসারিক কীটদিগের গোচরে আসিবেন এরূপ আকাশ-কুশমবৎ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা এতক্ষণ যে সমস্ত মহাত্মাদের সম্বন্ধে বলিয়া আসিলাম, ইহাঁরা নির্ব্বাণ-মুক্ত মহাপুরুষ।

আর এক শ্রেণীর সাধুপুরুষ আছেন, যাঁহারা লোক সন্নিধানই বাস করেন, অথচ ইহারই মধ্যে যতটা নির্জ্জন ও পবিত্র স্থান সম্ভব তাহারই অনুসন্ধান করিয়া লয়েন। সেইখানেই আপনার সংকল্পও উদ্দেশ্য অনুযায়ী সাধন ভজনও অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকেন। কত শত যাত্রী দর্শন মানসে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, গদগদভাবে পূজা অর্চ্চনাদি করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই সাধকের দৃষ্টি নাই। তিনি একমনে একধ্যানে আপন কার্য্যে রত রহিয়াছেন। সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে সেই তাহার রমণীয়তা অনুভব করিয়া আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিয়াছে। যদিও এরূপ সাধুপুরুষগণ সময়ে সময়ে আমাদের নয়ন পথে পতিত হন, তথাপি ইহাঁদের সংখ্যা অতি অল্প। কেবল পুণ্যধাম কাশী, গয়া, কনখল, নর্ম্মদাতীর প্রভৃতি কএকটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানেই ইহাঁদের দর্শন পাওরা যায়। ইহাঁরাই আমাদের ন্যায় সংসারীগণের আদর্শপুরুষ স্বরূপ। সুতরাং ইহাঁদের জীবনীই আমাদের আলোচণীয় ও অনুসরণীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, তাই যাঁহাদের অনুসরণ করিব যাঁহাদের আদর্শ লইয়া এপাপ

জীবনের সংস্কার করিব, তাঁহাদের যে সেই জীবন্ত মূর্ত্তি সর্ব্বদা দর্শন করি, সেবা শুশ্রূষাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া সাধু প্রসাদ লাভ করি, তাহা প্রায় ঘটিয়া উঠে না। কোথায় পূণ্যক্ষেত্র কাশীধামে গঙ্গাতীরে কোন এক জনশূন্য স্থানে, এক মহাপুরুষ আপন মনে, আপন ধ্যানে, পাগলের ন্যায় বসিয়া কি করিতেছেন, কোথায় কনখলের পর্ব্বত গুহায় বসিয়া আর একজন মহাপুরুষ ধ্যানস্তিমিতনেত্রে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি স্বরূপে নিরোধ করিয়া, ভগবানের আরাধনায় মগ্ন রহিয়াছেন, এদৃশ্য স্বয়ংচক্ষে দেখিয়া, প্রাণেমনে ঐক্য করিয়া, আমাদের ন্যায় কয়জন, সে আদর্শ অনুসরণ করিতে সক্ষম হন? আমরা এতই সংসারমোহেজড়িত যে এত দূর গমন করিয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হই, ইহা আমাদের চেষ্টায় বা সামর্থে কুলায় না।

শুনা যায় পূর্ব্বে অনেক সাধুমহাত্মা সময়ে সময়ে দেশ ভ্রমণার্থ বাহির হইয়া গৃহস্থ সকাসে আতিথ্য স্বীকার করিতেন। গৃহস্থও সাধুদর্শণলাভে জীবন সার্থক হইল জ্ঞান করিয়া, পরম যত্নে ও তীব্র আগ্রহে অতিথি সৎকার করিতেন। সাধুরাও ভদ্র জনোচিৎ সৎকারে প্রীত হইয়া হৃদয় খুলিয়া গৃহস্থের মঙ্গল কামনায় আশীর্ব্বাদ করিতেন, গৃহস্থ পরমানন্দে কুশলে দিনযাপন করিতেন। কিন্তু এখন, আমরা ধর্ম্ম কর্ম্মে সিদ্ধ হইয়াছি বলিয়াই হউক, অথবা এ ঘোর অনাচারী, কপটী, অধার্ম্মিক জনপূর্ণ দেশে আসিয়া তাঁহাদের পবিত্র হৃদয় পাছে কলুষিত হয়, এই ভয়েই হউক, তাঁহারা কিন্তু এদেশে ভুলক্রমেও পদার্পন করেন না। শাস্ত্রে আছে, যে দেশ সাধুসমাগম বর্জ্জিত সে দেশ সত্বরই মরুভূমিতে পরিণত হয়, প্রজাগণ উচ্ছন্নে যায়, রাজা শত্রুকর্ত্তৃক বিদলিত হন। আমাদেরও সুতরাং দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হইয়াছে।

সাধুদের শান্তমূর্ত্তি সন্দর্শনের এমনই মাহাত্ম্য যে, দর্শন মাত্রেই যেন আত্মার-সৎবৃত্তি গুলি সতই ফুটিয়া উঠে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কুপ্রবৃত্তি গুলিও চুপ্‌সিয়া যায়। জীবনের মধ্যে একবারও যদি একটি মাত্র সাধুদর্শন হয়, তাহা হইলেও সেই সাধুদর্শন জনিত যে আত্মার সাধু-সংস্কার তাহা চিরকালের জন্য থাকিয়া যায়। সর্ব্বদা স্মৃতিপথে তাঁহাদের শান্তির আধার প্রতিমা খানি সুদৃঢ় করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে কুআকাঙ্ক্ষারূপ আবর্জ্জনারাশি আসিয়া, হৃদয়কে মলিন করিতে পারেনা। অথচ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিলাম যে বর্ত্তমানযুগে আমাদের ন্যায় সাধারণ

লোকের সে জীবন্তমূর্ত্তি সহজে দেখিবার উপায় নাই। তবে যাঁহাদের প্রবল ইচ্ছা আছে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে উপায়ও আছে তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু একটি কথা আছে,—ইহা আমরা বিশ্বাস করি যে, জীবন্ত মূর্ত্তি খানির পরিবর্ত্তে যদি কোন জ্বলন্ত প্রতিকৃতি দেখা যায়, তাহাতে সম্পূর্ণ ফলে না হউক অনেকাংশে যে জীবন্তমূর্ত্তি দেখার, সমফল প্রদান করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মৃত পিতামাতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া, সৎপুত্রের মনে কতই ভক্তি, শ্রদ্ধা, ও পৈত্রিক গুণাদির স্মরণ হইয়া থাকে। ভগবান এবং ভগবতীর মৃৎপাষাণাদিময় প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তের হৃদয়ে কত আনন্দ কতপ্রকার ভাবে উচ্ছ্বাস হইয়া থাকে। এই উদ্দেশেই আমরা দেব দেবীর প্রতিমা গঠন করিয়া, ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর সাজাইয়া থাকি, ঈশ্বর প্রেমিক ভক্তদিগের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধন করি। সতত পবিত্র ভাবোদ্দীপক প্রতিমূর্ত্তি সমূহ নিরীক্ষণ করাতে হৃদয়ের প্রশান্ততা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, মন প্রাণ ধর্ম্মভাবে মাতিয়া উঠে, চিত্তের জড়তা দূরীভূত হইয়া যায়। সুতরাং, সাধুসকাসে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের দর্শন করিতে যদি নাই পারি, অন্ততঃ তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি কোন উপায়ে সংগ্রহ করিয়া, সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া দিই, তাহা হইলেও সমূহ উপকার দর্শিতে পারে। যাহাতে সহজে এই আশাটি মিটিতে পারে তজ্জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছি। নানা স্থান হইতে প্রসিদ্ধ সাধুদিগের প্রতিমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া বেদব্যাসে অবিকল ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব, এবং তৎসহ তাঁহাদের জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলীও প্রকটিত করিতে বাসনা রহিল। অদ্য, পরপৃষ্ঠায় একজন দেশপ্রসিদ্ধ মহাত্মার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইল।

পাঠক! এই যে সৌম্য মূর্ত্তিটি দেখিতেছেন ইনি সমস্ত হিন্দুর পরিচিত ও পূজিত, মহাত্মা ত্রৈলঙ্গীস্বামী পরমহংস। ইহাঁর প্রকৃতনাম কেহ অবগত নহেন, ত্রৈলিঙ্গদেশবাসী বলিয়া ইহাঁকে সকলে ত্রৈলিঙ্গী বলে। মহাত্মার প্রশান্ত-ললাট-ফলক হইতে জ্বলন্ত ব্রহ্মণ্যপ্রভা বিকীর্ণ হইতেছে, ইহাঁর উপরি উপরি চঞ্চল এবং অভ্যন্তরে স্থিরভাব প্রকাশক নয়নদ্বয়-যুক্ত বিশাল ভালদেশ হইতে গম্ভীর জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, শান্তি ও আনন্দ প্রভৃতি সমস্তের জ্যোতি যেন সমষ্টিভাবে পিণ্ডীকৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিসর্পিত হইতেছে। নয়নদ্বয়ের মধ্যে কুটিলতা বা ঘৃণা বিদ্বেষাদি ভাবের

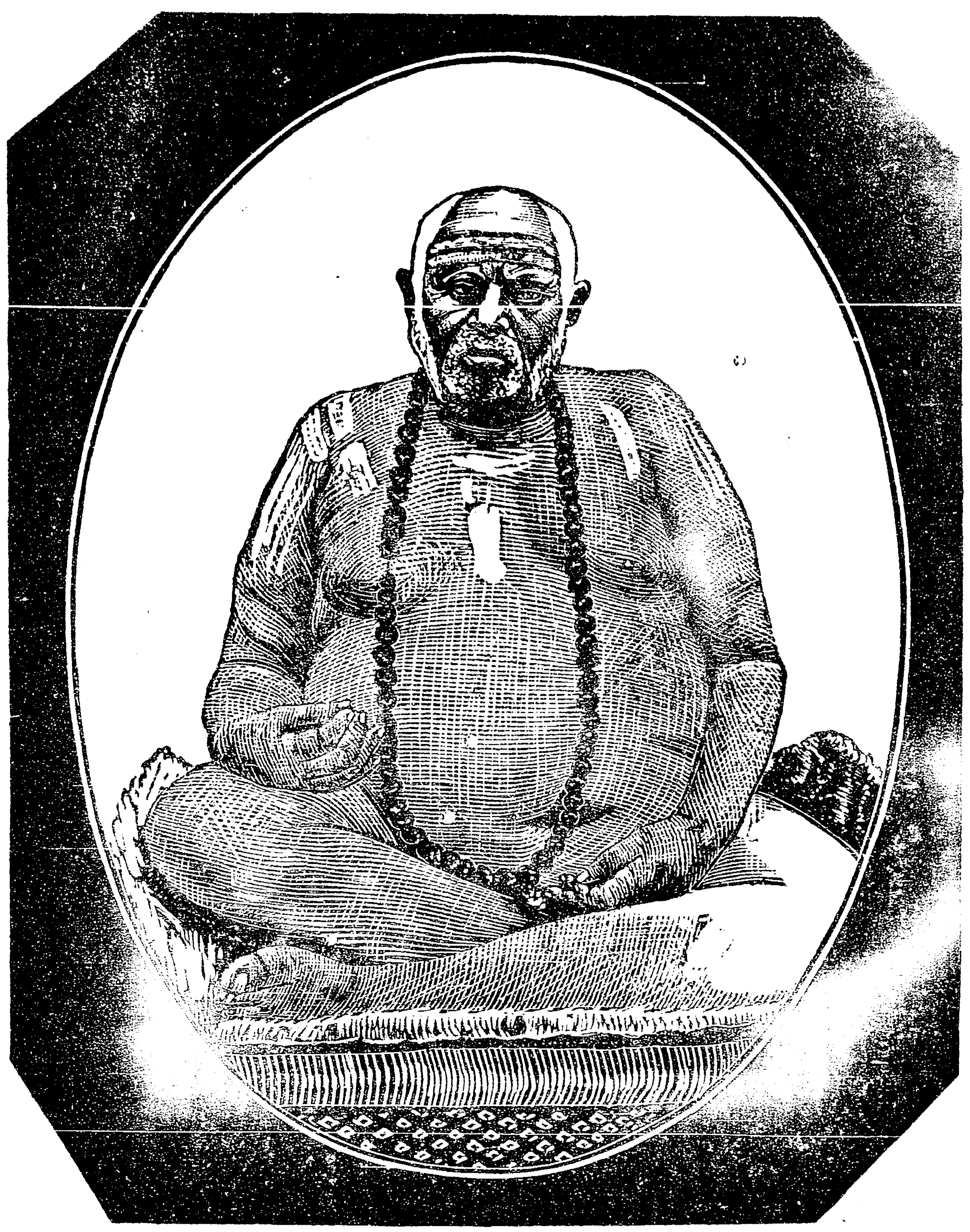

মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গী স্বামী।

লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না, ইহাঁর দৃষ্টি অতি সরল এবং অপরিমিত আনন্দ ও শান্তির প্রকাশক। মুখভঙ্গী অতিশয় গম্ভীরতা প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যে অভিমান, মাৎসর্য্য, তৃষ্ণা বা দৈন্যের চিহ্ন কিছুমাত্র নাই, মুখখানি সর্ব্বদাই প্রসন্ন ও বরপ্রদ ভাব প্রকাশ করিতেছে। ইহাঁর, ভস্মাদি ধূসরিত এবং নগ্ন বৃহৎ কুক্ষিবিশিষ্ট মধ্য দেশটি অবলোকন করিলে অনাদি-দেব মহাদেবের ভাব স্মরণ হইয়া থাকে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবা, ভক্ত অভক্ত, মিত্র, শত্রু সকলের উপরেই ইহাঁর দৃষ্টি ও প্রসন্নতার সমভাব পরি-লক্ষিত হয়। ইহাঁকে, দর্শন করিলে বোধ হয় যেন এই সংসারেরই সমস্ত কথা শুনিতেছেন, এবং নিকটবর্ত্তী বস্তু সকল সন্দর্শন করিতেছেন, কিন্তু একটু নিবিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহা নহে,

ইনি বাহিরের কোন বস্তুই দেখিতেছেন বা শুনিতেছেন না, ইনি যেন কোন্ দুর্লক্ষ্য ও দুশ্চিন্তনীয় বস্তর চিন্তা করিতে করিতে "তাহাতেই" সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রত্যাহৃত ও নিবিষ্ট করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাঁর বস্ত্র বা কৌপীনাদি কিছুই নাই, তথাপি ইহাঁর উদরটি এতই সুবৃহৎ ও লম্বমান হইয়া পড়িয়াছে যে, বসুন আর দাঁড়ান, ইনি যে উলঙ্গ, তাহা কিছুই লক্ষ্য করা যায় না; পেটটি ঝুলিয়া পড়িয়া সম্মুখ দেশটা আবরণ করিয়া রাখিয়াছে।

ইহাঁর সম্বন্ধে অনেকগুলি অতি বিস্ময়কর কিম্বদন্তী আছে। প্রধানতঃ বয়স সম্বন্ধে এক বিচিত্রতা এই যে, কাশীবাসী অতি প্রাচীন (৯০।১০০ বৎসর বয়ঃক্রম) লোকের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহারা প্রথমে যৌবনের প্রারম্ভে যখন কাশী আসিয়াছিলেন, তখনও যেরূপ আকৃতি যেরূপ ভাব দেখিয়া গিয়াছেন, এখনও ঠিক সেইরূপই দেখিতেছেন, কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। সিপাহী বিদ্রোহের পর কাশীধামে বিদ্রোহীরা যখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তখন একজন অতি দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজ, বিদ্রোহী শাসনে তথায় গমন করেন। প্রথমেই তাঁহার উলঙ্গ সন্যাসীদের উপরই দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। অমনিই যাবতীয় উলঙ্গ সন্যাসী একত্রিত করিয়া বস্ত্র পরিধান জন্য নানারূপ অতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হয়। সেই অত্যাচারে কেবল ত্রৈলঙ্গীস্বামী ব্যতিত অন্যান্য সকলেই বস্ত্র পরিধান করিয়া অব্যাহতি পায়। কিন্তু মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গী কিছুতেই দমিবার নহেন, অবলীলাক্রমে সমস্ত অত্যাচার তুচ্ছ করিয়া রহিলেন। অবশেষে তাঁহাকে তিন দিন অনাহারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। ভগবানের লীলা কে বুঝিবে, ঐ দিবসত্রয় মধ্যেই দুরন্ত সাহেব শয্যাগত হইলেন, এমন কি জীবনের আশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে সসম্মানে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এবং তৎসহ স্বামীজীর প্রতি কেহ কোন অত্যাচার কি কোন অনিষ্ট করিলে দণ্ডনীয় হইবে, এই মর্ম্মে সহর মধ্যে, ঘোষণা প্রচার করা হয়; এইরূপ কত শত আশ্চর্য্যজনক ঘটনাবলী ইহাঁর জীবনে সংঘটিত হইয়াছে তাহা আনু-পূর্ব্বিক লিখিলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়ে।

আমাদিগের একজন পরম পূজনীয় ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি, বহুদিন যাবৎ কাশীধামে বাস করিয়া সপ্তচত্তারিংশৎ বৎসর বয়সে কাশী প্রাপ্ত হন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি যখন প্রথমাবস্থায় কাশী ক্ষেত্রে যান, তখন

স্বামীজীর সাধনাবস্থা দর্শন করেন। তিনি প্রায় অধিকাংশ সময় স্বামীজীর নিকট কোন গুপ্ত স্থানে থাকিয়া তাঁহার অমানুষী কীর্ত্তি সমস্ত স্বচক্ষে অবলোকন করিতেন। কখন দেখিতেন, অতি প্রচণ্ড শীতে গঙ্গাসলিলে প্রবেশ করিয়া যোগ সাধনা করিতেছেন, কখন বা জলোপরি পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। যে যাহা মুখে ধরিত তাহাই আহার করিতেন। কতকগুলি দুষ্টলোক ষড়যন্ত্র করিয়া একদিন ৫।৬ বোতল ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া দেয়। স্বামীজীর ভক্তগণ এই বার্ত্তা শুনিতে পাইয়া আতঙ্কিত হৃদয়ে তাঁহার শারীরিক অবস্থা পর্য্যাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজীর কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। এইরূপ, ত্রৈলিঙ্গস্বামী সম্বন্ধে, যোগসিদ্ধ পুরুষের পরিচায়ক, অসংখ্য ঘটনা সমূহের জাজ্জল্য ইতিহাস, বিশ্বস্তসূত্রে শুনিতে পাওয়া যায়।

উন্নতি অবনতির অর্থ।

(১২০ পৃষ্ঠার পর)

সকলেই জানেন যে এ সংসারে যত লোক আছে সকলেরই, সময় বিশেষে ন্যূনাধিক পরিমাণে, সৎ অসৎ উভয়ন্ধকার প্রবৃত্তিরই ক্রিয়া হইয়া থাকে, এবং যখন সেই সত্বগুণ সমুদ্ভূত সৎপ্রবৃত্তি গুলির ক্রিয়া হয় তখন রজঃ ও তমঃশক্তিজনিত অসৎ প্রবৃত্তির কার্য্য হইতে পারে না, আবার যখন অসৎ প্রবৃত্তির ক্রিয়া হয় তখন সৎপ্রবৃত্তির ক্রিয়া হইতে পায় না। তুমি নিজে আত্মায় লক্ষ্য করিলেই ইহার পরিষ্কার উদাহরণ পাইতে পার, ভাবিয়া দেখ, যে সময়ে তোমার রজোগুণ জনিত ক্রোধ, হিংসাদি কুপ্রবৃত্তির বিকাশ হয়, ঠিক সেই সময়ে কখনই ভক্তি, দয়া, বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি সাত্বিক সৎপ্রবৃত্তির বিকাশ হয় না, কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে হয়। যদি কখনও অতি প্রবল ভাবে তোমার কোন প্রবৃত্তির বিকাশ হইয়া থাকে তবে আরও জ্বলন্ত ভাবে ইহার প্রমাণ অনুভব করিয়াছ।

অতএব, যদি স্থায়িভাবে, সত্বরজঃ প্রভৃতি কোন শক্তির অনুশীলন করা যায়, তবে ক্রমে ক্রমে সেই শক্তি এবং তাহার অন্তর্গত শক্তি সমূহেরই বল বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি হইবে, আর যে পরিমাণে উহাদের বল বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি হইবে সেই পরিমাণে অপর শক্তি গুলির দুর্ব্বলতা হইয়া বিনষ্ট প্রায় অবস্থা হইবে, স্থতরাং সেই বর্দ্ধিষ্ঠ শক্তিটির ক্রিয়ার বৃদ্ধি এবং ক্ষীণ শক্তি গুলির

ক্রিয়ার ক্ষয় হইতে থাকিবে; অর্থাৎ তুমি যদি সর্ব্বদাই সত্বগুণের অনুশীলন কর, তবে সত্বশক্তির বলই ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, সাত্বিক প্রবৃত্তির ক্রিয়া গুলিও ক্রমশঃই প্রবলবেগে হইবে, আর রজঃশক্তি তমঃশক্তি নিতান্ত ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইবে, স্থতরাং তাহাদের ক্রিয়াও অতিশয় মৃদুভাবে নিষ্পন্ন হইবে। রজঃশক্তি এবং তমঃশক্তির অনুশীলন করিলেও এই নিয়মেই একের বৃদ্ধি ও অপর গুলির ক্ষয় হইয়া যাইবে।

একজন প্রকৃত সাধু ব্যক্তি, আর একজন প্রকৃত নরপশুর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহা অনায়াসে বুঝিতে পার। সতত অনুশীলন ও অভ্যাসের দ্বারা যে সাধুগণের অন্তরে ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্যাদি শক্তিগুলি সর্ব্বদা বলবতী থাকে, তাহা বোধ হয় অবগত আছ, কিন্তু তাঁহাদের আকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলে তুমি ইহাও দেখিতে পাইবে, যে, রজঃশক্তি আর তমঃশক্তির প্রভাব নিতান্ত ক্ষীণাবস্থাপন্ন, দেখিতে পাইবে তাঁহাদের সকল প্রকার বিষয় তৃষ্ণা অন্তর্হিত হইয়াছে, সমস্তগুলি ইন্দ্রিয়শক্তিই যেন বহিঃপ্রবাহে বিমুখ, প্রভাবিহীন এবং সংযত ভাবাপন্ন। এবং ইহাও অনেকটা অনুভব করা যায়, যে, তাঁহার অভ্যন্তরে যেন সুধাংশুর প্রভার ন্যায় কি একরূপ প্রশান্ত বাহিনী দ্যুতি বিকাশ পাইতেছে। আবার যে নরপশু, সর্ব্বদা কুপ্রবৃত্তির অনুশীলনেই নিরত তাহার দিকে দৃষ্টি কর, দেখিবে উহার সমস্ত প্রভাই যেন বাহিরে বাহিরে, উহার অন্তরপ্রদেশটা যেন ফাঁকা। উহাতে ভক্তি বিবেকাদির অণুমাত্র চিহ্নও লক্ষ্য করিতে পারিবে না, উহার সকল গুলি ইন্দ্রিয় শক্তিই যেন প্রাবৃট্‌কালীন নদীবেগের ন্যায় দেহায়তন ছাপাইয়া দেহের বাহিরে ছুটিয়া আসিতেছে, উহার প্রবল বিষয় ভোগ তৃষ্ণা যেন চক্ষুকর্ণাদি হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এতদ্ব্যতীত, মনুষ্য ও পশ্বাদির দৃষ্টান্তেও ইহা বিলক্ষণ জানা যাইতে পারে,— ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হয় যে; মনুষ্য যতই নীচ বা নীচতম হউক না কেন, কিন্তু প্রকৃত চতুষ্পাদ পশু অপেক্ষায় অনেকটা উচ্চতর অবস্থায় নিশ্চয়ই থাকিবে। গাবশ্বাদি পশু অপেক্ষায় তাহার একটু অধিক চিন্তা শক্তিও থাকিবে, একটু বুদ্ধি, একটু বিবেক, এবং একটু মেধা ও স্মৃতি শক্তিও স্বভাবতঃই থাকিবে, তবে অবশ্যই, প্রকৃত মনুষ্যের তুলনায় উহা কিছুই নাহইতে পারে। অতএব স্বীকার করিতে হইল যে, অতি নীচতম মনুষ্যেরও স্বভাবতঃই পশ্বাদি অপেক্ষায় অধিকতর সাত্বিকশক্তি

আছে; কারণ ঐ যে এক একটু চিন্তাশক্তি, বিবেকশক্তি প্রভৃতি, উহা সত্বশক্তি হইতেই বিকসিত; আর ইন্দ্রিয় শক্তি প্রভৃতি যে দেহব্যাপক শক্তি তাহা যথাক্রমে রজঃ এবং তমঃশক্তি হইতে সমুৎপন্ন। মনুষ্যের সাত্বিক শক্তি একটু অধিক আছে বলিয়া, উহাদের রাজস ও তামস শক্তি এবং তদীয় ক্রিয়া, গবাশ্বাদি পশু অপেক্ষায় নিতান্ত ক্ষীণ, মিতান্ত মৃদু। মনুষ্যের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়শক্তি এবং দৈহিক শক্তিই পশুর ইন্দ্রিয়শক্তি ও দৈহিকশক্তি অপেক্ষায় নিতান্ত দুর্ব্বল, এজন্য কোন ইন্দ্রিয়শক্তি বা বৃত্তি পরিস্ফুরিত হইলে, মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই তাহাকে সংযত করিতে পারে, কিন্তু পশুগণ তাহাতে একবারে অসমর্থ। তাহাদের যখন যে ইন্দ্রিয় শক্তি পরিস্ফুরিত হয়, যদি বাহিরে কোন বাধা না পায়, তবে তৎক্ষণাৎ সেই ইন্দ্রিয় আপন কার্য্য-সাধন করিয়া ফেলে, এমন কি, উহাদের ইন্দ্রিয় শক্তি এতই প্রবল যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কখনই এককালে নিস্তব্ধ বা কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে পারে না; উহা দিবারাত্র সর্ব্বদাই প্রায় সমভাবে কার্য্য করিয়া থাকে; এজন্য পশুদের সুনিদ্রা হইতে পারে না, কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে কাহারই ঐরূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না।

আবার পশুদ্বয়ের মধ্যে তুলনা করিয়া দেখ, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই প্রমাণ পাইবে। পশুদের মধ্যেও যেজাতীয় পশুর, অপেক্ষাকৃত, একটু বিবেকও চিন্তাদি সাত্বিক শক্তির অস্তিত্ব দেখিবে, তাহাদের রাজসও তামসশক্তি, অপেক্ষাকৃত একটু দুর্ব্বলা। গবাশ্বাদি অপেক্ষায় বানরের বিবেকাদি সাত্বিকশক্তি একটু আছে, কিন্তু বানরের রজঃ ও তমঃশক্তি জনিত ইন্দ্রিয়াদি শক্তিও গবাশ্বাদি অপেক্ষায় দুর্ব্বলা; এজন্য বানরের একটু সংযমক্ষমতাও আছে, নিদ্রাসুখও কিছু কিছু অনুভব করিতে পায়।

অতএব ইহা স্থিরহইল যে, তুমি যদি সর্ব্বদা অনুশীলনের দ্বারা সত্বশক্তি অভ্যস্ত করিতে পার, তবে সত্বশক্তির বলবৃদ্ধি হইয়া রাজসও তামসশক্তির অতিশয় ক্ষীণতা হইবে, এবং সত্বশক্তি জনিত-ভক্তি বিবেকাদি যে সকল শক্তি আছে তাহাদেরই ক্রিয়ার প্রবলতা, আর রজস্তমঃ শক্তি সমুদ্ভূত ইন্দ্রিয়াদিশক্তি গুলির ক্রিয়াবল হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। নয়নেন্দ্রিয়শক্তি এবং তদীয় ক্রিয়ার বল ক্ষীণ হইবে, শ্রবণেন্দ্রিয় শক্তিও তদীয় ক্রিয়ার বল ক্ষীণ হইবে, এবং রসনেন্দ্রিয় শক্তি, স্পর্শনেন্দ্রিয়শক্তি, গ্রহণশক্তি, গমনশক্তি, ফুসফুস-

শক্তি, হৃৎপিণ্ড-শক্তি, পাকস্থলীশক্তি প্রভৃতি সমস্ত রাজস তামস শক্তিরই বল কমিয়া যাইবে, এবং ইহাদের ক্রিয়ার বেগও কমিবে। এখানে এরূপ অর্থ বুঝিও না যে, তুমি তখন কম দেখিতে পাইবে, কম শুনিতে পাইবে কিম্বা উদরাগ্নির মন্দতা হইবে, কারণ ঐরূপ সকল অবস্থা ইন্দ্রিয় যন্ত্রের বিকৃতির পরিচায়ক, উহা শক্তির হ্রাস বৃদ্ধির পরিচায়ক নহে। পূর্ব্বোক্ত মতে আন্তরিক শক্তির বৃদ্ধি হইয়া যদি ইন্দ্রিয়াদি শক্তির বলের হ্রাস বা ক্ষীণতা হয়, তবে দর্শন শ্রবণ এবং স্পর্শনাদির নিপুণতা বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। তবে এখানে হ্রাস হওয়ারকথার অর্থ এই যে,—ঐ সকল ইন্দ্রিয়শক্তি গুলি এখন যেরূপ অতিশয় উর্জ্জস্বলতার সহিত তীব্রবেগে, অতিস্ফীত ভাবে, ঘন ঘন ক্রিয়া করিতেছে তখন তাহা হইবে না, কিন্তু অতি বিরল আর অতি সূক্ষ্মাবস্থায় ক্রিয়া করিবে। সর্ব্বদেহব্যাপক সমস্ত শক্তিই ফাল্গুন মাসের জাহ্নবী জলের ন্যায় অতি সুনির্ম্মলও সঙ্কোচিত বা সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া অতি মৃদুভাবে ধীরে ধীরে বহিতে থাকিবে।

এদিকে আবার অন্তরে অন্তরে, অন্তঃসারের (পৃ প) অন্তর্গত ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, ও ধীশক্তি প্রভৃতি যে সকল সাত্বিকীশক্তি আছে তৎসমস্ত একত্রে সমুচ্চিত হইয়া একটি জ্বলন্ত আন্তরিক অস্তিত্ব (পৃ প) সঙ্গঠন করিয়াছে। ঐ সকল শক্তির সকলেই উর্দ্ধ স্রোতস্বিনী, সকলেরই প্রবাহ উর্দ্ধদিকে। * উহারা দেহের করপদাদি অভিমুখে কখনই প্রবাহিত হয় না। করপদাদির মধ্যে উহাদের কোন ক্রিয়াও নাই, উহারা সকলেই মস্তিষ্কবাসি-মনেতে বিকসিত হয়, এবং অভ্যন্তরেই ক্রিয়া করে। এখন এই অবস্থাকে, আত্মার উদ্গতি বা উর্দ্ধগতি অবস্থা বলা যায় না কি?

শিষ্য। এটা উদ্গতি অবস্থা কিরূপে হইল তাহাতো বুঝিতে পারিলাম না?

আচার্য্য। কেন বুঝিলে না? শরীরের মধ্যে যত প্রকার শক্তির ক্রিয়া বা বিকাশ হয়, **চৈতন্যবিমিশ্রিত** সেই সমস্ত গুলি শক্তির সমষ্টিই জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়, তাহা অনেকবার বলিয়াছি, তাহা হইলে দেহ-ব্যাপক সমস্ত শক্তি গুলির উদ্গতি হইলেই জীবাত্মার উদ্গতি হইল। দেহের অধঃশাখা প্রশাখায় যে সকল রাজস ও তামস শক্তি ক্রিয়া করিতেছে,

* ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় একথা বিস্তার মতে বুঝান হইয়াছে।

তাহারা অতিশয় ক্ষীণ ও মৃদুভাবাপন্ন হইয়া, যেন মস্তিষ্কবাসি-মনের মধ্যে গিয়া সঙ্কোচিত হইল, এবং ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্যাদি সাত্ত্বিক শক্তি সকল উপচিত হইয়া অন্তঃসারের সঙ্গঠন পূর্ব্বক দেহের উর্দ্ধভাগ মস্তিষ্ক মধ্যে প্রকাশ পাইল; সুতরাং তোমার অস্তিত্বটা যেন সমস্ত দেহ হইতে গুটাইয়া গিয়া সেই উর্দ্ধদেশে অবস্থিতি করিল, অতএব তাহাকেই উদ্গতি অবস্থা বলা যাইতে পারে। উদ্গতিই "উন্নতি" শব্দের অর্থ, অতএব এই অবস্থা হইলেই জীবের উন্নতি অবস্থা বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি সাত্ত্বিক শক্তি রাশি বিকসিত হইয়া অন্তঃসারের পরিপুষ্টি হইলে পার্থিব বিষয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নিতান্তশ্লথ হইয়া যায়, তখন উর্দ্ধতন লোকের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং ইহাও একরূপ উদ্গতি, অতএব এমতেও অন্তঃসারের বৃদ্ধিকে উন্নতি বলা যাইতে পারে। কেবল ইহাও নহে, বেদ, উপনিষদ্ ও পুরাণাদি শাস্ত্রে বারম্বার কথিত হইয়াছে যে, ঐরূপ অবস্থা হইলে জীব, মরণান্তে অধস্তন পৃথিবী লোক পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধস্থিত চন্দ্রলোক ও সূর্য্যলোকাদিতে গমন করে,—"অথ যদি দ্বিমাত্রেণমনসি সম্পদ্যতে সোন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে, সসোমলোকং; সসোম লোকে বিভূতি মনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে॥ যঃ পুনরেতন্ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতে নৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষ মভিধ্যায়ীত সতেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে এবং হবৈ সপাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ সসামভি রুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীব ঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষ মীক্ষতে, তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ॥" (প্রশ্নোপনিষৎ) অতএব এইরূপ উদ্গতি হওয়া নিবন্ধনও অন্তঃসারের উৎপত্তিকে "উন্নতি" বলিয়া ব্যবহার করা হয়।

পক্ষান্তরে, যাহাদের অন্তঃসার বৃদ্ধি না হইয়া কেবল বহিঃসারেরই বৃদ্ধি, অর্থাৎ যাহাদের বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তি প্রভৃতি মনো বৃত্তি-সাত্ত্বিক শক্তি গুলির বিকাশ না হইয়া দেহের অধঃশাখা প্রশাখা ব্যাপক-ইন্দ্রিয় শক্তি প্রভৃতি-রাজস তামস শক্তির প্রবলতা হয়, তাহাদের সুতরাং অধোগতি হইল, এ নিমিত্ত তাহাদিগকেই অধোগত বা অবনত বলা যাইতে পারে।

বিশেষতঃ ইহাদের পার্থিব বিষয় বা পার্থিব পাদর্থের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা থাকা নিবন্ধন মরণান্তও উহারা এই পার্থিব জগতেই অবস্থিতি

করে, পার্থিব জগত্ পরিত্যাগ করিয়া কোন উর্দ্ধতন জগতে যাইতে পারে না, ইহাও বেদাদি শাস্ত্রেই লিখিত আছে, "অথৈতয়োঃ পথোর্নকতরেণ চনতানীমানি ক্ষুদ্রাণ্য সকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি, জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানম্ * * ॥" (উপনিষৎ) এজন্যও অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তিদিগকে অধোগত বা অবনত বলা গিয়া থাকে।

অতএব অন্তঃসারের পরিপুষ্টি বা শ্রীবৃদ্ধিকে যে উন্নতি ব্যবহার করা হয়, তাহা "বৃক্ষের উন্নতি, পর্ব্বতের উন্নতির" ন্যায় যোগার্থ যুক্ত, উহা মুর্খের "পণ্ডিত" উপাধির ন্যায় নির্ব্বৌক্তিক, নির্ব্বৌগিক বা অর্থ শূন্য নহে।

পরন্তু এতদ্ব্যতীত আর যে যে স্থলে উন্নতির কথা ব্যবহার করা হয়, তাহা ভ্রম, তাহা নির্ব্বৌক্তিক নির্ব্বৌগিক, এবং অর্থ শূন্য বাক্য। স্কুল, কলেজ ও পাঠশালাদি বিস্তার, এবং ইংরাজী ভাষা পোষাক পরিচ্ছদাদির অনুকরণ উন্নতি নহে, বিএ, এম, এ প্রভৃতি পাস করিয়া সমস্ত ইংরাজী গ্রন্থ বা ইংরাজী ভাষাকে অভ্যস্ত করাও উন্নতি নহে, কারণ আজকালকার পড়া বা পাস করার অর্থ যখন কতকগুলি কথা মুখস্থ করা, অথবা সত্য মিথ্যায় কতকগুলি বিষয় জানা মাত্র, তখন তাহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার উদ্গতি বা অধোগতির কোনই সংস্রব নাই, কতকগুলি কথা মুখস্থ করিলে বা জানিলে কিরূপে দেহের অধঃশাখাস্থিত আত্মার রাজস, তামস শক্তি গুলি ক্ষীণ মৃদু ও সুক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উর্দ্ধস্থ সাত্ত্বিক শক্তির পরিপুষ্টি দ্বারায়, অথবা অন্য কোন রকমে আত্মার উদ্গতি হইবে? কিরূপেই বা পার্থিব বিষয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিশ্লথ হইয়া দেহান্তে চন্দ্র সূর্য্যাদিলোকের দিকে আত্মা উত্থিত হইবে, তাহা আমরা সামান্য বুদ্ধি দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারি না। যখন ভাষার এমন কোন শক্তি সম্ভবে না যে উচ্চারণ মাত্রেই আত্মার ঐরূপ উদ্গতি করিতে পারে।

শিষ্য। ভাষার কোন উন্নতিদায়ক ক্ষমতা নাই, কিন্তু তন্মধ্যে যে সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানাদি নিহিত আছে তদ্দারা আত্মার ধীশক্তি যে বৃদ্ধি হয় তাহাও কি স্বীকার্য্য নহে? যদি হয় তবে তদ্দারাই উন্নতি হইল না?

আচার্য্য। ধীশক্তির বা বিবেক শক্তি পরিপুষ্টি হইয়া যে আত্মার উন্নতি সাধিত হয় তাহা অবশ্য সত্য, কিন্তু আজ কাল সাধারণতঃ লোক যাহাকে লেখাপড়া বলে তদ্দারা যে ধীশক্তি হয় তাহাও আমারা

বুঝি না। অন্যের সিদ্ধান্তিত বিষয়গুলি মুখস্থ করা নিতান্ত সহজ, উহাতে ধীশক্তি বা চিন্তার যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা যিনি ঐ সকল গুলি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি তাহা করিয়া রাখিয়াছেন। তবে আর তুমি কি চিন্তা করিবে ? অবশ্যই আমরা স্বীকার করি, যাহারা ঐ সকল গুলি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহারা ধন্য ও তাহারাই প্রবল ধীশক্তি সম্পন্ন, এবং তাঁহারা যে ৫ম শ্রেণীর অন্তঃসার সম্পন্ন, তাহা আময়া পুর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। টোলে অধ্যয়ন করিয়া তর্কচূড়ামণি, বিদ্যানিধি হইলে উন্নতি হয় তাহাও আমাদের বিশ্বাস হয় না। স্কুল কলেজের পড়াও যেমন মুখস্থ করা মাত্র, উহাও তেমনই মুখস্থ করা। আত্মার উন্নতি পক্ষে, দুইই সমান। কিন্তু ইংরাজী গ্রন্থ ও সস্কৃত শাস্ত্র ইহাতে বিশেষ তারতম্য আছে। সংস্কৃত শাস্ত্র কেবল মুখস্থ না করিয়া, যদি তাহাতে যাহা লেখা আছে, তাহা আন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবহারে পরিণত করে, তাহা হইলে, জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্যাদির বিকাশ হইয়া অন্তঃসারের চরমাবস্থায় মুক্তিও লাভ করিতে পারে। গ্রন্থের রচনাও এত সংক্ষিপ্ত এবং পরিমিত যে তাহা রীতিমত অধ্যয়ণ করিতে গেলেই বুদ্ধির ব্যয় না করিয়া কোন মতেই বুঝা যাইতে পারে না ; সুতরাং ধীশক্তি বিকাশেরও বিশেষ সম্ভব আছে, কিন্তু তাহা কয়জন লোকের দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলিলাম যে এখনকার টোলের পড়া আর স্কুলে পড়া উভয়ই সমান। ইংরাজী গ্রন্থে উক্ত দুইটিরই অভাব আছে, প্রকৃত আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, বা অন্য কোন প্রকার বিবেক বৈরাগ্যাদি প্রকাশক পুস্তক ইংরাজী ভাষাতেই নাই, অন্ততঃ কলেজাদির পাঠ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাহা নিশ্চয়ই নাই। ইংরাজী গ্রন্থের রচনা প্রণালীও এত সরল যে তাহা অধ্যয়নে (আমার বিশ্বাস) কিছুমাত্র বুদ্ধি বা চিন্তার আবশ্যক করে না। যদিও, নিতান্ত অল্প বুদ্ধির পক্ষে, কোন কোন স্থানে কিছু কিছু বুদ্ধি ব্যয়ের প্রয়োজন হইত, কিন্তু তাহার আবার এইরূপ সকল টীকা টিপ্পনী প্রকাশিত আছে, যে, তাহা দেখিলে বোধ হয় আত্মা ও মনশূন্য পুত্তলিকাও পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারে। অতএব ইংরাজী অধ্যয়নের দ্বারা ধীশক্তি বিকাশের কোন আশা নাই। তবে যে ইংরাজী শিক্ষান্বিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ইংরাজী শিক্ষা সমুৎপন্ন নহে, তাহা তাঁহাদের স্বাভাবিক।

জাতীয় একতাবন্ধন।

আজ কাল জাতীয় একতাবন্ধনের সম্বন্ধে অনেকে মতামত প্রকাশ করিতেছেন। সকলেই স্বীকার করেন যে, সমান জাতি, সমান ভাষা, সমান রীতি নীতি, সমান স্বার্থ, সমান ধর্ম্ম, সমান শাসনপ্রণালী হইলেই জাতীয়একতা বন্ধনের ভিত্তি দৃঢ়ীভূত হয়। ভারতে জাতি প্রতিষ্ঠা বা জাতীয় একতাবন্ধনের চেষ্টা এক এক সময়ে হইলেও উহা আশানুরূপ ফলবতী হয় নাই, এবং সমগ্র ভারতও উহার বলে বলীয়ান হইয়া, বিদেশীর সমক্ষে আপনার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দেয় নাই। পূর্ব্বে ভারতের এক একটি খণ্ড রাজ্যে এক এক সময়ে জাতীয় একতা বন্ধনের সুত্রপাত হইয়াছিল। প্রাতঃস্মরণীয় শিবজী এক সময়ে একটি মহাজাতিকে একতা-সুত্রে সম্বদ্ধ করিয়া, দীর্ঘকাল মহাপরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। এখন ইংরেজ প্রায় সমগ্র ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, ইংরেজের শাসনপ্রণালীর সহিত ভারতের প্রায় সমগ্র অধিবাসীর সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে স্বার্থ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। ইহার উপর ইংরেজের ভাষা সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গ বিহার, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, বোম্বাই মান্দ্রাজের অধিবাসীগণ পূর্ব্বে এক ভাষায় কথা-বার্ত্তা কহিয়া আপনাদের মনোগত ভাব পরস্পরকে জানাইতে পারিতেন না। কিন্তু এখন ইংরেজী শিক্ষার গুণে তাঁহারা এক ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া একবিধ বাসনা সিদ্ধির জন্য পরস্পরের মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন। যদিও এখন ইহাঁদের সংখ্যা অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ আছে, তথাপি সময়ে ঐ সংখ্যাক্রমেই বাড়িয়া উঠিবে। এজন্য সকলে আশা করিতেছেন যে, ইংরেজের ভাষা ও ইংরেজের প্রবর্ত্তিত শাসননীতির বলে সমগ্র ভারত একতাসুত্রে আবদ্ধ হইবে। ভারতের প্রধান স্থানে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইতেছে। এই মহাসমিতিতে সমবেত হইয়া, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ একবিধ রাজনীতির আলোচনা করিতেছেন, এবং আপনাদের হৃদয়গত ভাব প্রকাশ করিয়া, পরস্পরের সহিত একসুত্রে সম্বদ্ধ হইয়া উঠিতেছেন। ইহাতেও অনেকে আশা করিতেছেন, যে জাতীয় একতাবন্ধন কালে দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠিবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রাজনীতির আন্দোলন লইয়া যে একতা ঘটে, তাহা কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হয়। এই

সম্প্রদায় অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। জনসাধারণ দেশের অস্থিমজ্জা স্বরূপ। তাহারা ইংরেজীতে শিক্ষিত নহে; রাজনীতিও তাহারা ভাল বুঝে না। সুতরাং কেবল এই কারণে তাহাদের মধ্যে একতা সম্ভবে না। জাতীয় একতাবন্ধনের বীজ আমাদের মধ্যে আর একটি আছে। তাহাই আমাদের সর্ব্ব প্রধান বলিয়া গণনা করা উচিত। তাহা আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম।

সমান স্বার্থ হইলে পরস্পরের মধ্যে একতার আবির্ভাব হয়। প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে, ধর্ম্ম অপেক্ষা আমাদের প্রধান স্বার্থ আর কিছুই নাই। লোকে ধর্ম্মের জন্য স্ত্রী পুত্রের মমতা পরিত্যাগ করে, আত্মীয় স্বজন প্রীতি হইতে দূরে থাকে, ধন সম্পত্তি সামান্য লোষ্ট্রের ন্যায় চাহিয়া দেখে। এ সংসারে ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রধান স্বার্থ আর কি আছে? ধর্ম্মের জলদগম্ভীর উপদেশে অস্থির আত্মা স্থির হয়, অশান্ত চিত্ত শান্তিপ্রবণ হয়, দুরাত্মার হৃদয়ও ক্ষণ কালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া আপনার দুষ্কৃতি ভাবিয়া আপনিই ব্যাকুল হয় তাই বলি; সংসারে ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রধান স্বার্থ আর কি আছে? আমরা হিন্দু,—সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আমাদের অদ্বিতীয় আশ্রয় স্থল। আর্য্যাবর্ত্তে, দক্ষিণাপথে হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে, হিন্দু ধর্ম্মের মহিমা ঘোষিত হইলে, সকলেই সকলের প্রতি হৃদয়গত প্রীতি দেখাইতে অগ্রসর হইয়া থাকে। রাম বা যুধিষ্ঠিরের নামে বাঙ্গালীদিগের হৃদয়ে যে ভাবের সঞ্চার হয়, দূরতর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, সুদূর দক্ষিণাপথের হিন্দুদিগের হৃদয়েও সেই ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্য আমাদের যেরূপ বরণীয়, ভারতের অন্যান্য ভূখণ্ডের হিন্দুদিগেরও ঠিক সেইরূপ বরণীয়। সুর গুরু কল্প সায়নাচার্য্য দক্ষিণাপথবাসী হইলেও আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন। উপনিষৎ ভাগবত বা রামায়ণ মহাভারতের চিত্ত বিমোহিনী কথায় সমগ্র ভারতের হিন্দুদিগের হৃদয়ই দ্রবীভূত হইয়া থাকে। সুতরাং কেবল সনাতন হিন্দুধর্ম্ম দ্বারাই ভারতের সমগ্র অধিবাসীদিগের মধ্যে একতাবন্ধন ঘটিতে পারে।

ভারতে এখনও প্রায় পাঁচ কোটী মুসলমান বাস করিতেছে। এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধ প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীও আছে। তথাপি হিন্দুর সংখ্যা এত অধিক যে, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী তাহার সমক্ষে গণনার মধ্যে আসিতে পারে না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতাপের মধ্যেও হিন্দুধর্ম্ম আপনার আধিপত্য অক্ষত রাখিয়াছিল, মুসলমানেরা ভারতের নানাস্থানে প্রভুত্ব স্থাপন করিলেও হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব নষ্ট হয় নাই। এরূপ প্রভূত ক্ষমতাপন্ন অলৌকিক তেজঃপূর্ণ, অসামান্য জীবনীশক্তি সম্পন্ন ধর্ম্মের বলে যে জাতীয় একতার আবির্ভাব হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ ও সর্ব্বাপেক্ষা স্থিতিশীল হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

১ম ভাগ। ৯ম খণ্ড।

বেদব্যাস।

মাসিক পত্র।

পৌষ ১২৯৩

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

বিষয়	নাম	পৃষ্ঠা।
অষ্টমী পূজা। (ভোলা ও জগদম্বা)।	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি	১৯৩
মনুসংহিতা।	সম্পাদক	২০০
জাতীয় একতাবন্ধন।	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত	২০৫
সুখ কোথায়?	শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন শাস্ত্রী সরস্বতী	২০৯
সাধু দর্শন।	সম্পাদক।	২১৪

কলিকাতা।

২১ নং মিরজাফর্স লেন, "বেদব্যাস যন্ত্রে"
শ্রীশ্যামাচরণ বসু দ্বারা
মুদ্রিত ও শ্রীঅমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়
দ্বারা প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল শাঙ্করভাষ্য, ও শাঙ্করভাষ্যানুমোদিত

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা সমেত।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যাটি

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কর্ত্তৃক

বিশেষরূপে সংবর্দ্ধিত ও সংশোধিত।

এরূপ বাঙ্গালা পূর্ব্বে কখন প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য মায় ডাঃ মাঃ ২॥০ টাকা। কিন্তু বেদব্যাসের গ্রাহকগণকে মায় ডাঃ মাঃ ২৲ টাকায় দেওয়া যায়। মূল্য „৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, বেদব্যাস কার্য্যাধ্যক্ষ্য” এইরূপ লিখিয়া পাঠাইবেন।

বেদব্যাস কার্য্যাধক্ষ্য।

বেদব্যাস।

১ম ভাগ। ১২৯৩ সাল। ৯ম খণ্ড।

অষ্টমী পূজা।

জগদম্বা ও ভোলা পাগলার কথোপকথন।

প্রাণপুরগ্রামে বহুতর পূজা হইয়া থাকে। নিকটবর্ত্তি গ্রাম সমূহেও কম নয়; প্রায় দু পাঁচ বাড়ী বাদেই, প্রতি বাড়ীতে দুর্গোৎসব আছে। সকল খানেই; নানাবিধ উৎসব আনন্দের সহিত জগদম্বার পূজা হইতেছে। সকলেই আহার, নিদ্রা, গৃহকার্য্য বিসর্জ্জন দিয়া, দিবা রাত্রই এবাড়ী হইতে ওবাড়ী, ওবাড়ী হইতে সেবাড়ী, পরমানন্দে জগদম্বার দর্শন করিয়া বেড়াইতেছে। এই আনন্দের দিন ভোলাদাসের আনন্দ দেখে কে। মা হারা শিশু মা পাইলে উহার যে কি আনন্দ হয়, তাহা যে জানে সেই বলিতে পারে, আমরা পারিনা। তবে বাহিরে দেখিতে পাই, ভোলাদাস যেন আরও কিছু বেশিমত পাগল হইয়াছেন, ভোলাদাস কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও গান করেন, কখনও নৃত্যকরেন, কখন বা আপনি আপনিই কত কিছু আবদারি কথা বার্ত্তা বলেন। ভোলার আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিরাম নাই, অনবরতই এবাড়ী, হইতে সেবাড়ী সেবাড়ী হইতে ওবাড়ী, জগদম্বার দর্শন করিয়া ঘুরিতেছেন। কখন বা অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নুতন নুতন বিল্বপত্র আনিয়া, কখন বা সুদূর হইতে জবা পুষ্পাদি আহরণ করিয়া, কখন বা গম্ভীর জলপূর্ণ বিল্ ঝিল্ হইতে শ্বেত রক্তাদি পদ্মপুষ্পের আহরণ করিয়া, আপন ইচ্ছানুরূপ নানা রকমে মাকে সাজাইতেছেন; কখন বা পাঁচ ক্রোষ ব্যবহিত জাহ্নবীর জল আনীয়া মায়ের পাদপদ্মে সেচন করিতেছেন, কখন বা কাহার নিকট হইতে ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া কিছু খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া মায়ের নিকট উপস্থিত হইতেছেন। এবারে এক গাছী সুদীর্ঘ জবা পুষ্পের মালা ও কতক গুলিন বিল্বদল লইয়া জ্ঞানানন্দের বাড়ি যাইতেছেন; এবং নানারূপ ভাবভঙ্গীর সহিত নৃত্য করিতে করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে এই গানটি, ধরিয়া যাইতেছেন,—

(রাম প্রসাদী সুর)

আয় দেখিভাই! সাজাই গিয়ে।
যদি মনের মত দেখবি মায়ে॥
জবা ফুল আর বিল্বদলে, যে শোভা পায় মায়ের পায়ে।
তাহা মন জানে আর আমি জানি, আরজানে রামপ্রসাদ ভেয়ে॥
একে মা হেম বরণা, হেমে জড়িত-ভূষণ গায়ে।
তাতে জবা ফুলে সাজাইলে, তুলনা যায় লজ্জা পেয়ে॥
অর্দ্ধ চন্দ্রে চমকিত, কুটিল কুন্তল চয়ে।
মায়ের অর্ঘ্য দিলে কি শোভা পায়, সুধাও দেওয়ান মহাশয়ে॥"

অনন্তর, ঠিক সেই দ্বিপ্রহরের সময়, জ্ঞানানন্দের মণ্ডপে গিয়া, উপস্থিত হইলেন। মণ্ডপ আজিও, সেই কাল্‌কার মত, জন শূন্য। ভোলাদাস সময় পাইয়া পুনর্ব্বার গান, ধরিলেন।

(রামপ্রসাদী সুর)

আর কি ভোলা তোর ভুলে ভোলে,
এবার লম্ফ দিয়ে উ'ঠব কোলে।
ধুলোমাখা দেখে যদি, ফেলিস আমায় পায়ে ঠেলে।
তবে বাবার কাছে বলে দিব, ভোলা তার আব্‌দেরে ছেলে॥
বাবা যদি নাহি শুনে, তোর মোহিনী-মায়ায় ভুলে।
তবে মাথা খুঁড়ে মরবো, নাহয় ডুববো গিয়ে গঙ্গাজলে॥
কোলে হতে ফেলে দিলি, ধুলোর মাঝে সেই সকালে,
আবার, এখন তোর ঘৃণা হলো, কোলে নিতে মলিন বলে!

জগদম্বা। বাবা তোমার কোন চিন্তা নাই, আমার কার্ত্তিক গনেশও যেমন, তুমিও তেমন; তুমি এখন খেলা ধূলা কর, কিন্তু আমায় যেন কদাচ ভুলো না, আমি সন্ধ্যা বেলায় তোমার সকল ধূলা ধোয়াইয়া কোলে করিয়া ঘুম পাড়াব। তোমার ভয় কি, আমার ছেলের কি অসুখ আছে, না বিপদ আছে?

ভোলাদাস। মা! একটু ভাল করে দাঁড়া দেখি, আমি এই মালা গাছটি তোর গলে দিব, আর তোর হাতে, পায়ে, মাথায় এই জবাফুল ও পদ্ম ফুল কয়েকটি দিই, আর এই বেলপাতা কটি কেবল পায়েই দিব; তবে জবা ফুলের সঙ্গে সঙ্গে মাথায়ও একটি দিব। (এই বলিয়া আস্তে আস্তে মায়ের নিকট গিয়া মাকে সাজাইলেন, সাজাইয়া মনে মনে যেন কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে ও সাশ্রুনয়নে বলিলেন) এখন যদিতাহারা একবার দেখ্‌ত।

জগদম্বা। ভোলাদাস! ওকি বলিলে?

ভোলাদাস। বাবা বলেছেন্ তুই সবই জানিস্, তবে আবার জিজ্ঞাসা করিস কেন? তা'শুনবি শোন; বলিলাম কি, যে, তাহারা যদি এখন একবার আসিয়া তোকে দেখত' তবেকি আর ঐরূপ করতে পারত?

জগদম্বা। (সস্নেহে ও আভিমুখ্যের সহিত) বৎস! এই অনন্তব্রহ্মাণ্ডে কাহার সাধ্য যে আমার সন্তানের কিছু অনিষ্ট করিবে! তোমায় কে কি করিয়াছে, বল দেখি?

ভোলাদাস। না মা, আমায়, কেহ কিছু করে নাই। তবে কিনা এই গ্রামে বি, এ, ডি, বোনার নামে একব্যক্তি আছে, তাহার বাগানে অসংখ্য জবাফুল দেখিয়া মা তোর জন্যে আনিতে গিয়াছিলাম, এবং পরমানন্দে অনেকগুলি ফুলও তুলিলাম। এমন সময়, সেই বোনার্‌জি দূর হইতে দেখিতে পাইয়া আমায় বলিল, "কোন্ হ্যায়, হু য়া কোন্ ফুল্ তোড়তা হ্যায়?" আমি বলিলাম "আমি ভোলাদাস, মায়ের জন্যে কএকটি ফুল লইতে আসিয়াছি।" তখন, বোনার্‌জী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কিঃ, এই ফুলদিয়া পুতুল পূজা! তুমি জান, আমরা পুতুল মুতুল মানি না, পৌত্তলিকতার প্রশ্রয়ও দিই না? নহিলে কি, এ বাগানে আজকার দিনে এত ফুল থাকে? তুমি অতি অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছ, আর কদাচ তুলিও না, যাঁহা তুলিয়াছ তাহা দিয়া যাও, তোড়া করিয়া সাহেব বাড়ী দেওয়া যাইবে; অবশিষ্টগুলি এই টেবিলে সাজান থাকিবে, তুমি অন্যত্রগিয়া পাগ্‌লাম কর।" তখন আমি বলিলাম, বোনার্জি! ওকথা বলিস্‌না, মা, আমারও মা, সে তোদেরও মা, মা পুতুল নয়। বোনার্জি! তুই কি পাগল হয়েছিস্! পুতুল কি কেহ মানে, না পূজা করে? মা যে আমার সঙ্গে কথা বলে, গান শুনে, আমার দিকে তাকাইয়া থাকে, কত ভাল বাসে, তাই মাকে মনের সাধে ফুল দিয়া সাজাইয়া থাকি, কৈ, পুতুলতো আমি কোন বাড়ীতেই দেখিতে পাইলাম না? পুতুলকি কখন আমি, সাজাই?" তখন সে আবার আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "রেখে দাও তোমার মা, ও তোমারই মত উন্মত্তেরই মা, ও আমাদের মা নহে; আমাদের মাকে বা বাবাকে আমরা চন্দ্রসূর্য্য-কুসুম ও ভক্তিবারিদ্বার পূজা করিয়া থাকি।" তখন আমি বলিলাম, "না বোনার্জি আমার মাই তোদের মা, মা বলেছে, যে, এ সংসারে সকলেই তার ছেলে, এইজন্য জগতে সকলেই তাহাকে "জগদম্বা" বলে। আর তোরা যে, ভক্তি ভক্তি পূজা পূজা করিস্ আমি বুঝিনা, মায়ের আবার "ভক্তি, পূজা" কি? আমি, মায়ের সংসারে থাকিয়া, মায়েরই কার্য্য করি। জবাফুল বিল্বদলে সাজাইলে মাকে বড় ভাল দেখি, তাই আমি যেখানে যা পাই মাকে আনিয়া দিই, ইহাতে আবার পূজা ভক্তি কি? যদি ইচ্ছা হয় তবে তোরাও আয়, জবাফুল বিল্বদল লইয়া আয়, মায়ের পা হইতে সর্ব্বশরীর জবাফুলে সাজাইয়া দেখিবি, এমনরূপ আর কখন দেখিস্ নাই!" কিন্তু, ইহাতে বোনার্জি আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ওসব পাগলামি অন্যত্র করগে, এখানকার ফুল দিয়া পুতুল পূজা হইবে না," এই বলিয়া আমার হাতের ফুলগুলি স্পর্শ করিয়া ফেলিল, আমি তৎক্ষণাৎ ফুলগুলি পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে

চলিলাম। তাই বলিলাম, এখন যদি, তাহারা, একবার আসিয়া, তোকে দেখিত, তবে কি ঐরূপ করিত?

জগদম্বা। (স্মিত মুখে) কেন বাবা, দেখিলে কি হইত?

ভোলাদাস। দেখিলে, আমার মনে যেরূপ হইতেছে, তাহাদের মনেও এইরূপই হইত, তাহা হ'লে আর কখন ঐপ্রকার আচরণ করিত না।

জগদম্বা। (স্মিত মুখে) তোমার মনে কি হইতেছে?

ভোলাদাস। (সানন্দাশ্রু) মা! তোর নাকি, মা বাবা, সমস্তই ফাঁকী, তাই তুই ইহা বুঝিতে পারিস্ না। আমার মত তোরও যদি এসংসারে এক মা ভিন্ন আর কেহই "আমার" বলিতে না থাকিত, কেবল মাই রক্ষক, মাই ভক্ষক মাই পালক, এবং মাই গতি হইত, তবে তুই মা কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারিতিস্; মায়ের জন্যে মন কেমন করে তাহাও জানিতিস্, এবং সেই মাকে মনের সাধে সাজাইতে পারিলে, কিরূপ দেখায় কিরূপ মনে হয় তাহাও বুঝিতে পারিতিস্। কিন্তু, ভোলাদাসের তো সেরূপ নয়, তুই তো আমার ফাঁকীর মা নহিস্, কিম্বা কাব্য কবিত্বের মাও নহিস্, তুই আমার সত্য সত্য জ্বলন্ত জাগ্রত মা। তাহাতে আবার, এই ত্রিসংসারে কেবল তুই ভিন্ন, আমার আর "আমার" বলিতে কেহই নাই; আবার এই সংসারে, মা তুই ভিন্ন, আমাকে "আমার" বলে কোলে নেবে এমনও কেহ নাই। মা! তুই, যে ঠাকুর দাদার মেয়ে, তুই আমায় যে কিরূপ ভাবিস্ তা জানি না, কিন্তু আমি কেবল তোকেই ভরসা করিয়া থাকি। মা! তোকে যখন না দেখিতে পাই তখন চারিদিকেই অকূল সমুদ্র দেখি। মা! একমাত্র তুই কেবল ভোলা পাগলার গতি, ভোলা পাগলার মতি, তাই তোকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না। ভালবাসী বলিয়াই এই সকল ফুল পাতা দিয়া তোকে মনের মত সাজাইয়া থাকি, এবং যেখানে যে ভাল ভাল খাদ্যবস্তু পাই তাই তোকে আনিয়া দিয়া থাকি, তাতে আমার মনে কি হয় তাহা তুই কি রূপে জানিতে পারিবি? তোর যে মা নাই! মা গো! আমি তো তোর পেটের ছেলেই বটে, কিন্তু তোর যেমন টুক্‌টুকে পা দুখানি! উহাতে জবা ফুলে সাজাইলে, ঐ মহিষের মনও উহাতে বিলীন হইয়া যায়। তাই বলিয়াছিলাম যে, এই সময় যদি বোনার্জির দল আসিয়া তোকে একবার দেখিত, তবেকি আর ঐরূপ কার্য্য করিত?

কার্ত্তিক।—দাদা মহাশয়! আপনি কি অন্যমনা ছিলেন?

ভোলাদাস।—না ভাই! অন্যমনস্ক তো হই নাই, কেন কি হইয়াছে?

কার্ত্তিক।—আপনার কথায়, যেন প্রকাশ হইল যে, দুরাত্মা মহিযাসুর মায়ের ছেলে নয়। কিন্তু বাস্তবিক ত মায়ের ছেলেই বটে? তবে ও না কি নিতান্ত দুর্ব্বৃত্ত ও অশান্ত তাই মা উহাকে শিক্ষাদিতেছেন, মা তো ক্রোধ করিয়া উহাকে মারিতেছেন না?

ভোলাদাস। ভাই! আমি সে ভাবে বলিনাই; সকলেই যে মায়ের ছেলে, আমাদের ভাই, তাহা আমি অবগত আছি; তবে কিনা, যে পুত্র কখনই মাকে চিনিতে পারেনাই, দেখেনাই, মা আছে বলিয়াও জানেনা, প্রত্যুত মাকেই অন্যভাবে বুঝিয়া বিদ্বেষ করিয়া থাকে, তাহারা আমাদের দৃষ্টিতে, মায়ের সন্তান বলিয়াপরিগণিত হয় না; তবে মা মনে মনে কি ভাবে তাহা মাই জানে। এই দেখ, এই দুর্ব্বৃত্ত মহিষাসুর মাকে চিনিতে পারেনাই। মাকে সাধারণ স্ত্রীলোক মনে করিয়া ভয়ানক বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছে, আবার ঐ দেখ ঐ বোনারজির দল! উহারাও, মাকে না চিনিয়া না দেখিয়া, পুতুলজ্ঞানে ঘৃণা করিয়া থাকে; সুতরাং, উহারা মায়ের সন্তান হইলেও মায়ের শত্রু বলিয়া গণ্য।

ভাই! উহারা আর এক অদ্ভুত কথা বলে! তাহা কখনই শুনি নাই! উহারা বলে,—উহাদের নাকি স্বতন্ত্র আর একজন, মাওনা বাবাও না, আবার কবিত্বের ভাবে, মা বলিলেও হয়, বাবা বলিলেও হয়, আছে, তাহাকে নাকি চন্দ্র কুসুম, সূর্য্য কুসুম, ও ভক্তিজল, প্রেম ফল দিয়া পূজা করে। ভাই! আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তুমি কিছু বলিতে পার কি?

কার্ত্তিক। এবিষয় মায়ের নিকটই জিজ্ঞাসা করুন, মায়ের অজ্ঞাত কোন তত্ত্বই নাই।

ভোলাদাস। হ্যা মা! বোনার্‌জিদের ও কথার অর্থ কি?

জগদম্বা। (গম্ভীর ভাবে) ও কথার প্রকৃত পক্ষে কোন অর্থই নাই, উহা কথার কথা বা কবির কথা মাত্র। উহারা টেবিল সাজান, ও চুল বাঁধিবার সময় "প্রদীপ কুসুম" "জোনাকী কুসুম" গ্রহণ করেনা, আহারের কালেও "স্নেহবারি পান, এবং "ভাল বাসা খাদ্য" ভোজন করেনা; সে সময়ে সত্য সত্য "কুসুম", সত্য সত্য জল, ও সত্য সত্য ভাত। কিন্তু আমাকে আনিয়া দেওয়ার কালেই মুখে মুখেই সব শোধ করে; তখন, চন্দ্র সূর্য্য কুসুম ও ভক্তি বারির ভোগ দিয়া থাকে। বাস্তবিক উহাদের প্রকৃত অনুরাগ নাই, তাই আমার সম্বন্ধে ঐ সকল উৎপ্রেক্ষা এবং রূপক কল্পনা করে। উৎপ্রেক্ষা বা রূপক কল্পনাই, আমার প্রতি অনুরাগ না থাকার, প্রমাণ করিয়াদেয়। প্রকৃত অনুরাগ থাকিলে, সে সরল ভাবে মন খুলিয়া, সকল কথা বলে এবং আচরণ করে, তখন উৎপ্রেক্ষা বা রূপকাদি মনে হইতেই অবকাশ থাকেনা। উৎপ্রেক্ষা বা রূপক কল্পনা প্রকৃত অনুরাগের আবরণ স্বরূপ, উহা থাকিতে প্রকৃতানুরাগ মনে আইসে না। যে ব্যক্তি আমাকে, গর্ব্ভধারিণীর ন্যায় সত্য সত্যই ক্ষণস্থায়ি-প্রসবিত্রী মা বলিয়া ধারণা রাখে, তাহারই, মাতৃ ভাবে আন্তরিক অনুরক্তি হয়, কিন্তু যে নানা প্রকার অর্থের কল্পনা করিয়া অনুরোধে আমাকে মা বলে, তাহার মাতৃ অনুরক্তি হয় নাই! আবার পিতৃ অনুরাগ সম্বন্ধেও এইরূপই জানিবে। কোন অর্থের কল্পনা না করিয়া যদি

প্রকৃত পিতৃ দৃষ্টিতেই দেবদেবকে দেখে, তবেই প্রকৃত পিতৃ অনুরক্তি হইয়া থাকে। ভোলাদাস! আমার পূজা সম্বন্ধে ও ঐরূপই জানিবে। যাহারা আমার প্রকৃত অনুরাগীপুত্র তাহারা "পূজা ভক্তি" বলিয়া, আমার কিছু করেনা, কিম্বা পূর্ব্বের কৃতজ্ঞতা পরিচয়ের নিমিত্ত, অথবা ভবিষ্যতে কিছু লাভ করার জন্যেও আমার কিছু করেনা। কিন্তু তাহারা আমাকে জবা, বিল্ব পত্র, পদ্ম, কুঞ্জ, কামিনী প্রভৃতি পুষ্প পত্রাদি দ্বারা যথেচ্ছায় সাজাইয়া অপরিমিত আনন্দে উন্মত্ত হয়; এবং অন্যান্য সকল প্রকার রূপলাবণ্যের দর্শন পিপাসা এককালে নিবৃত্ত হইয়া, নয়নদ্বয়ের সফলতা মনে করিয়া থাকে। আবার আমার মুখে, একএক খাদ্য বস্তু সমর্পণ করিতে পারিলেই, যেন তাহারা নিজ রসনা, পরিতৃপ্তি অপেক্ষায়ও শতগুণে তৃপ্তি লাভ করে। এবং দ্রব্যাহরণাদির নিমিত্ত যে পরিশ্রম হয়, তাহাও ধন্য এবং সফল বলিয়া মনে করিয়া থাকে। বৎস! এইরূপ পূজাই আমি আদরে গ্রহণ করিয়া থাকি। তদ্ব্যতীত কেবল মুখে মুখে কথার দ্বারা কবিত্ব প্রকাশ করিলে আমার পূজা বা উপাসনা করা হয় না।

দ্বিতীয়তঃ,—এই সংসারে যাহারা আমার উপযুক্ত পুত্র, যেমন তুমি, তাহারা এই ত্রিভুবনকেই আমার সংসার বলিয়া অবগত হয়। তাহারা জানে যে এই ত্রিভুবনে কেবল আমিই একমাত্র প্রসূতি ও কর্ত্রী, আর ব্রহ্মা অবধি কীট পর্য্যন্ত সকলেই আমার সন্তান, এবং এই ত্রিভুবনই আমার সংসার গৃহ,-আর তাহারা সকলেই আমার পরিবারান্তর্গত একান্নভোগী ছেলে। অতএব এই ক্ষণস্থায়ি-পিতা মাতার সংসারে একান্ন ভোগী সন্তানও যেমন যেমন আচরণ করে, উহারাও আমার সম্বন্ধে, সেই সেই রূপ আচরণ করে। ক্ষণস্থায়ী পিতা মাতার, একান্ন ভোগী পুত্রগণ, যাহাকিছু অনুষ্ঠান করে, তৎসমস্তই পিতা মাতার সংসারের কার্য্য বলিয়া মনে করে, এবং উপযুক্ত হইয়া, সেই পিতা মাতার সংসারের দ্রব্যের দ্বারাই তাঁহাদিগের পরিচেষ্টা করিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়। পিতার জমীদারী হইতেই কর আদায় করিয়া, পিতৃমাতৃ শুশ্রূষা করে, পিতার বাগান হইতেই ফল মূলাদি আনিয়া তাঁহাদিগকে দেয়, তাঁহাদের তণ্ডুলাদি পাক করিয়াই তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করে, অবশেষে স্বয়ং তাহাদের প্রসাদ গ্রহণ করে। আমার উপযুক্ত পুত্রগণও সেইভাবেই সকল কার্য্য করে, উহারা যাহা কিছু করে, সমস্তই আমার সংসারের কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে। আমার রাজ্য হইতেই ভাল ভাল পুষ্পও পত্রাদি আহরণ করিয়া আমার দেহ বিভূষিত করে, আমারই রাজ্যের ধূপ, গুগ্‌গুল, কর্পূরাদি গন্ধ দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক আমাকে আমোদিত করে এবং আমারই রাজ্যের সুস্বাদু ফল মূলাদি সংগ্রহ করিয়া আহারের নিমিত্ত আমার নিকট উপস্থিত করে, পরে ঐ পুষ্প, পত্র, গন্ধ দ্রব্য, ও খাদ্য দ্রব্যাদি আমার প্রসাদ হইবে তাহায়া গ্রহণ করিয়া থাকে। কারণ, তাহারা জানে, যে, পিতা মাতা যতদিন

থাকেন ততদিন তাঁহাদেরই সংসার, তাহাদেরই জমীদারী, সমস্তই তাঁহাদেরই থাকে; পুত্রের, কোন বস্তুতেই অধিকার জন্মেনা, তবে পিতা মাতার ভোগাবশেষ যাহা থাকে, তাহাতে পুত্রেরই সম্পূর্ণ অধিকার। সুতরাং পিতা মাতার দ্রব্য পিতা মাতার নিকট উপস্থিত না করিয়া নিজে ভোগ করিলে চুরী করার পাপ হইয়া থাকে, কিম্বা পিতা মাতাকে "বাগানে গিয়া ফল পাড়িয়া খাও বলিলেও" পুত্রের কর্ত্তব্য কার্য্য করা হয় না। অতএব তাহারা ইহাই জানে যে, আমি এবং দেবদেব যতদিন আছি, আছেনও ততদিন আমাদেরই সংসার আমাদেরই রাজ্য, এবং তাহাদের কোন বস্তুতেই কোন রূপ অধিকার নাই। ইহা বাস্তবিকও সত্য; কিন্তু বৎস! আমার ভোগাবশেষে (প্রসাদে) তাহাদেরই সম্পূর্ণ অধিকার। তাই সমস্ত বস্তুই আমার নিকট উপস্থিত না করিয়া নিজের উদরসাৎ করেনা, কিম্বা আমাকে বাগানে গিয়া ফল পাড়িয়া খাইতেও বলে না, অথবা আমার দ্রব্য সকল চুরী করিয়া খাইয়া, আমাকে ধন্যবাদ দিয়াই ক্ষান্ত হয় না। আমার সমস্ত প্রকার শুশ্রূষাই উহারা এই ভাবে—এই নিয়মে করে। বৎস! ভোলাদাস তুমিও এই নিয়মেই করিতেছ ও করিবে; ইহাতে ঐহিকপারত্রিক সকল প্রকারেই কল্যাণ হইয়া থাকে।

কিন্তু বাবা! ইউরোপাদি দেশে "মিলিত পরিবারের" নিয়ম নাই, তাহারা একটু বড় হইলেই একটা স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া, নিজে পিতা মাতা হইতে পৃথক্ হয়, পিতা মাতার কোন ধারই ধারে না। তখন কেবল পিতা মাতাকে প্রকাশিত স্থানে ধন্যবাদ দিয়াই সারে। তুমি যে বোনার-জির কথা বলিয়াছ উহারা এদেশীয় হইলেও অদৃষ্টদোষে ফিরিঙ্গী-ভাবাপন্ন। সুতরাং উহারাও মিলিত পরিবার ভাল বাসেনা, বাবা মায়ের কোন ধারই ধারে না, তাই আমাকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে, আমার কোন বস্তুই আর আমার নিকট উপস্থিত করেনা, নিজেরাই উদরসাৎকরে। আমার দ্রব্য সকল চুরী করিয়া যথেচ্ছায় ভোগ করিয়া, আমার কেবল মুখে মুখে কাব্য কবিত্বের দান করিয়া, কিম্বা প্রকাশ্য স্থানে দুটা ধন্যবাদ দিয়াই সারে। আর বলে যে এই সংসারে আমি যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আমার ভোগের নিমিত্ত নহে, কিন্তু তাহাদিগেরই ভোগকরার জন্য। ভোলাদাস! তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও যে উহারা কোন প্রমাণের দ্বারা বুঝিতে পারিল যে এই সকল বস্তু আমি কেবল উহাদেরই ভোগকরার নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছি?

বাস্তবিক আমারই ভোগের নিমিত্ত আমি এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়াছি, আর আমার প্রসাদ পাইবার নিমিত্ত তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, এবং তাহারই নিমিত্ত চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় ও দান করিয়াছি। এই কথা স্মরণ রাখিয়া তুমি সমস্ত কার্য্য করিবে, এবং আমর অন্যান্য ও পুত্রগণকে করিতে বলিবে। এ, বি, ডি, বোনারজি প্রভৃতির কোন কথা শুনি ও না।

(এই বলিতে না বলিতেই বাজে লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, সুতরাং,

আজকার কথোপকথন, এই খানেই সমাপ্ত হইল। ভোলাদাস ও জগদম্বার অমৃতময় উপদেশ শ্রবণে কৃতার্থন্মন্য হইলেন, এবং ভক্তিমদে উন্মত্ত হইয়া সমুত্যে মায়ের গুণ গান করিতে করিতে, প্রস্থান করিলেন।)

(রামপ্রসাদী সুর)

মায়ে বলেছে, মায়ের সংসার। তবে ভোলা কেন বলে "আমার"। টাকা কড়ি বাগান, বাড়ী, সবই যদি হ'লরে মা'র! তবে তুমি কেন ভেবে মর, মিছা ব'লে "আমার আমার"। মায়ের আদেশ অনুসারে, করিতেছি হুকুম প্রচার। আজ রাজেশ্বরীর মুলুক হ'ল (কেহ) বলোনা আর "আমার আমার"। মায়ের হুকুম না মানিলে, দেখতে পাবে মায়ের বিচার। এবার ভোলা কিন্তু ব'লে খালাস, এড়াইয়ে সংসারের ভার।

মনুসংহিতা।

আমরা, শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন, বহু দিবস হইতে মনুসংহিতার সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। ইহাতে অনেকে মনে করিয়াছেন, যে, মনুসংহিতা সম্বন্ধে আমাদের, যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা বুঝি এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। কিন্তু তাহা নহে। কারণ এখন পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃত বিষয়ে উপস্থিত হই নাই। তদ্ব্যতিত আরও কত কথা বলিবার আছে। ক্রমশঃ সে সমস্তই আমরা যথাক্রমে পাঠক সমিপে ধরিব।

মনুসংহিতার শেষবারের প্রবন্ধে, স্থানাভাব বশতঃ, আমরা, অধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অতি সঙ্ক্ষেপে আমাদের বক্তব্য বিষয়, শেষ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আরও কিছু বিস্তারমতে আলোচনা না করিলে মন্তব্য বিষয় (শূদ্রাদির বেদাধ্যয়ন নিষেধ কেন) বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। অতএব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আরও একটু বিশদ ভাবে বুঝিয়া লইব।

সোজা কথায় বলিতে হইলে, তখনকার, অর্থাৎ ঋষিদের সময়ে, অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ছিল জানা, এবং জানার উদ্দেশ্য কার্য্য করা, অর্থাৎ অধ্যয়ন দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হইল তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া, তজ্জাত ফল ভোগ করা। সুতরাং, বুঝাগেল এই, যে প্রাচীন কালে কার্য্য করার জন্যই অধ্যয়ন প্রচলিত ছিল। ইহা ব্যতিত, তাঁহাদের অধ্যয়নের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে, যে প্রকার শুদ্ধ বাহ্য মান, মর্য্যাদা, উপাধি, সমাদর প্রভৃতি পাইবার জন্য, কিম্বা কোন শ্বেতাঙ্গের চাকর-গিরী করিবার নিমিত্ত, পুঁথিগত বা অক্ষরগত অধ্যয়ন সৃষ্টি হইয়াছে, যদ্দারা মনুষ্যত্বের উপচায়ক

কোন গুণই অর্জ্জন করা যায় না, বরং অতিশয় পরিশ্রমজনিত জীবনের অনিষ্টজনক নানারূপ উপদ্রব আসিয়া উপচিত হয়, এরূপ বৃথা অধ্যয়নকে তাঁহারা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। যে সময়ে, বেদাদি মহাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে, পাত্রাপাত্রে বিধি নিষেধ ছিল, তখনকার অধ্যয়নের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। দুঃখের বিষয়, এই বিষয়টি সকলে অবগত নহেন; সুতরাং, এত বিবাদ। সেই রহস্য বুঝিতে পারিলে, এত বিবাদও থাকে না, দেবপূজ্য মনুদেবও আমাদের ন্যায় নরককীট প্রাণি দ্বারায়ও এরূপ তিরস্কৃত হন না।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিলাম যে অধ্যয়নের উদ্দেশ্য জানা, এবং জানার উদ্দেশ্য কার্য্য করা। সংসারে কার্য্য করিতে হইলেই জানার আবশ্যক হয়, এবং জানিতে হইলেই, হয়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাহারও নিকট "হাতে কলমে" শিক্ষা পাইয়াই হউক, অথবা মৌখিক উপদিষ্ট হইয়াই হউক, অধ্যয়ন করিতে হয়। উদাহরণ দ্বারা আর একটু বুঝাইব। মনে করুন আমাকে আহারাদি নির্ব্বাহের জন্য রন্ধন কার্য্য করিতে হইবে। সুতরাং, প্রথমে, যে যে প্রক্রিয়ার দ্বারা রন্ধন কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, সেই সেই প্রক্রিয়া, আমার জানা আবশ্যক। যখন, ঐ সমস্ত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমার জ্ঞান জন্মিল, তখন উহা কার্য্যে পরিণত করিলে, আমার ইপ্সিত ফল লাভ হইল। কিন্তু, সেই প্রক্রিয়া গুলি অবগত হইবার আমার উপায় কি? আমি, যদি নিজ কল্পনা বলে, উহা সংসাধন করিতে যাই, তাহা হইলে হয়ত ইহজীবন অতিবাহিত হইয়া যাইবে, তথাপি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; সুতরাং, সুদক্ষ রন্ধন নিপুণ ব্যক্তির নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহারই উপদেশে আমাকে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ইহারই নাম প্রকৃত অধ্যয়ন। এইরূপ অধ্যয়ন সম্পন্ন হইয়া, জ্ঞান অর্জ্জন পূর্ব্বক "কার্য্য" করিলে, প্রকৃত অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। উপদেশ না পাইয়া না জানিয়া কোন কার্য্যই কেহ করিতে পারে না। সমস্ত ইতিহাস, ইহার সাক্ষ্য দিতেছে, সমস্ত প্রাণি জগৎ এই মহান্ সত্যের অনুমোদন করিতেছে, এমন কি, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এই নিয়মে পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং সর্ব্বদর্শী ঋষিরাও বারম্বার এই উপদেশ দিয়াছেন "জ্ঞানের জন্য অধ্যয়ন এবং কার্য্যের জন্যই জ্ঞান।" কার্য্য ব্যতিত জ্ঞানার্জ্জনের এবং তন্নিমিত্ত অধ্যয়নের কোন মূল্য আছে বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না। যিনি

যতটুকু কার্য্য করিবেন তিনি ততটুকুই অধ্যয়ন করিবেন, অথবা যিনি যতটুকু অধ্যয়ন করিবেন তিনি সেই টুকুই কার্য্যে পরিণত করিবেন; কারণ, অধ্যয়ন করিয়া যদি কার্য্যে পরিণত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার সেরূপ বৃথা অধ্যয়নে লাভ কি? অতএব বুঝিলাম, সেকেলে মতে, যাঁহার রন্ধন কার্য্য, তাঁহার রন্ধন কার্য্য অধ্যয়ন করাই আবশ্যক ছিল, যাঁহার, শিল্প-কার্য্য, তাঁহার, শিল্প-কার্য্য অধ্যয়ন করা আবশ্যক, যাঁহার কৃষিকার্য্য, তাঁহার কৃষিকার্য্য জ্ঞানের অধ্যয়ন বিধেয়, যাঁহার বাণিজ্য কার্য্য, তাঁহার বাণিজ্য বিষয় জ্ঞানের জন্য অধ্যয়ন বিধেয়, যিনি রাজা, তাঁহার রাজনীতি অধ্যয়ন প্রয়োজন, যিনি গৃহিনী, তাঁহার গৃহকার্য্য অধ্যয়ন প্রয়োজন, এইরূপে যাঁহার কার্য্য আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান, তাঁহার আধ্যাত্মিকজ্ঞানের জন্য অধ্যয়ন করাই একান্তকর্ত্তব্য। অবশ্যই, এই অভিনব কালে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে, পাশ্চাত্য সভ্যতালোকে প্রতিফলিত মতানুসারে, এ সমস্ত ভাব সম্যক বিসদৃশ বোধ হইতে পারে, কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার ঋষিদিগের দৃষ্টিতে এইরূপ "কার্য্যানুযায়ি" জ্ঞানচর্চ্চা অতীব অনুষ্টেয় ও আত্মার কল্যাণপ্রদ বলিয়া, বড়ই সমাদৃত ছিল। তাঁহারা ভুয়ো ভুয়ো অধ্যয়ন এবং উদ্দেশ্য বিহীন কার্য্যকে, মূর্খের, বর্ব্বরের, উন্মত্তের, জড়ের, এমন কি, পশুর কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং, যাহাকে ইহজীবনে কখনও রান্ধিতে হইবে না, তাহার, বৃথা সময়াতিপাত করিয়া, পরিশ্রম পূর্ব্বক রন্ধন কার্য্য অধ্যয়ন, উন্মত্তের কার্য্য মনে করিতেন। যাহাকে, কস্মিনকালেও, কৃষিকার্য্য করিতে হইবে না, তাঁহার হলচালন-প্রণালী অধ্যয়ন করিবার জন্য সময় নষ্ট করাকে, মূর্খের কার্য্য বলিয়া ভাবিতেন। যিনি, কোন জন্মেও রাজকীয় কার্য্য করিতে পাইবেন না, তাঁহার রাজনীতি চর্চ্চা করাকে, নেহাত বর্ব্বরের কার্য্য বলিয়া, নিতান্ত অপদার্থ দৃষ্টিতে দেখিতেন। এইরূপ, শিল্পির বাণিজ্য শিক্ষা, বণিকের শিল্প শিক্ষা, কৃষকের রাজনীতি চর্চ্চা ও অনধিকারীর আধ্যাত্মিক আলোচনা, এ সমস্ত অসভ্যতার ও বালোচিত কার্য্য বলিয়া ভাবিতেন। দ্বিতীয়তঃ, অধ্যয়ন জন্য যে প্রভূত মানসিক পরিশ্রম হয়, তাহাতে, যে পরিমাণ মস্তিষ্কের ক্ষয় হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য বলক্ষয়, বুদ্ধিক্ষয়, শারীরিক অসুস্থতা ও তজ্জনিত যে পরিমাণ আয়ুক্ষয় ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে, সে সমস্ত তাঁহারা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেন। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বহু মূল্য সময় যে বৃথায় অতিবাহিত হইয়া যায়, সেদিকেও তাঁহাদের

দৃষ্টি থাকিত। সুতরাং, একদিকে, উদ্দেশ্যবিহীন অধ্যয়ন, যাহা পরিণামে কোন রূপই সুফল প্রসব করে না, আবার অন্যদিকে, বৃথা অধ্যয়ন জন্য বল, বুদ্ধি, আয়ু ইত্যাদি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়, যাহার অভাবে মনুষ্য আপনার মনুষত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়া বসে। এই সমস্ত ঘোর অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখিয়াই, পরিণামদর্শী ঋষিগণ যাহার যতটুকু কার্য্য, তাহাকে ততটুকুই অধ্যয়নে অনুমতি দিয়াছেন। যে কার্য্য আমাকে ইহজীবনে কখনই করিতে হইবে না, তাহার জন্য, আমি আমার সমস্ত বল বুদ্ধি আয়ু পর্য্যন্ত ক্ষয় করিয়া, কেন পণ্ডশ্রম করিব। তবে আর উদ্দেশ্য বিহীন কার্য্যকারীর সহিত, পশুর ভিন্নত্ব কোথায়? সুতরাং, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ ভুয়ো, অথচ মহান অনিষ্টকর কার্য্যে কেন প্রশ্রয় দিবেন? অতএব, এখন আমরা বুঝিলাম, যে, প্রাচীনকালের অধ্যয়নের উদ্দেশ্য, এবং এখনকার অধ্যয়নের উদ্দেশ্য, সম্পূর্ণ পৃথক। আর, সেই প্রাচীনকালের অধ্যয়ন জিনিষটিও যে, এখনকার অধ্যয়নের তুলনায়, সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই সবিস্তারে বুঝাইয়া আসিয়াছি। এই দুইটি বিষয় পাঠকগণের স্মরণ থাকিলেই, আমরা পূর্ণ ভরসা করি, যে; আমাদের আলোচিত বিষয়, তাঁহাদের বুঝাইতে সক্ষম হইব।

এখন আলোচিত বিষয়টা আর একবার স্মরণ করিয়া দেওয়া যাউক। মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ, যে, সাধারণকে বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার দেন নাই, তাহা তাঁহাদের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা, সাপেক্ষতা, বা নিষ্ঠুরাদি দোষ জনিত কি, না? ইহার একরূপ স্থুল সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে, যে, কখনই না। ঋষিগণ কদাচ সঙ্কীর্ণ, সাপেক্ষ বা নিষ্ঠুরহৃদয় ছিলেন না, তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন।

মনু প্রভৃতি ঋষিগণ, সাধারণকে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে নিষেধ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা বলি উহা সঙ্কীর্ণতাদি দোষজনিত নহে, কেবল অনধিকার এবং নিরুদ্দেশ্য বলিয়া। কেবল তাহাই নহে, আরও অনেক কথা আছে। প্রথমতঃ, যে অধ্যয়ন আমার কোন কার্য্যেই আসিবে না, যাহাতে আমার কোন উদ্দেশ্যই নাই, সেরূপ অধ্যয়ন দ্বারা, বৃথা বল, বুদ্ধি, মস্তিষ্ক ক্ষয় ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে আয়ু ক্ষয়, যাহা অধ্যয়নের অনিবার্য্য ফল, কেন হইতে দিব। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঋষিরা আমাদের অপেক্ষা সহস্রগুণে সময়ের মূল্য বুঝিতেন। এইরূপ ফলবিহীন, উদ্দেশ্য বিহীন, প্রত্যুত মহাপকারক অধ্যাপনা কার্য্যও তাঁহারা কদাপি করিতেন না;

সুতরাং, সকলে বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে সুবিধা পাইত না। তৃতীয়তঃ, ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম সম্বন্ধে, ঐরূপ অধ্যয়নে, নিজের ও সমাজের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়; এবং যে দেশে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সমস্তই ধর্ম্ম রূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, সে দেশে মূল ভিত্তির স্বরূপ ধর্ম্মেরই যদি বিনাশ হয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে ধন, মান, সমাজ, স্বাধীনতা প্রভৃতি সমস্তই যে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে, তাহা বিচিত্র কি? বোধ করি এটি অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, বলিবেন সেকি! সাধারণে শাস্ত্রালোচনা করিবে, সেত ভাল কথা। তাহাতে সমাজের উপকার ভিন্ন অপকার কিসে হইবে? আমরা বলি সামান্য অপকার নহে, অতি ভীষণ অপকার সংঘটিত হইয়া থাকে। যে অপকার বীজ, আজ বিংশতি কোটি হিন্দুর সমক্ষে, ম্যাক্স মুলার, ও তাঁহার বঙ্গীয় শিষ্যগণ, এবং পাশ্চাত্যালোকিত অহংতত্ত্বজ্ঞানী মহোদয়গণ অবাধে, অবলীলাক্রমে বপন করিয়া, ফল ফুল শোভিত প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত করিয়াছেন। এরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়িয়া আর অন্য প্রমাণ কি দেখাইব? ষড়দর্শন ও উপনিষদাদি প্রণেতা মহর্ষিগণ, যাঁহাদের পদ রেণুর সহস্রাংশের একাংশোপযোগী মনুষ্য, এসংসারে দৃষ্টি গোচর হয় না, যাঁহাদের জ্ঞান গরিমার বিষয় ভাবিয়া কতশত মহান পণ্ডিত মণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাঁহারা যে বেদকে মস্তকে ধরিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের এক মাত্র অবলম্বনীয় শাস্ত্র বলিয়া, কত আনন্দের সহিত গুণানুকীর্ত্তণ করিয়া গিয়াছেন, যে গ্রন্থকে উপনিষদে ঋষিগণ হৃদয় খুলিয়া গাহিয়াছেন,

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি * *

যাহাকে শঙ্করাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্যদেব বলিয়াছেন,

নহীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদি লক্ষণস্য সর্ব্বতো
গুণান্বিতস্য সর্ব্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোস্তি;

এখন কি না, সেই মহান হইতেও মহান অমূল্য গ্রন্থ রত্ন, অন্তঃসার বিহীন মহা মূর্খের বর্ব্বরের হস্তে পড়িয়া, লাঞ্ছিত ও পদদলিত হইতেছে, ইহাপেক্ষা অনধিকারীর বেদাধ্যয়নের বিষময় ফল আর কি হইতে পারে? আমাদের বিশ্বাস যে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের এরূপ অপ্রতিবিধেয় অধঃপতনের প্রধানতম কারণ অনধিকারীর শাস্ত্রচর্চ্চা। এইত গেল সমাজের অনিষ্ট, আবার যিনি ঐরূপ অধ্যয়ন করেন, তাঁহার ব্যক্তিগত অপকারও তদ্রূপ। যেমন, একজন হয়ত আজন্ম ভক্তির অনুরাগী, সূক্ষ্মবিচারের তিনি বড় অপেক্ষা

রাখেন না। তিনি হয়ত, অটল অচল ভাবে পূর্ণ ভক্তি সহকারে, ভাবগ্রাহী ভগবানকে নিজের অভিরুচি অনুসারে ডাকিতে পারিলে, পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারিতেন, কিন্তু যদি, তিনি আপনার প্রকৃত্যনুযায়ী পন্থা অবলম্বন না করিয়া, শুষ্ক জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার যে "ইতোনষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ" হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার প্রকৃতি যে পন্থার অনুমোদন করিতেছে, সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, বিপরীত পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক নিজ প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিলে তাহাতে যে কি ফল হইয়া থাকে, তাহা সুবুদ্ধি পাঠকগণকে আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়াই, ভবিষ্যদ্দর্শী প্রাচীন ঋষিগণ পরিণামে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রকৃত অধিকারী ব্যতিত অনধিকারীর শাস্ত্র চর্চ্চায় নিষেধ করিয়াছেন, অর্থাৎ কেবল একমাত্র "সুব্রাহ্মণকে" শাস্ত্রে পূর্ণাধিকার দিয়াছেন, তদ্ব্যতিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে কতক অধিকার দিয়াছেন, কিন্তু শূদ্রকে একান্ত অনধিকারী বিবেচনায় একবারেই শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার দেন নাই। এখানে এটি জানা উচিত যে, শূদ্র কথাটি অনধিকারী কথার অন্যতম একটি সংজ্ঞা মাত্র। শূদ্রকে কেন অনধিকারী বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বারান্তরে আমরা আলোচনা করিব।

জাতীয় একতা বন্ধন।

সকল ধর্ম্মের উপর হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত হইয়াছে। উপস্থিত প্রবন্ধে হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সমর্থন জন্য কোন কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা এস্থলে কেবল ইহাই বলিতেছি যে, হিন্দুগণ আচার ব্যবহারে, দেবারাধনা পদ্ধতিতে, নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও একবিধ উদার ধর্ম্মের অনুশাসনে পরিচালিত হইয়া থাকেন। হিন্দু ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ ভাবে বা সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নহে। অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম্মের উদারতা অধিক। অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীরা যেমন আপনাদের ধর্ম্ম না মানিলে অন্তিমে অনন্ত নরকের ভয় দেখাইয়া থাকেন, হিন্দু ধর্ম্ম তেমন কোন উপদেশ দেন্ না। সকল হিন্দুরই এই বিশ্বাস যে, যাহা আপনাদের ধর্ম্মানুশাসন, তাহা সর্ব্বতোভাবে পালন করিলেই উন্নতি লাভ করিতে

পারা যায়। কারণ, তৎতজ্জাতীয় প্রকৃতির অনুসারেই পৃথক পৃথক অনুশাসনের সৃষ্টি। প্রাচীন হিন্দুগণ কিরাত প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদিগকেও ধর্ম্মাধিকারে বঞ্চিত বিবেচনা করিতেন না। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, চৈতন্যের একজন মুসলমান শিষ্য, উদার হিন্দু ধর্ম্মের অনুশাসনে আস্থা দেখাইয়া, পরম ভাগবত হইয়া ছিলেন। হিন্দুগণ ভিন্ন ধর্ম্মের, ভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগের প্রতি যখন এইরূপ উদারতা দেখাইয়াছেন, তখন তাহারা যে সম্প্রদায়ের পার্থক্য প্রযুক্ত আপনাদের মধ্যে পৃথক ভাবের পরিচয় দিবেন, তাহা কখনও সম্ভাবিত নহে। আচার ব্যবহার প্রভৃতিতে ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও হিন্দুগণ কেবল একমাত্র পবিত্র হিন্দু ধর্ম্মের উদার অনুশাসন অনুসারে, আপনাদের সম্প্রদায়গত আচার ব্যবহার সামান্য বিভেদ ভুলিয়া পরস্পর একতা সূত্রে আবদ্ধ হইবেন।

হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী দিগের মধ্যে যে মহাপুরুষ ব্রহ্মজ্ঞান অধিকার করিয়া, জাতিবিচারে আস্থা শূন্য হইয়াছেন সকলের প্রদত্ত খাদ্যই অবাধে ভোজন করিতেছেন, সকলের সংস্পর্শেই আপনাকে অপাপবিদ্ধ পবিত্র বলিয়া জানিতেছেন, এবং উপাসনাকাণ্ড অতিক্রম করিয়া জীবাত্মা পরমাত্মার অদ্বৈতানুভব করিতেছেন, তিনি হিন্দু সমাজে অশ্রদ্ধেয় বা অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত নহেন। জাতিবিচারে আস্থাবান্ উপাসনাকাণ্ড পরায়ণ হিন্দু তাঁহাকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আবার এই ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষও উপাসনাতৎপর হিন্দুকে ঘৃণার ভাবে চাহিয়া দেখেন না। তাঁহার বিশ্বাস আছে যে, উপাসক হিন্দু ও আপনার অবলম্বিত ব্রত যথাবিধি পালন করিয়া এক সময়ে তাঁহার অবস্থাপন্ন হইতে পারেন। উপাসক হিন্দুও উপাসনাকেই তত্ত্বজ্ঞানের উচ্চতম মন্দিরে উপনিত হওয়ার সোপান স্বরূপ মনে করিয়া, সন্তুষ্ট থাকেন। হিন্দু ধর্ম্মের এইরূপ ক্রম হিন্দু দিগের মধ্যে একতাস্থাপনের একটি প্রধান উপায়। ভারতের নানা প্রদেশে নানা ভাষার, নানা আচার ব্যবহারের হিন্দু আছেন। তাঁহাদের মধ্যে আরাধনা পদ্ধতিও নানা প্রকার রহিয়াছে। কিন্তু সকলেই হিন্দু ধর্ম্মের এক উদার অনুশাসনে আবদ্ধ। দুর্গা পূজা বা শিব পূজা সকল স্থানে প্রচলিত না থাকিতে পারে, তান্ত্রিক, শৈব বা বৈষ্ণবগণ সকল স্থানে একাধিপত্য না করিতে পারেন, উপাসক বা তত্ত্বজ্ঞানীগণ সর্ব্বত্র অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন না হইতে পারেন কিন্তু বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, পুরাণ

প্রভৃতি হিন্দু দিগের চির মান্য গ্রন্থে সকলেই আস্থাবান্। সকলেই হিন্দু ধর্ম্মের মূল তত্ত্বে ভক্তি সম্পন্ন। সুতরাং ইহাদের মধ্যে অনৈক্য হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?

একজন বৃদ্ধ হিন্দু পবিত্র হিন্দু ধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাব দেখাইয়া, হিন্দুর নামে যে সকল হৃদয় ভেদী কথা বলিয়াছেন, আমরা এইস্থলে তাহার উদ্ধৃত করিয়া উপস্থিত প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই সরস্বতী নদীতীরবাসী আর্য্যগণের বরণীয় মূর্ত্তি আবির্ভূত হয় যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের নিকট সম্বন্ধ অনুভব করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, 'ত্বংহিনঃ পিতা বসো ত্বংহিনো মাতা' "সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃণাম্" "স্বাদু সখ্যং স্বাদ্বী প্রণীতিঃ" "ত্বংঅস্মাকং তবাস্মি।" ✻ ✻ ✻ হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু-সম্মুখে সেই নবীন দুর্ব্বাদলশ্যাম ধীর প্রশান্ত মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়েন, যিনি পিতৃসত্য পালন নিমিত্ত চতুর্দ্দশ বৎসরকাল অরণ্যে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন ও জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু-সম্মুখে যুধিষ্ঠির আসিয়া উপস্থিত হয়েন, যাঁহার নাম ভারত বর্ষের ধর্ম্ম শব্দের প্রতিপাদ্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে সেই অলোক সামান্য পুরুষ আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, যিনি যুধিষ্ঠিরকে আপনার মৃত্যু সাধনের উপায় বলিয়া দিয়া অসাধারণ মহত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং শরশয্যার কঠোর যন্ত্রণার মধ্য হইতে পাণ্ডবদিগকে অশেষ অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই নাম উচ্চারিত হইলে সেই মহামনা রাজর্ষি জনক আমাদের স্মৃতিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন, যিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ের প্রতি মনো যোগী থাকিয়াও এক মুহূর্ত্ত ও অধ্যাত্ম যোগ হইতে স্খলিত হইতেন না। 'এই নাম উচ্চারিত হইলে মহাত্মা পুরুরবাকে স্মরণ হয়, যিনি এলেক্‌জণ্ডারের নিকট শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বন্দীভাবে নীত হইলে এবং এলেক্‌জণ্ডার "তোমার প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিব" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন "একরাজা অন্য রাজার প্রতি যে রূপ ব্যবহার করে সেইরূপ করিবেন।" হিন্দুনাম কি মনোহর! এ নাম কি কখন আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি? এই নাম ঐন্দ্রজালিক প্রভাব ধারণ করে। 'এই নাম দ্বারা সমস্ত হিন্দুগণ ভ্রাতৃসূত্রে সম্বদ্ধ হইবে। এই নাম দ্বারা বাঙ্গালী,

হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, রজপুত, মাহারাট্টা মান্দ্রাজি সমস্ত হিন্দুবর্গ এক হৃদয় হইবে। তাহাদিগের সকলের এক প্রকার উন্নতি কামনা হইবে। সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ জন্য তাহাদের সমবেত চেষ্টা হইবে। অতএব যে পর্য্যন্ত আর্য্যশোণিতের শেষ বিন্দু আমাদিগের শিরায় প্রবাহিত হইবে আমরা এনাম পরিত্যাগ করিব না। আমরা হিন্দুধর্ম্মও হিন্দুনাম পরিত্যাগ করিয়া কি ক্রীত দাসের ন্যায় অন্যজাতির অনুকরণ করিব? ক্রীত দাসের ন্যায় অন্যজাতির অনুকরণ করিলে আভ্যন্তরিক বীর্য্যের হানি হয়, এবং কোন মতেই স্বীয় মহত্ব সাধন হইতে পারে না। আমাদের দেশের লোকেরা অত্যন্ত অনুকরণ প্রিয়। এতই অনুকরণ প্রিয়, যে, আজি যদি চীনেরা আসিয়া আমাদের দেশে রাজা হয়, তাহা হইলে তাহারা কল্য পশ্চাদ্দেশে আপাদ লম্বিত দীর্ঘ বেনী রাখে। কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি তাহা কি সমস্ত হিন্দুর সম্বন্ধে খাটে? ভারতবর্ষের কি শত শত সহস্র সহস্র লোক নাই, যাহারা এরূপ ক্রীতদাসের ন্যায় অন্যজাতিকে অনুকরণ করিতে বিমুখ? এমন সকল উন্নত পুরুষ যদি ভারত ভূমিতে না থাকেন, তবে ভারতসমুদ্রের তরঙ্গ আসিয়া ভারত ভূমিকে ডুবাইয়া দিউক, ভারত ভূমি পৃথিবীর মানচিত্র হইতে অন্তর্হিত হউক তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আমরা কিছু নিউজিলণ্ডবাসীনহি, যে, এক দিনে হ্যাট্ কোট পরিয়া সকলে সাহেব সাজিয়া উঠিব! ইহা ক্রীত দাসের কার্য্য। আমরা কখন এরূপ ক্রীত দাস নহি। আমাদের আভ্যন্তরিক সারবত্তা আছে; হিন্দুজাতির ভিতরে এখনো এমন সার আছে যে তাহার বলে তাহারা আপনাদিগের উন্নতি আপনারাই সাধন করিবে। হিন্দুজাতি অবশ্যই আপনা আপনি উন্নত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্যজাতিদিগের সমকক্ষ হইবে। ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা। সে সভ্যতা বর্ত্তমানে এখনো পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয় নাই। আমার আশা হইতেছে, যে হিন্দুজাতি পুনরায় প্রাচীন কালের ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতা লাভ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোশ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া গণ্য হইবে। আমরাত রাজ্য বিষয়ে স্বাধীনতা ভ্রষ্ট হইয়াছি, আবার কি সামাজিক রীতি নীতি বিষয়েও স্বাধীনতা হারাইতে হইবে? মহাকবি হোমর বলিয়াছেন, "যখনই মনুষ্য পরাধীন হয়, তখনই সে অর্দ্ধেক পুরুষত্ব হারায়"। যদি আমরা এই রূপে সর্ব্ব প্রকারে পরাধীন হইয়া পড়ি, আর কি আমাদে উঠিবার শক্তি থাকিবে? পরাধীনতাতে কি মনের বীর্য্য থাকে? মনের

যদি বীর্য্য গেল, তবে উন্নতি লাভ কি প্রকারে হইবে? হিন্দুজাতি এই রূপে সর্ব্বপ্রকারে পর হস্তগত হইয়া কি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? আমার ইহা কখনই বিশ্বাস হয় না। আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্ব্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতাও ধর্ম্ম জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনই, সে বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা ও ধর্ম্মজন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে।

সুখ কোথায়?

জগতের আদ্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলে, প্রাণিগণের চেষ্টা ও চেষ্টার ফল অবগত হইলে, দেখা যায়, যে, জীবগণ সুখ সাধন কার্য্য করিতে প্রয়াসী। ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ সকলেই সুখের জন্য ব্যাকুল; কিন্তু সুখ কোথায়? মনের অনুকুল বেদনীয়কে সুখ, আর প্রতিকুল বেদনীয়কে দুঃখ বলে। দুঃখ দূর করিয়া সুখ ভোগ করিতে সকলেই চায়; চায়, কিন্তু পায় কৈ? সংসারে যাহা সুখ বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে তাহা সুখ হইলেও আপেক্ষিক। দরিদ্র মনে করে ধনী হইলে সুখী হইতাম, ধনী আবার, অন্য ধনীর নিকট ধন বিষয়ে হীন; সুতরাং, তাহারও তৃপ্তি নাই, আশা বলবতী। যিনি পৃথিবী গ্রাস করিয়া কুবেরকেও ভাণ্ডারী করিয়াছেন, তিনি তাহাতেও দরিদ্র; কারণ তাহার ধনাশার শেষ নাই, তাহার ত্রিলোকেশ্বরত্ব প্রার্থনীয়; সুতরাং, কোথাও সুখনাই। আমি, আজ দরিদ্র, সোদর পূরণে অক্ষম, সুতরাং দুঃখী; কোন উপায়েও মনের অনুকুল বেদনীয়তা সম্পাদিত হইতেছেনা। পদে পদে, বিপদ দুঃখ, যাতনা লাঞ্ছনা। ভাগ্যবশে অমিত সম্পদ লাভ হইলে, ধনিজন-ভোগ্য-জাতে, দুই একদিন সুখ বোধ হইবে, কিন্তু তৃতীয় দিন সুখ কোথায়? পূর্ব্বে, ধরাসনে শয়িত হইয়া, নিদ্রার পরে, যেরূপ কোন দিন সুখের নিদ্রা বা দুঃখের নিদ্রা বলিয়া, অনুভুত হইয়াছিল, আজ সুধাধবলিত সুরম্য হর্ম্ম্যাভ্যন্তরে খট্টোপরি কুসুমসুকুমারশয়নে শয়ান হইয়াও, সেই সুখ বা সেই দুঃখ। যে সুখের আশায় ধনী হইলাম সে সুখ কোথায়? পূর্ব্বে হয়ত বিষয়ের অভাবে যে সকল বিষয়ে পবিত্র ছিলাম, এখন বিষয়জড়িত দোষের কালিমা রেখায় অন্তর কলুষিত। পূর্ব্বে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে, বিচরণ করিয়া মহেশ্বরের জগৎ শোভা সন্দর্শন করিতে পারিতাম, কিন্তু, এখন মর্য্যাদা

রক্ষায় ব্যাপৃত। তবে সুখ কোথায়? ধনী বিপুল বিভব সুখ সাগরে সন্তরন করিতেছেন, কিন্তু স্বজনাভাবে, স্বজন-মুখ-সন্দর্শন-সুখবিহীন। দরিদ্রের, গেহ জনতা পূর্ণ হইলেও, ধনাভাবে মুখছবি মলিন, শরীর কৃশ। মূর্খ, বিদ্যা হইল না বলিয়া, অসময়ে আক্ষেপে দীর্ঘোষ্ণ নিঃশ্বাস ছাড়িতেছে; বিদ্বান, বিদ্যাবলে অর্থাশায় ক্রীত দাস হইয়া, গঞ্জনা ও যাতনা ভোগ করিতেছে। সকলেই, এক সুখের আশায় বিভিন্ন পথের পথিক হইয়া, ভবের হাটে পণ্য সঞ্চয় করিতেছে, পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া আয়ু ক্ষয় করিতেছে, কিন্তু সাধ মিটেনা, পেট ভরেনা, মনের খেলা মনেই থাকে; দেখিতে দেখিতে জরা রাক্ষসী অল্পে অল্পে গ্রাস করিয়া জীবিতশেষ করিয়া তুলিল, অতএব সুখ কোথায়? বাল্যকালে বালোচিত সুখ জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, সেই অল্প বোধ সময়েও সুখনাই। ক্রমে কিশোর হইলে ভাগ্যানুসারে সুখাশায়, ব্যবসায়-সাধনোপযোগী বিষয় অভ্যাস করিলে; ভাবিলে, যৌবনের অধিকার কালে সুখী হইবে, ক্রমে যৌবন আসিল, প্রেয়সীর মুখকমল অবলোকন করিলে, দুই একদিন সংসারের সুখে অন্তরে আনন্দিত হইয়া উৎফুল্ল হইলে, কিন্তু আর স্বস্তিনাই। চিন্তাজ্বরে তনু ক্ষীণ হইতে লাগিল। গৃহ চিন্তা, গৃহিনী চিন্তা, সন্তান চিন্তা, ধন চিন্তা, জন চিন্তা, চিন্তায় চিন্তায় মন প্রাণ পরিক্ষীণ হইতে লাগিল, সুখ কোথায়? মনের অনুকুল বলিয়া যাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, আপাততঃ তাহার চরিতার্থতা ঘটিলে, দুই একদিন সুখ ভোগ হইতেছে বলিয়া বলাযায়, কিন্তু তাহা থাকে কৈ? সংসারে সুখের অন্তনাই, অথচ কাহারও সুখ নাই, ইহা বড়ই বিষম কৌশল। সকলেই সুখের আশায় জীবন অতিবাহিত করিতেছে, অথচ কাহারও ভাগ্যে সুখ ঘটিয়া উঠে না। কখন ঘটিয়া উঠিলেও সুখী হয় না, কখন বা ঘটিয়া ঘটিয়াও ঘটেনা, সংসার ইন্দ্রজাল, ভেল্কী বা মায়া। যত দিন, এই ইন্দ্রজালের মধ্যে আশা মরীচিকায় অঘটন ঘটিয়সী মায়ার ক্রোড়ে নিদ্রিত থাকিব, তত দিন সুখ কোথায়? চঞ্চলার ন্যায় ক্ষণ কাল মুখ দেখাইয়া কোথায় জানি লুক্কায়িত হয়, দেখিতে দেখিতে আর দেখিনা, পাইতে পাইতে আর পাইনা, যাহাকে জিজ্ঞাসা করি পথ বলিয়া দিতে পারে, কিন্তু সেও পথ পায়না, দুঃখ জ্বালায় দগ্ধ। অনেক সুধীরঞ্জন বলিয়া দিতেছেন তৃপ্তিই সুখ। মনে স্থির করিয়া রাখিলাম তৃপ্তিই সুখ, সন্তোষই ধরাতলে অমূল্য রত্ন। সন্তোষ ধনে ধনী হইলে আর অভাব নাই, দারিদ্র নাই, দুঃখ নাই, কেবলই সুখ। যিনি, তৃপ্ত থাকিতে, প্রাপ্ত অবস্থায়

সন্তুষ্ট থাকিতে, উপদেশ প্রদান করিলেন, তিনিই আবার গম্ভীর ভাবে বলিলেন, ন্যায় দণ্ডের শাসন মস্তকে রাখিয়া অবস্থার উন্নতি চেষ্টা করিবে; কিন্তু অধীর হইয়া অসন্তোষ বা অতৃপ্তি দ্বারা, দুঃখের প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত করিওনা। সন্তুষ্ট থাকিয়া অবস্থার উন্নতি চেষ্টা করিলে ভালই হয়, ক্ষেপা মন, সে প্রবোধ মানেনা, ভাবিয়া বোঝেনা, কেবল অতৃপ্ত থাকিয়া অধিকতর সুখ চায়। মদ্য পিপাসু, যেমন আপানে বসিয়া, মদ্য পাত্র প্রাপ্ত হইলে আহ্লাদিত হয়, দল জুঠাইয়া আমোদে উপদংশ (চাটনি) ভক্ষণ করে, স্খলিত বচনে কতই আহ্লাদ ভোগ করে, তালে তাণ্ডব আরম্ভ করিতে ক্ষান্ত হয় না। ক্ষেপা মনও ইন্দ্রিয় দলে সংযুক্ত হইয়া, বিষয় মদিরা পানার্থ লোলুপ; বিষয় সঙ্ঘটন হইলে, কত আনন্দ, কিন্তু সে আনন্দে ক্ষণকালমাত্র বিভোর হইয়াই, আবার অধিক বা অন্যরূপ চায়; এ আশার বিরাম নাই, সুখ তর্পনের পার নাই, সুতরাং দুঃখ। সুখ অন্তরে বাহিরে দেশে বিদেশে সকল স্থানেই আছে, সকলেই প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রার্থনার পরিপূরণ হয় না। আছে, অথচ পাইনা ইহা কাহার দোষ? সচেষ্ট হইয়াও যে সুখের মুখকমল দেখিতে পাইনা, ইহা কি অনুসন্ধানের দোষ? অনুসন্ধাতার দোষ থাকিলে অনুসন্ধানে দোষ স্পর্শ হইবে, ইহা স্থির কথা। অনুসন্ধাতার কর্ম্মদোষ থাকিলেও, কর্ম্মক্ষয় হইলে সুখ পাইতে পারে, তাহও ত হয় না। যদি অদৃষ্ট দোষে দুঃখ ঘটিয়া থাকে, তবে ভাবিকালে সুখলাভজনক উপযুক্ত অদৃষ্টের সঞ্চয় কর, সুখ হইবে। ইহা বলিয়া দিতে পারি, কিন্তু করিতে পারি না। বর্ত্তিকাধারী যেমন পরকে দেখায়, আপনি স্পষ্ট দেখিতে পায় না, তেমন সংসারের অনেক লোক আছেন দেখাইতে হস্তপ্রসারণ করেন, কিন্তু নিজে দেখেন না। তাঁদাদের নিকট গেলে সুখের পথ প্রাপ্ত হওয়া কঠিন। সুখ আছে, অথচ তাহার সন্দর্শন পাইব না, মানবজীবনে এতদপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? ভাই! জানিও, আমাকে সুখ দিতে পার, অথবা সুখের পথ দেখাইয়া দিতে পার, এরূপ কাতরোক্তি, যাহার কাছে করিবে, তিনিও আমার মত কাতর। তবে উপায় কি? উপায় উপদেষ্টা, শাস্ত্র ও সংসার। তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, পাইলেও পাইতে পারিবে, যদি সে পথেও না হয়, তবে সুখনাই, অথবা থাকিলেও তাহা অপ্রাপ্য।

আশার আশ্বাসে, সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একদল লোক

যাহাকে সুখকর জ্ঞান করিয়া তন্ময় হইয়াছেন, অন্যদল তাহাকেই তৃণবৎ পদদলিত করিয়া পরিত্যাগ করেন। একই বৃন্তে, দুইটী ফল এক উপাদানে সঙ্গঠিত হইয়া বিভিন্ন মূর্তিতে বিরাজমান। একটি পুষ্ট, সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন পক্ক ও পরিশোভিত, অন্যটি কালে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে নাই, প্রত্যুত কীটদংষ্ট হইয়া শীর্ণ হইতেছে; এক সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া পরস্পরএরূপ বিসদৃশ দশা কেন প্রাপ্ত হইল? কে বলিতে পারে? এক মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, দুই সহোদর তুল্যস্নেহে মাতৃঅঙ্কে পরিশোভিত, কিন্তু কালে একজন ঘোর বিষয়ী হইয়া নিরন্তর বিষয়ের অনুধ্যানে তৎপর, অন্য ভ্রাতা বিষয়কে বিষের ন্যায় হেয় বোধে বিরক্ত হইয়া নির্জনে প্রস্থান করিতেছেন; "সর্ব্বং ভূঃ স্বাহা" বলিয়া সমস্তই বিসর্জ্জন দিলেন। একের দেহযষ্টি বিলেপন চর্চ্চিত, অন্যের দেহ বিভূতি বিলেপিত। একের আহার ক্ষীরস্বরনবনীত, অন্যের বন্য ফল মূল। একের বিচিত্র বসন, অন্যে দিগম্বর। একে বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য মানসচিন্তায় বিব্রত, অন্যে বিষয় চিন্তার পরিহার করিতে পারিলেই সুখী। উভয়েই কর্ম্মী; অথচ, পাঠক একবার ভাবিয়া দেখ ইহাদের মধ্যে কাহাকে সুখী বলিবে? যদি বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইয়া থাক, তবে সন্ন্যাসীকে ঘৃণা করিয়া, বিষয়ী ভ্রাতাকে সুখী ও কাজের লোক, বলিবে। যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর গর্ব্বিত সভ্য হইয়া থাক, তবে প্রথমই দেখাইবে ইউরোপেত সংসার-বাসনা-বিরক্ত সুসভ্য নাই, অতএব সন্ন্যাস দুষনীয়; কারণ জগৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না। বিলাস-বিপিন যাহার আরাম স্থল তাহার পক্ষে ইহা সঙ্গত বটে। ইউরোপ রজচাঞ্চল্যে কাম ক্রোধাদি দ্বারা পরিপূর্ণ, তাহার উপরে সত্বগুণ, তদুপরি সন্ন্যাস, বৈরাগ্য প্রভৃতি; সুতরাং, রাজসিকইউরোপ কদাপি সত্ত্বগুণে পৌঁছিতে পারে কি না সন্দেহ; তবেই বর্ণিত বিষয়ের আদর্শ বা উপদেষ্টা ইউরোপ কখনই হইতে পারে না! সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য গুণে গুণান্বিত হইলে জগৎ থাকে না। জগৎ থাকে না কোথায় যায়? বৈরাগ্য সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বলবতী বিষয় বাসনায় জগৎ মোহিত, জগতের সাধ্য কি বৈরাগ্য ধনে ধনী হয়? যদি সংসারকে উপাদেয় বলিয়া চিরকাল জীবন শেষ করিলে, অশন পানে উদর পূর্ণ করিলে, তবে পরিণাম ভাবিলে কৈ? সুখই বা পাইবে কোথায়? আর যদি সংসার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া থাক, তবে

বৈরাগ্যকেই শ্রেয়স্কর বোধ করিবে। কিন্তু তাহাত ঘটেনা, এখন উপায় কি? কোন্ পথে যাইব? সংসারেও সুখ আছে জানি, তথাপি সুখ পাই না, ক্লেশ ভোগ করি, তথাপি সংসার ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। আজ যাহার আস্য হাস্যে পরিপূর্ণ, কল্য হয়ত সে মৃত্যু শয্যায় মহানিদ্রিত। অমুক মরিল, মনে দুঃখ উপস্থিত হইল, দেখিতে দেখিতে আমার মৃত্যু ও অন্যে দেখিবে, আমি তাহা জানি, কিন্তু বুঝি না। সংসারের যত লীলা খেলা সবই এইরূপ জানি, কিন্তু বুঝিয়াও বুঝি না। তবেইত সংসারে সুখ নাই, অতএব সংসারে কি জ্ঞান লাভ করিব? এই বুঝিব এই জ্ঞান লাভ করিব, যে, ঐ যে অন্যভ্রাতা সংসারকে বিস্মৃতি সাগরের অতল তলে ডুবাইয়া, কান্তারে প্রস্থান করিলেন উঁহার সুখ কিরূপ? তাহা জানিতে হইলে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, শাস্ত্র ও উপদেষ্টার পদানুসরণ করিতে হইবে। জানিতে চাহিলেই জানা যায় না, জানিবার উপযুক্ত হওয়া চাই। মলিন মুকুরে প্রতিবিম্ব বিশদরূপে প্রতিভাত হয় না, ইহা সকলেই জানে। অনেকে বলেন আজকাল আর গুরু নাই। আমরা বলি শিষ্যও নাই। শিষ্য থাকিলে গুরুও থাকিত। যদি শিষ্য হইতে পারি, তবে গুরু অবশ্যই পাইব। বাড়ীতে বসিয়া বিষয় সুখের বাহার দিব, আর গুরু তাড়িত বার্ত্তাবাহ সংযোগে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, এরূপ আশা করা ধৃষ্টতা মাত্র। রত্নকেই সকলে অন্বেষণ করে, রত্ন কাহারও অনুসন্ধান করে কি? তবে কেন ভাই এ কথা! পূর্ব্বে শিষ্যোপযোগী গুণগ্রামে সজ্জিত হও, পরে গুরুর আক্ষেপ করিও। কান্তারগামী বিষয়-বিরক্ত ভ্রাতা গহনে গহনে পরিভ্রমণ করিয়া সদ্‌গুরুর পদচ্ছায়ার সঙ্গতি লাভ করিলেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু তাহার পরীক্ষা করিয়া ক্রমে ক্রমে এমন এক বিষয়ের অভ্যাস করাইলেন যাহা অভ্যস্ত হইলে চিরসুখ ভোগ হইয়া থাকে। এই অনিত্য সংসারে কিছুই নিত্য নহে; আমরা যাহা সুখকর বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাতে সুখ নাই; সুখের আশা আছে, অথবা সুখ থাকিলেও, ক্ষণিক; এইরূপ আলোচনা করিয়া, স্থির জ্ঞান হইলে, মন নিত্য সুখের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। মনের সেই আশা পরিতৃপ্তি করিতে হইলে, বেদান্তাদি মোক্ষ শাস্ত্রের আলোচনাও সৎগুরুর পরিচর্য্যা করিতে হইবে। এরূপ পরিচর্য্যায় যখন চিত্তকষায় সমস্ত বিদুরিত হয়, তখন হইতে প্রকৃত সুখের আবেশ হইতে থাকে। শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগের ন্যায় ক্রমে ক্রমে তাহা প্রদীপ্ত হইয়া থাকে।

ভূমানন্দ কখন অনিত্য নহে সে সুখও অনিত্য নহে। যিনি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ও পবিত্র হইয়া আত্মারাম হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সুখী; "সুখ কোথায়" এরূপ প্রশ্ন তাঁহার মনে উদয় হয় না, আমার বা মাদৃশ জনেরই তদ্রূপ আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। ধন জন যৌবন কিছুই নিত্য নহে; সংসারে আসিয়া ঐ সকল সম্পদকে স্থায়ী জ্ঞানে কেন লোক মদে মত্ত হয়? ইহার উত্তর আর কিছুই নহে, বিবেক তাহার সুদূরে অবস্থিত। নাবিক যেমন ধ্রুব নক্ষত্রকে লক্ষ্য রাখিয়া, বহু বিস্তৃত জলধির পরপারে উত্তীর্ণ হয়, তেমন যিনি ভবসাগর তিতীর্ষু, তাহার লক্ষ্য একমাত্র সেই প্রত্যগাত্মা। তাহাকে ছাড়িয়া সংসারে প্রবৃত্ত হও, তাহাতেই মজিয়া থাকিবে, আর উত্থান নাই, এমন কি উত্থান শক্তি পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়া যাইবে, ক্রমে অবশ, অচল, জড় হইতে হইবে। সুতরাং, প্রথম হইতেই সাবধান হইতে হয়। সংসারের লীলাখেলা দেখিয়া সেই সুখধামে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সম্বল সংগ্রহ কর। শম দম প্রহরী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণের বহির্মুখীনগতি অন্তর্মুখীন করিয়া স্বরূপে নিরোধ কর, আত্মজ্ঞান উপলব্ধি কর, তখন বুঝিতে পারিবে সুখ কোথায়। বিষয়-বিপিনে ভয়াল ব্যাঘ্র ভল্লূক বাস করে, তথাপি আমরা মোহিত হইয়া তাহাদের বিকট মুখভঙ্গীই প্রীতিজনক বোধ করি, কাজেই আমাদের সুখ কোথায়? যদি "সুখ কোথায়" এরূপ অনুসন্ধানের চেষ্টা হইয়া থাকে; তবে একদিন না একদিন সুখধামের সুতুঙ্গ শৃঙ্গ অবলোকিত হইবে, কেবল শরণি লাভের নিমিত্ত সংসারেশাস্ত্র ও গুরুর পরিসেবা আবশ্যক। আমাদের সুখের আশা আছে কিন্তু তমঃপ্রাধান্যে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া, তন্দ্রায় সুখাশা করিলে, আমাদের সুখ কোথায়? অতএব যদি প্রকৃত সুখ চাও, তবে হৃদয় হইতে যাহাতে তমভাব বিদূরিত করিয়া ক্রমে রাজস তৎপর সত্বভাবে হৃদয় পূর্ণ করিতে পার তজ্জন্য দৃঢ়ব্রত হও।

সাধু-দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যিনি সর্ব্বদা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া স্বামীজীর সাধনার অদ্ভুত ক্ষমতা সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; তিনি ক্রমশঃ স্বামীজীর সঙ্গ লালশায় এতই উন্মত্ত হইয়াছিলেন, যে, অনাহারে, অশ্রান্তভাবে দিবারাত্র অতি

সঙ্গোপনে মহাত্মার পশ্চাদনুসরণ করিয়া বেড়াইতেন। কখন কখন বা তাঁহার সন্নিহিত হইয়া নিজ জীবনের হীনতা ও অকর্ম্মণ্যতার বিষয় বিবৃত করিয়া কাতর ভাবে কত কাঁদিতেন। কিন্তু স্বামীজীর নিকট হইতে কোন উত্তরই পাইতেন না। তিনি এক দিন কত মর্ম্মবেদনার সহিত স্বামীর চরণে মস্তক রাখিয়া আপনার অভিলাষ জ্ঞাপন মানসে কতই না কি বলিতেছেন, এমন সময় স্বামী মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেলেন, সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়াও তিনি আর দর্শন পাইলেন না। সাধনাবস্থায় স্বামীজী যখন সমাধিতে থাকিতেন তখন এক কালে প্রহর দ্বিপ্রহর এমন কি দুই চারি দিবস পর্য্যন্তও নিস্পন্দভাবে অনিমিষ লোচনে জড়ের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন, কিন্তু, যখন সমাধি ভঙ্গ হইত তাহার পর, যে, কখন কোথায় থাকিতেন, কোথায় যাইতেন, কেহ স্থির করিতে পারিত না। কখন বা বর্ত্তমান বাসস্থানের সম্মুখস্থিত ধ্বজার পার্শ্বে সাষ্টাঙ্গ ভুমিসাৎ করিয়া উন্মাদের ন্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেন, শত সহস্র যাত্রি নানারূপ আহারীয় সামগ্রী, কেহবা পুষ্প চন্দনাদি, কেহবা স্বর্ণমুদ্রা কেহ রৌপ্য মুদ্রা কেহ কেহ পয়সা ইত্যাদি যাঁহার যাহা ক্ষমতায় কুলাইত, তিনি তাহাই লইয়া গিয়া, স্বামীর চরণ প্রান্তে "ভেট চড়াইয়া" আশীর্ব্বাদ কামনা করিতেন, কিন্তু স্বামীর কামনা শূন্য নেত্রদ্বয় কোন দিকেই লক্ষ না করিয়া আপন মনে আপন ভাবনা ভাবিতেন। কোন কোন দিবস যাত্রির এতই সমাগম হইত, যে, তাঁহার সম্মুখে টাকা পয়সা স্তূপাকারে সংগ্রহিত হইত, কিন্তু, তখন কেহ নির্দ্দিষ্ট রূপ শিষ্য বা সেবক না থাকায়, পথের দরিদ্র ভিক্ষুকেরা সচ্ছন্দে, বিনা আপত্তিতে সে সমস্ত কুড়াইয়া লইয়া যাইত। তিনি, কিন্তু দাতা কিম্বা গ্রহিতা ইহার কাহাকেও কিছুই বলিতেন না। এইরূপে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত; আমাদের পরিচিত ব্যক্তিটি সর্ব্বদা তাঁহার সহবাসে থাকিয়া, এই সমস্ত ব্যাপার সচক্ষে দেখিতেন এবং নজের বিষয় কীট-স্বরূপ জীবনের প্রতি অসংখ্য ধিক্কার প্রদান করিতেন। ক্রমেই তাঁহার সংসারের প্রতি বিরাগ জন্মে। একদিন রাত্রিতে, স্বামীজী, সর্ব্বদা তাঁহাকে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে দেখিয়া, তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ মানসে, অতিদ্রুত পদে নগর অতিক্রম করিয়া, এক সুবৃহৎ প্রান্তরে উপনীত হইলেন, এবং প্রান্তরে আসিয়াও যখন দেখিলেন, যে, তিনি কিছুতেই তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে পারিলেন না, তখন অত্যন্ত

বিরক্ত হইয়া, নানারূপ তাঁহাকে বিভীষিকা দেখাইতে লাগিলেন। এই সময়ের যেরূপ বর্ণনা আমরা আমাদের বন্ধুবরের নিকট শুনিয়াছিলাম তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। "এই দেখিলাম অতি ভীষণ ধূলিরাশী সমস্ত আকাশমার্গ আচ্ছন্ন করিয়া, ধরণিকে তিমিরাবৃত করিয়া ফেলিল, কোন দিকেই লক্ষ্য হয় না, জগতে যেন একা আমি ব্যতিত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল; আঁধার পর মুহূর্ত্তেই দেখি, অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত্রি, কোথায়ও অন্ধকারের লেশ নাই, পৃথিবী যেন শান্তি সাগরে ভাসিতেছে। আবার একি! দেখিতে দেখিতে দশদিক তমসাচ্ছাদিত হইয়া পড়িল; ঘন ঘন বজ্রধনী, ক্ষণে ক্ষণে অশনিপাত, চপলার তীব্র অথচ চঞ্চলগতি দেখিয়া, বোধ হইল, বুঝি স্বয়ং ভগবান রুদ্রদেব সংসার সংহার মানেসে, আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন, বুঝি মুহূর্ত্ত মধ্যেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচুর্ণিত হইয়া প্রলয়ের অনন্ত সমূদ্রে মিলিয়া যাইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পরক্ষণই দেখি, সে ভীষণ দৃশ্য কোথায় অন্তর্হিত হইল, কোন দিকেই ভয়োদ্বেগের চিহ্ন মাত্রও নাই, ধরা যেন শান্তির কোলে বিরাজমানা। যখন এই সমস্ত হৃদয়মনবিহ্বলকারী ভয়ঙ্কর বিভীষিকা সমস্ত সঙ্ঘটিত হইতেছে, এমন সময় স্বামীজী আমার নিকট হইতে বহুদুরে দণ্ডায়মান হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। অবশেষে দেখি আমার সম্মুখে এক অতি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র মুখব্যাদান করিয়া আমাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত উপবিষ্ট। এই সমস্ত দেখিয়া আমি আত্মহারা হইয়া, "স্বামীজী রক্ষা করুন" বলিয়া অতি চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তখন তিনি, হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন," আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর্"। আমি জিজ্ঞসিলাম "আমার গতি কি হইবে"? তিনি তিনবার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন "এখনও অনেক বিলম্ব।" এইমাত্র বলিয়া তিনি কোথায় অন্তর্ধান হইলেন, কত অনুসন্ধান করিলাম, কত কাতরভাবে চিৎকার করিয়া ডাকিলাম, কিন্তু কোনই উত্তর পাইলাম না; অবশেষে ভগ্ন হৃদয়ে ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিলাম।" একজন বিশ্বস্ত ও অতিপ্রবীণ মহোদয়ের জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনাবলি সকর্ণে শুনিয়াও যদি এতবড় মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গী স্বামীকে প্রকৃত একজন জ্ঞানি-জ্ঞানে পূজা না করিব, তবে আর কাহার পূজা করিব? সমগ্র ভারত খণ্ডে সাধরণের জ্ঞাত ও গম্য যদি কোন প্রকৃত সিদ্ধ যোগী থাকেন তিনিই

সেই মহাপুরুষ মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গীজী। স্বামীজী সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করার উপযোগী স্থান আমাদের নাই, যদি কখন ঈশ্বর কৃপায় সাধুমহাত্মাদের জীবনী সংগ্রহ করিয়া, স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি, তখন স্বামীজীর সুদীর্ঘ জীবনের অসংখ্য অমানুষী শক্তি বিজৃম্ভিত ঘটনারাশি প্রকাশ করিয়া, হৃদয় মন চরিতার্থ করিব।

এইরূপে, মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গী, বহুতর তীব্রতম তপস্যা ও অনুষ্ঠানাদি সাধনান্তর, আপনার অভিলষিত স্থানে উপনীত হইয়া, আনন্দে পূণ্যক্ষেত্র কাশীধাম উজ্জ্বল করিয়া, বিরাজ করিতেছেন। আহা! তাঁহার সেই প্রশান্ত ধীর গম্ভির মূর্ত্তিখানি একবার অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করিলে, ঘোর নাস্তিকের হৃদয়েও ধর্ম্মভাবের উদ্দিপনা হয়। পবিত্র আনন্দ কাননে, কত দিন যে এই মনোহর ফুল প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহার নির্ণয় করা যায় না, অথচ এখন পর্য্যন্ত সাধুজন লভ্য অপূর্ব্ব সৌরভে চারিদিক আমোদিত করিতেছে। প্রকৃত মালি ব্যতিত এ ফুলের মহিমা বুঝিবেকে? জহুরী ভিন্ন মনি মাণিক্য চিনিবে কে? তাই আমাদের ন্যায় অজ্ঞের নিকট এমহারত্নের সমাদর নাই।

অধিকতর দুঃখের বিষয়, যে, এরূপ মহাত্মাকেও অনেকে নানা বিষয়ে সন্দেহ করিয়া থাকেন। অধুনাতন, নব্য বাবুরা, হয়ত সকের ভ্রমণে বাহির হইয়া, ভুল ক্রমেই হউক কিম্বা ইচ্ছা করিয়াই হউক, কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। সময় নির্দ্দিষ্ট,—হয়ত, কেবল মাত্র তিন ঘণ্টাকাল কাশীতে অতিবাহিত করিবেন এইরূপ মন্তব্য তাঁহার দৈনিক লিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—সুতরাং, সেই সময় মধ্যে সমস্ত কাশী ক্ষেত্রটি দর্শন করা চাই, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই ন্যাঙটা স্বামীটাও বাদ না যায় এইরূপ মনে মনে কল্পনাও করা হইয়াছে। এইরূপ,বন্দবস্ত আঁটিয়া, বিলাতি বেশ ভুষায় ভূষিত হইয়া, কাশী ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত নগর পরিভ্রমণ শেষ হইল। নিরূপিত সময়ের কেবল অর্দ্ধদণ্ডমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ন্যাঙটা স্বামী দর্শনে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া, সেই পাশ্চাত্য মনমোহন অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত দেহে ত্রিভঙ্গ ভাবে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক, বক্র দৃষ্টিতে স্বামীজীকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়াই, একটা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই মত প্রকাশ হইল, "যেখানে, লোকে টাকা পয়সা, খাদ্যদ্রব্য এ সমস্ত দিলেও প্রত্যার্পণ করিতেছেন না, পরন্ত তাহাদের প্রদত্ত পুষ্পমাল্য চন্দ-

নাদি যে যাহা দিতেছে তাহাই, কোন আপত্তি না করিয়াই গ্রহণ করিতেছেন, তখন কদাপি ইনি ভাল লোক নহেন, ইহার মনে কোন একটা অভিসন্ধি আছে, অতএব এটা একটা ভণ্ড”। এরূপ অযথা তিরস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। যাঁহারা এরূপ বিলাতি ভাবাপন্ন ও আত্মাভিমানী তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার বা বুঝাইবার নাই। তবে, যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু, সাধুচরণামৃত পানে যাঁহাদের “হৃদয় সর্ব্বদা লালায়িত, অথচ, পূর্ব্বোক্তরূপ নাস্তিকদের কুহকে পড়িয়া এবং উহাদেরই প্রমুখাৎ বিকৃত বিবরণাদি শুনিয়া, মনে নানারূপ “খটকা'' উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদেরই সে ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য আমরা অদ্য শাস্ত্রের সহিত স্বামীজীর অবস্থা মিলাইয়া প্রকৃত সাধুর লক্ষণ কি তাহাই বুঝাইব।

যাঁহারা সিদ্ধপুরুষের প্রকৃত ছবি দেখিতে চান, তাঁহাদিগকে আমরা অষ্টাবক্র সংহিতাখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অষ্টাবক্র সংহিতার এক স্থানে আছে।

যদাযৎ কর্ত্তুমায়াতি তদাতৎ কুরুতে ঋজুঃ।
শুভংবাপ্যশুভং বাপিতস্যচেষ্টাহি বালবৎ॥

ভাবার্থ, যদৃচ্ছাক্রমে যাহা যখন উপস্থিত হয় অনভিসংহিত ভাবে তাহাই করিয়া থাকেন, তাই, উহা সাধারণের বা নিজের পক্ষে, ভালই হউক আর মন্দই হউক; কারণ তখন তাঁহার (সাধুর) স্তনন্ধয় শিশুর ন্যায় অবস্থা হইয়া থাকে।

আর এক স্থানে আছে,—

জ্ঞঃ সচিন্তোপি নিশ্চিন্তঃ সেন্দ্রিয়োপি নিরিন্দ্রিয়ঃ।
সবুদ্ধিরপি নির্বুদ্ধিঃ সাহংকারোনহংকৃতিঃ।

ভাবার্থ, তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থা হইলেও, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ উন্মিলিত দেখিয়া বাহির হইতে বোধ হইতে পারে, যে, তিনি (তত্ত্বজ্ঞানী) বিষয়াদির চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই অন্তর্জগতে নিবেশিত থাকে। ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার থাকে, কিন্তু সে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অহংভাব (মাখামাখীভাব) নাই। কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, হয়ত তীব্র অধ্যবসায়সম্পন্ন লোকের ন্যায় উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু সে অধ্যবসায়ের সহিত, তাঁহার আত্মার সম্বন্ধ একেবারেই শ্লথ। অনেক সময়, জ্ঞানাভিমানীব্যক্তির ন্যায় অনেক আচরণ করেন, কিন্তু আসলে অহঙ্কার মাত্রই

নাই। তাঁহার আত্মা, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া, কেবল চৈতন্য সত্ত্বার অবস্থিত। চণ্ডিতেও এই ভাব লক্ষ্য করিয়া, ভগবান মার্কণ্ডেয় মুনি বলিয়াছেন,—

কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিন স্তুল্য দৃষ্টয়ঃ।

অর্থ,—কোন প্রাণীরা (যোগীরা) দিবা (অন্তর্জগৎ) এবং রাত্রি (বহির্জগং) উভয়েই সমদর্শী হন।

সর্ব্বোপরি, আমাদের শাস্ত্রাদর্শ মহামান্য শ্রুতি কি বলিতেছেন, শুনুন,—

* * উভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব স যদত্র কিঞ্চিৎ করোতি অনন্বাগতস্তেন ভবতি* *।

তিনি একদাই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়ে সমভাবে বিচরণ করিতেছেন, সর্ব্বদাই যেন অন্তরে অন্তরে কোন নিগূঢ় তত্ত্বে নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, অথচ বহির্দিকেও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া চলিতেছে, তিনি বাহিরে সমস্ত কার্য্যই করেন বটে, কিন্তু কোন কার্য্যের সহিতই তাহার আসক্তির লেশ মাত্রও নাই।

আবার, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাও এখানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিয়াছেন,—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥

ভাবার্থ, যিনি তত্ত্ববিৎ এবং সমাহিতচেতাঃ তিনি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, শ্বাস প্রশ্বাস, বাক্যোচ্চারণ, মলমূত্রোৎসর্গ, এবং উন্মেষ নিমেষ প্রভৃতি যত প্রকার কার্য্য করেন “তৎসমস্তই কেবল ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও বুদ্ধি প্রভৃতির আপন আপন বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া এক একটা ঘটনা বিশেষ মাত্র, তদ্ব্যতীত আর কিছুই না” এইরূপ অবধারণ করত 'আমার নিজের (আত্মার) কোনই ক্রিয়া নাই” এইরূপ মনে করিয়া থাকেন।

আমাদের স্থানাভাব, সুতরাং আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। ইহাতেই বোধ করি পাঠকগণ আমাদের বক্তব্য বিষয় বুঝিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা আরও এসম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে গীতা খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

এখন আমরা বুঝিলাম, যে, সাধুরা বাহিরে বাহিরে শারীর ধর্ম্মানুসারে কতকগুলি মনুষ্যোচিৎ কার্য্য করেন বলিয়া, দোষাবহ নহেন; কারণ তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যই তৃষ্ণা রহিত।

শাস্ত্র বলেন,—"তৃষ্ণা মাত্রাত্মকোবন্ধ স্তন্নাশোমোক্ষ উচ্যতে।"

অর্থ, আত্মার তৃষ্ণা মাত্রই বন্ধন, ঐ তৃষ্ণার নাশ হইলেই মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অঃ সংহিতা।

সুতরাং, মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গীস্বামী শারীর ধর্ম্মানুসারে যে সমস্ত কার্য্য করেন তাহা তিনি সম্পূর্ণ তৃষ্ণা রহিতভাবেই করিয়া থাকেন। একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহার শারীর যন্ত্রের ক্রিয়া গুলি অবলোকন করিলে এ ভাবটী অতি সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। শারীর যন্ত্রের ক্রিয়া সকল পূর্ব্ব হইতেই, যে বেগ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, যতক্ষণ, ঐ সমস্ত ক্রিয়ার একবারে ধ্বংশ সাধন না হইবে, ততক্ষণ উহারা কেন্দ্রাতিগ শক্তির (Centrifugal force) নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেই করিবে। কিন্তু তখন আত্মার সহিত শারীর ক্রিয়ার কোন রূপ সংশৃষ্ট ভাব থাকিবে না। আত্মা সম্পূর্ণ নির্লেপ ও নির্ম্মল ভাবে অবস্থিতি করিবে। তাই বলি, ভাই! সাধু চিনিয়া লওয়া বড় শক্ত কথা। মনে করিলেই সাধুর দর্শন লাভ করা যায় না। প্রগাঢ় ভক্তি, ঐকান্তিক অনুরাগ পূর্ণ অধ্যবসায় সহকারে সাধু মহাজনগণের পরিসেবা করিলে, যদি তাঁহাদের কৃপা হয়, তবে তাঁহাদের চেনা যাইতে পারে। আবার তাঁহাদের প্রসাদ লাভ করিতে হইলে একবারে তাঁহাদেরই হইয়া যাইতে হয়; হৃদয়, মন, প্রাণ কেবল একমাত্র তাঁহাদেরই সেবার জন্য উৎসর্গ করিলে, তবে একদিন প্রাণের পিপাসা মিটিলেও মিটিতে পারে। নচেৎ, কেবল আত্মাভিমানে পূর্ণ হইয়া তাঁহাদের অনুসন্ধান করা বিড়ম্বনা মাত্র।

সম্পূর্ণ।

মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গীস্বামী সম্বন্ধে, আমাদের বক্তব্য, এখনকার মত এই খানেই শেষ হইল। এবারে মহাত্মা ভাস্করানন্দের প্রতিমূর্ত্তি সহ তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী লইয়া পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত হইব, এইরূপ বাসনা রহিল।

১ম ভাগ। **বেদব্যাস** ১০ম ও ১১শ খণ্ড।

মাসিক পত্র।

মাঘ ও ফাল্গুন ১২৯৩।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

বিষয়	নাম	পৃষ্ঠা
কর্ম্ম ও জ্ঞান	শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২২১
প্রকৃতি বড় না পুরুষ বড়	শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন শাস্ত্রী সরস্বতী	২২৪
ফলসিদ্ধি	শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার	২২৯
আচার	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিতীর্থ	২৩৩
স্বধর্ম্ম ত্যাগ	শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়লঙ্কার	২৩৮
দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৬
শ্রদ্ধা ও যুক্তি	শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ	২৫৭

কলিকাতা।

৪নং টেমার্স লেন, "বেদব্যাস যন্ত্রে"
শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত ও ৬৬নং কলেজ ষ্ট্রীট,
শ্রীঅমৃতলালচট্টোপাধ্যায়
দ্বারা প্রকাশিত।

গ্রাহকগণের প্রতি।

পোষ্ট আফিসের গোলযোগ বশতঃ আমরা এবারে মাঘ ও ফাল্গুন মাসের বেদব্যাস একত্রে প্রকাশিত করিতে বাধ্য হইলাম। ইংরাজি মাসানুসারে পোষ্টাফিসে, আমাদের প্রতি তিন মাসের অগ্রিম ডাক ব্যয় জমা দিতে হয়। কিন্তু বাঙ্গালা হিসাবে আমাদের কাগজ বাহির হয়। ইংরাজি হিসাবে টাকা দেওয়ায় চৈত্র মাস বাদ পড়িয়া যায়। ঐ এক মাসের জন্য আর দুই মাসের টাকা জমা দিয়া লোকসান স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং একটু বিলম্ব করিয়া দুই মাসের একত্রে বাহির করিতে হইল, তজ্জন্য গ্রাহকগণ ক্ষমা করেন এই প্রার্থনা।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আগামী বর্ষহইতে বেদব্যাসের আশাতিত গ্রাহক বৃদ্ধি হওয়ায় উৎসাহিত হইয়া, আমরা বেদব্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করিতে সংকল্প করিয়াছি। সুতরাং মূল্য সম্বন্ধেও পরিবর্ত্তন করিতে হইল। আগামী বৈশাখ হইতে আর অসমর্থ পক্ষে ১৲ টাকায় কাহাকেও বেদব্যাস দেওয়া হইবে না। পুর্ণ মূল্য ২৲ টাকাই সকলকে দিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা বেদব্যাসের গ্রাহক আছেন, তাঁহারা যদি আগামী বর্ষের মূল্য, ১৫ই চৈত্র মধ্যে, প্রেরণ করেন, তাহা হইলে বরাবর ঐ বার্ষিক এক টাকা মূল্যেই বেদব্যাস পাইবেন। আর যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা যদি ৩০শে চৈত্র মধ্যে, বর্ত্তমান ও আগামী বর্ষের একত্রে ২৲ টাকা পাঠান তাহা হইলে তাঁহারাও বরাবর ১৲ টাকাতেই পাইবেন। অসমর্থ গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এক বৎসর ধরিয়া সামান্য অর্থ ১৲ টাকা মাত্র গ্রহণ করিয়া মাসে মাসে বেদব্যস পাঠাইয়া আসিতেছি। আরও দুই মাস সময় দিলাম। এখানে বলিয়া রাখি, যে, এ সময় উত্তীর্ণ হইলে আমরা আর কাহারও অনুরোধ শুনিতে বাধ্য হইব না।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

বেদব্যাস।

১ম ভাগ ১২৯৩ সাল। ১০ম ও ১১শ খণ্ড।

কর্ম্ম ও জ্ঞান।

মনুষ্যমাত্রেই আপন আপন দুঃখ নিবৃত্তি করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান। বজ্রপাতাদির ভয়, চৌর সর্পাদির ভয় এবং নানাপ্রকার শোক দুঃখাদির ভয়ে মনুষ্য কাতর থাকে, এবং যাহা কিছু করে, তাহা সেই সকল বিবিধ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই করিয়া থাকে। এইরূপ দুঃখ নিবৃত্তি ভিন্ন মনুষ্যের কোন কর্ম্মে কোন উদ্দেশ্যই নাই।

শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, এই সকল দুঃখ মিথ্যা, এবং যাহা হইতে দুঃখের আশঙ্কা হয়, তাহা মিথ্যা। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা মনুষ্য যে সকল সত্বার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে, সে সমস্তই মিথ্যা। প্রকৃত অস্তিত্ব কিছুরই নাই। তথাপি অজ্ঞান মনুষ্য মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারে না, সত্য বলিয়াই অনুভব করে। এই যে মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বোধ করান, ইহা মায়ার কার্য্য।

স্বপ্নে যেমন ব্যাঘ্রাদি দেখিয়া মনুষ্য ভীত হয়, স্বপ্নে স্বর্ণরজতাদি লাভ করিয়া আহ্লাদিত হয়, কিন্তু সেই ব্যাঘ্র, সেই স্বর্ণরজতাদি মিথ্যা হইলেও যতক্ষণ স্বপ্নাবস্থা থাকে, ততক্ষণ মিথ্যা বলিয়া অনুভব করিতে পারে না, প্রত্যুত সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করে, সেইরূপ মনুষ্য যতক্ষণ মায়ার অধীন থাকে ততক্ষণ সংসারের মিথ্যাত্ব বুঝিতে পারে না। এবং অলীক ও অমুলক দুঃখাদিকেও দুঃখ বোধ করিয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় ভীত হইয়া, সেই ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মানুষ স্বপ্নোচিত কত চেষ্টাই করে, কিন্তু যতক্ষণ তাহার চেতনা না হয়, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া

যতক্ষণ সে জাগ্রত না হয়, ততক্ষণ সেই মিথ্যা ভয়াদিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে এবং ভয়াদি হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্যমও সফল হয় না। মায়ার বন্ধন সম্বন্ধেও সংসারী জীবের ঠিক এই অবস্থা। জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি, পশু, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত মিথ্যা হইলেও, মায়াধীন মনুষ্য তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তুমি আমি ইত্যাকার ভেদ বোধ; কেহ হন্তা, কেহ হত ইত্যাকার অনুভব করিতে থাকে এবং তজ্জন্য ক্লেশ পায়। জাগ্রত অবস্থায় চেতনা লাভ করিলে স্বপ্নকে যেমন মিথ্যা বলিয়া বুঝা যায়, তুরীয় অবস্থায় জ্ঞান লাভ করিয়া জীবও সংসারকে মিথ্যা বলিয়া বোধ করে। মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইলেই জ্ঞান জন্মে। মানুষ যতক্ষণ মায়াপাশে বদ্ধ থাকে ততক্ষণ সে অজ্ঞান।

স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নসম্ভব ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিয়া মনুষ্য কখন কখন স্বপ্নোচিত পরিত্রাণ পায়। স্বপ্নে ব্যাঘ্র দেখিলাম, ভীত হইলাম, স্বপ্নসম্ভব পলায়ন করিলাম, স্বপ্নসম্ভব বৃক্ষে আরোহণ করিয়া তৎকালের জন্য আত্মরক্ষা করিলাম, কিন্তু আত্মরক্ষাও মিথ্যা, সে পলায়নও মিথ্যা, সে ব্যাঘ্রও মিথ্যা। ফলতঃ মিথ্যা বলিয়া তখন বোধ করি না। স্বপ্নে আত্মরক্ষা করিয়াও ভয়ের মূল কারণ যে ব্যাঘ্র তাহাকে কোন মতেই মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। তখন এই মাত্র মনে হয় যে, আমি রক্ষা পাইলাম বটে, কিন্তু ব্যাঘ্রটা সত্য। স্বপ্ন থাকিতে থাকিতে সেই ব্যাঘ্র আবার আসিতে পারে, আবার আমি ভয় পাইতে পারি, আবার পলাইতে পারি। মনুষ্য অজ্ঞান অবস্থায় সেইরূপ অনেক দুঃখের প্রতীকার করে, কিন্তু সেই প্রতীকার মিথ্যা, সেই দুঃখ মিথ্যা, সেই দুঃখের কারণও মিথ্যা ইহা বুঝিতে পারে না। সংসারী জীবের এই প্রকার দুঃখ প্রতীকার কুঞ্জরশৌচবৎ হয়। হস্তীকে অবগাহন করাইয়া, উত্তমরূপে তাহার গাত্র ধৌত করাইয়া, আবার যখন তটভূমিতে আনা হয়, তখন পুনরায় সেই হস্তী নিজ দেহকে ধূলিধূসরিত করে। মায়াবদ্ধ মনুষ্যও দুঃখের প্রতীকার করিয়া আবার সেই দুঃখই ভোগকরে। যত্ন করিয়া, চেষ্টা করিয়া, ক্রোধ সম্বরণ কর, শোক বিস্মৃত হও, আবার ক্রোধের উদয় হইবে, আবার শোকের পীড়া পাইতে হইবে।

অতএব সংসারী জীব সাধারণতঃ দুঃখহানির যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, তদ্দারা যে দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি হয় না, সে কেবল অজ্ঞান

বশতঃ। অজ্ঞান বা মায়ার কার্য্য ধ্বংস করাই দুঃখ হানির একমাত্র উপায়। জাগ্রত হইয়া চেতনা লাভ করাই স্বপ্ন ভাঙ্গিবার একমাত্র উপায়।

ত্রিকালজ্ঞ, তত্ত্বদর্শী মহাজনেরা এই তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, এবং দয়াপরবশ হইয়া, জীবের নিস্তার জন্য জ্ঞান লাভের পন্থা সুনির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কত কর্ম্মই করিয়া থাকি। কিন্তু কোন্ কর্ম্মের দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি হইবে, তাহা আমরা স্থির করিতে পারিনা, স্থির করিবার উপায়ও নাই। সেই জন্যই শাস্ত্রকারেরা সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্ম নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন। অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সেই স্বপ্নকালীন পলায়নের ন্যায় আপাত দুঃখ হইতে কখন কখন পরিত্রাণ পাই বটে, কিন্তু দুঃখের যাহা কারণ তাহা যেমনকার তেমনই থাকিয়া যায়। স্বপ্ন ভাঙ্গিবার জন্য যাহা করা আবশ্যক, তাহা করিলেই যেমন স্বপ্ন ভাঙ্গে, সেইরূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের উদয় হয়, অন্যান্য কোন প্রকারে জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না।

স্বপ্ন ভাঙ্গিবার পর, জাগ্রত হইবার পর, সেই স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্র ভীতি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, বৃক্ষে আরোহণ করিবার কিম্বা অন্য কোন প্রকরণ অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানের উদ্রেক হইলেও আর কর্ম্মের প্রয়োজন থাকে না। কেবল জ্ঞান লাভের জন্যই কর্ম্ম আবশ্যক। শাস্ত্রকারদের মতে কর্ম্ম ও জ্ঞানের এই প্রকার সম্বন্ধ।

যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। জ্ঞান লাভের জন্য যে যে কর্ম্ম করা আবশ্যক এবং যে প্রণালীতে করা আবশ্যক, তাহাও বলিয়াছেন। সেই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন অধিকার অনুসারে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় এবং শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে নানা অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হয়। যাগ, জপ, উপাসনা ইত্যাদি যাহা করা আবশ্যক, শাস্ত্রকারেরা তাহাই করিতে বলিয়াছেন; এবং যে প্রণালী ও যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়, তাহাও তাঁহারাই বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের তর্ক বিতর্ক চলে না, কারণ আমরা অজ্ঞান। নিজে যে ব্যক্তি মায়ার অধীন, সে কি প্রকারে মায়াপাশ ছেদনের উপায় নিরূপণ করিবে? যে নিজে অজ্ঞান, সে কেমন করিয়া জ্ঞানের উপদেশ দিবে?

আধুনিক শিক্ষিত অনেক ব্যক্তি জ্ঞানের এবং কর্ম্মের স্বরূপ বুঝেন না। শাস্ত্রীয় পরিভাষাতে অধিকার না থাকায় স্বকপোলকল্পিত ভাবের উপন্যাস

করিয়া ভ্রমের বৃদ্ধি করিয়া থাকেন মাত্র। এইরূপ ভ্রমে পড়িয়া অনেকে দেবার্চ্চনাদিরও নিন্দা করিয়া থাকেন, এবং শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া জ্ঞান লাভের অমূলক পন্থা সকল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রে যাঁহার বিশ্বাস নাই, তাঁহার প্রতি আমাদেরও কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু শাস্ত্রে যদি বিশ্বাস করিতে হয়, সংসার যদি মিথ্যা হয়, দুঃখ হানি করা যদি উদ্দেশ্য হয়, এবং জ্ঞান লাভেই যদি দুঃখ হানির একমাত্র উপায় হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম অবশ্যই মানিতে হইবে। পারলৌকিক বিষয়ে বা পরোক্ষ বিষয়ে ঐহিক-বিষয়-নিবদ্ধ ব্যক্তির পরামর্শ শুনিলে চলিবে কেন? যে স্থলে বিশেষ কোন ফল লাভের জন্য ইচ্ছা থাকে, সে স্থলে সেই ফলেরই বীজান্বেষণ করিতে হইবে এবং সেই বৃক্ষেই জলসেচনাদি করিতে হইবে। কল্পনা, যুক্তি, বিতর্ক বা বিবেচনাতে ফল লাভের কোন সম্ভাবনাই হইতে পারে না।

যাঁহারা শাস্ত্রীয় কর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহাদের ভ্রম প্রদর্শন জন্য একটী শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব।

গ্রন্থমুদ্দিশ্য মেধাবী অভ্যস্য চ পুনঃ পুনঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ॥

কোন গ্রন্থের উপদেশ আয়ত্ত করিতে হইলে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক সেই গ্রন্থ অভ্যাস করিতে হয়। ক্রমে আদ্যন্ত অভ্যস্ত হইলে তখন সেই গ্রন্থকে পরিত্যাগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ধান্য উপার্জ্জনের ইচ্ছা করে, প্রথমাবধি ধান্যের তৃণে অবহেলা করিলে সে কখনই ধান্য লাভ করিতে পারে না। ধান্য লাভ হইলে তখন অবশ্যই পালন অর্থাৎ তৃণকে পরিত্যাগ করে। জ্ঞানরূপ ধান্যের কর্ম্মই পালন। মূলে গ্রন্থ অবলম্বন না করিয়া অধ্যয়নের ফল লাভ যেমন অসম্ভব, পালন অবলম্বন না করিয়া ধান্য লাভ যেমন অসম্ভব, কর্ম্ম অবলম্বন না করিলেও জ্ঞানলাভ সেইরূপই অসম্ভব।

প্রকৃতি বড় না পুরুষ বড়।

কোন বিষয়ের অপ্রাধান্য বা প্রাধান্য স্থাপন করিবার পূর্ব্বে তাহার অবস্থাটি বিস্তৃতরূপে অবগত হওয়া সর্ব্ববাদি-সম্মত। অবস্থাও গুণাগুণ পরিজ্ঞান ভিন্ন তারতম্য অবধারণ করা যায় না; এই জন্য প্রকৃতি ও

পুরুষের কার্য্যাকার্য্য সমালোচনায় যথাসাধ্য প্রবৃত্ত হইতেছি। আমরা যখন বেদান্ত ও সাঙ্খ্যাদি পুণ্যময় শাস্ত্র অধ্যয়ন করি, তখনই প্রকৃতি-পুরুষ-ব্যাপার অবগত হইতে সমর্থ হই। ইহার পূর্ব্বে, প্রকৃতি ও পুরুষকে স্ত্রী ও পুরুষ বলিয়াই জানিতাম। কিন্তু সেইরূপ সংস্কার কেবল আমাদের অনভিজ্ঞতা বা অনধ্যয়নের ফল, বাস্তবিক প্রকৃতি আর পুরুষ কখনই স্ত্রী-পুরুষ নহেন।

আমরা আপাততঃ জগতে দ্বিবিধ পদার্থ দেখিতে পাই। দ্রষ্টা আর দৃশ্য। আমরা জগৎ ও জগতের অনির্ব্বচনীয় কার্য্য কলাপ সন্দর্শন করিয়া বিস্ময় সাগরে অবগাহন করি। আমরা দেখিতে পাই আমাদের মধ্যেও অর্থাৎ আমাদের প্রতি শরীরও জগতের উপাদানে বর্ত্তমান; আমাদের প্রত্যেক শরীর জাগতিক উপাদানেই গঠিত। কোন সময়ে আমার শরীর বলিয়া জগৎকে "আমার" অন্তর্নিবিষ্ট করি, আবার কোন সময়ে "আমার শরীর" বলিয়া সম্বন্ধ রক্ষা পূর্ব্বক "আমিত্বকে" একটু দূরে অবস্থিত করি, এরূপ ব্যবহারের পরিহার করিলে বুঝিতে পারি যে আমাদের আমিত্ব ও দ্বিবিধ; মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য আমি আর চিৎ বা চৈতন্য একই পদার্থ; আর, গৌণ আমি আর প্রকৃতির অংশ এতদুভয়কে দ্রষ্টা আর দৃশ্য বলে, অতএব এই দ্রষ্টা ও দৃশ্যকে চিৎ ও জড় বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে। যাহা চিৎ ও জড় আপাততঃ তাহাকেই পুরুষ ও প্রকৃতি বলিয়া বুঝিতে হইবে। তবে পরিশেষে এতদুভয়েরই স্বরূপাধিগম হওয়া বড় দুষ্কর হয় না।

আমরা শ্বেতাশ্বতরীয় শ্রুতির একস্থানে দেখিতে পাই "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে; বেদান্তের মতে জগতের উপাদান মায়া, সাঙ্খ্যের মতে প্রকৃতি। ফলতঃ, মায়া প্রকৃতি একই পদার্থ, বিভিন্ন নাম মাত্র। উপাদানকে প্রকৃতি বলিতে বেদান্ত ও সাঙ্খ্য ঐকমত্যে গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান। "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ"। ১অ ৪পা ২৩ সূত্রে বেদান্ত জগতের উপাদানকে প্রকৃতি বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও "প্রকৃতিশ্চ উপাদান কারণঞ্চ" লিখিয়াছেন। আবার সাঙ্খ্যানুসন্ধান করিলেও উপাদানকে প্রকৃতি বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। "মূল প্রকৃতির বিকৃতি" এই তৃতীয় কারিকা ব্যাখ্যাসমেত অধ্যয়ন করিলেই অবগতি হয়; ব্যাখ্যার একস্থলে

লিখিত আছে "তত্ত্বান্তরোপাদনত্বঞ্চ প্রকৃতিত্বমিহাভিপ্রেতম্" এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে মায়া ও প্রকৃতি একই পদার্থ বলিয়া উপলব্ধি হইতে পারে। এক কথায় বলা যায় যে বেদান্ত ও সাঙ্খ্য একই ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া শিষ্যমণ্ডলীকে জগৎ কার্য্য অববোধ করাইতেছেন। প্রকৃত পক্ষে সহোদরদ্বয় যেমন একোদরে উদ্ভূত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক পরিশেষে মাতৃক্রোড়ে বা পিতৃক্রোড়ে শান্তিলাভ করেন; সাঙ্খ্য ও বেদান্ত যেন তদ্রূপ। স্নেহ পুত্তলী সন্তান যেমন কোন সময়ে কোন বিষয় বিশেষে মাতাকে বা পিতাকে বড় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে অভিলাষী হয়, সাঙ্খ্য ও বেদান্তও যেন প্রায় তদ্রূপই লীলা করিয়াছেন। যদিও ইহা সম্পূর্ণ সত্য-রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, তথাপি আমরা এরূপ উল্লেখ করিলাম। এখন প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে সঙ্ক্ষেপে বেদান্ত ও সাঙ্খ্যের তাৎপর্য্য লিখিত হইতেছে। বেদান্ত দর্শনের প্রধান সম্বল শ্রুতি। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের উপলব্ধি জন্য শ্রুতির পবিত্র চরণাম্ভোজ সমীপে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সাঙ্খ্যের প্রধান অবলম্বন যোগ ও যুক্তি প্রভৃতি। কিন্তু শ্রুতিকেও কোন অংশে পরিত্যাগ করেন নাই। সুতরাং বেদান্ত শ্রুতির মনোহর শান্তিপ্রদ ধ্বনিতে শ্রবণ করিলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমাত্মা ছিলেন। *

পূর্ব্বে যে সমস্ত শ্রুতি উদ্ধৃত হইল তাহা উত্তর কাণ্ড বা জ্ঞান কাণ্ডের, তদ্ব্যতীত কর্ম্ম কাণ্ডেও তদ্বিধ শ্রুতি রহিয়াছে, "ঋতঞ্চসত্যঞ্চ ভিদ্ধাৎ" উহার অর্থও একই। উর্ণনাভ যেমন স্বীয় দেহ হইতে তন্তু বিস্তার করিয়া অপূর্ব্ব জাল রচনা করে, তাহাতে এক উর্ণনাভই তন্তুর কর্ত্তাও বটে, আবার উপাদান কারণও বটে, উর্ণনাভের যে চৈতন্য আছে তদংশে সে উহার কর্ত্তা আর তাহার যে দেহীয় জড়পদার্থ আছে তদংশে সে ঐ তন্তুর উপাদান

* "সদেব সৌম্যেৎদমগ্র আসীৎ—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"।
সামবেদীয় শ্রুতিঃ।
"আত্মো বা ইদমেক এ ব্যগ্রআসীৎ"
ঋগ্বেদীয় শ্রুতিঃ।
"তদেতদ্ ব্রহ্মা পূর্ব্ব মন পর মনন্তর মবাহৎময় মাত্মাব্রহ্মসের্ব্বানুভূঃ"
যর্জ্জুর্ব্বেদীয় শ্রুতিঃ।
"ব্রহ্মৈবেদসমৃতং পুরস্তাদ্"
অথর্ব্ববেদীয় শ্রুতিং।

কারণ, সুতরাং তন্তুর কর্ত্তা ও উপদান বিভিন্ন নহে; তদ্রূপ পরমেশ্বর ও জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ইহাই পূর্ব্বলিখিত ২৩শ সূত্রে বিস্তৃত রহিয়াছে। সুতরাং জগদীশ্বর ও জগৎ একই জিনিস। কিন্তু নিত্য সত্য ব্রহ্মরূপে আমাদের নিকট জগৎ বিভাসিত হয় না, প্রত্যুত জড় ও অনিত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। আর এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে দৃশ্যমান কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি ব্রহ্ম নহে, অবিদ্যা বশতঃ আমরা ইহার প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করিতে পারি না। এই জগৎ, দুগ্ধের পরিণাম দধির ন্যায়, ঈশ্বরের পরিণাম ও নহে, কারণ পরব্রহ্ম অবিকারী বস্তু, অধ্যাস বশতঃ এবম্বিধ প্রতিভাত হয়। আর এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা সঙ্গত, যে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইলেও বিবর্ত্ত উপাদান। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে যেমন সর্পের অবলম্বন রজ্জুতে বিবর্ত্ত উপাদানে সেই সর্প গঠিত হয়, এই জগৎও তেমন অবলম্বন স্বরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্তভাবে সঙ্গঠিত। সুতরাং বেদান্তমতে মায়া বা প্রকৃতি অনিত্য, উহা ব্রহ্মতে বিলীন হইয়া যাইবে, অন্তীমে তুরীর চৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। কিন্তু প্রকৃতি বা মায়া অনাদি হইলেও তাহা প্রবাহ সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, বস্তুতঃ নহে। শমদমাদি সাধন সম্পদে সম্পন্ন হইলে, যখন মন পবিত্র হইয়া সত্ত্বপ্রবণ হইবে, বৈরাগ্যে হৃদয় সরোবর তরঙ্গায়িত হইবে, তখনই জগতের স্বরূপাধিগম হইয়া থাকে। বাস্তবিক পরমাত্মা ভিন্ন আর সমস্তই অসৎ-মিথ্যা। মায়ার চৈতন্য নাই, উহা জড়, সুতরাং উহা কেবল জগতের উপাদান মাত্র সুতরাং প্রকৃতির প্রাধান্য নাই, পুরুষ বা পরব্রহ্মই প্রধান। যিনি বেদান্তের পরিসেবা করিয়াছেন তিনি মুক্তকণ্ঠে জলদগম্ভীর রবে বলিবেন প্রকৃতি মিথ্যা, পুরুষই সত্য ও প্রধান। পুরুষ পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা। কেবল উপাধি ভেদে বিভিন্নরূপে ব্যপদিষ্ট হন। যেমন জলাশয়স্থ জল পয়ঃপ্রণালী দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইলে বিভিন্ন জল বলিয়া কথিত হয় মাত্র, বস্তুতঃ জল একই। তেমন একই পরমাত্মা অবিদ্যাদি উপাধি ভেদে বিভিন্ন সংজ্ঞায় সঙ্গিত হন। যেস্থলে কতকগুলি বৃক্ষ থাকে তাহাকে বন কহে। বৃক্ষ সমষ্টির নাম বন, একটী বৃক্ষকে ব্যষ্টি বলে। সমষ্টি আর ব্যষ্টি, সমস্ত আর অংশ একই কথা। এইরূপ অবিদ্যা বা অজ্ঞানেরও সমষ্টি ব্যষ্টি গণ্য হইয়া থাকে আবার তাহার সূক্ষ্ম ও স্থূলাকারও আছে। সমস্ত প্রকৃতি অবান্তর বিভাগে বিভক্ত; সুতরাং এক এক অবান্তর বিভাগ লইয়া পরমেশ্বরও বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হন। ফলতঃ, পরমেশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ং। কেবল ব্যবহারিকও

পারমার্থিক ভাবের সমাবেশ মাত্র। অজ্ঞানাদির সমষ্টি ও ব্যষ্টি প্রভৃতি উপাধি ভেদে, ঈশ্বর প্রজ্ঞে, হিরণ্যগর্ভ (সূত্রা) তৈজস,, বিরাট্ (বৈশ্বানর) ও বিশ্ব বলিয়া অভিধান হইয়া থাকে। অজ্ঞানাদি বলিতে বহুবিধ অজ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয়। প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞান এক। সমষ্টিতে এক, ব্যষ্টিতে অনেক। পূর্ব্বোক্ত বন ও বৃক্ষের কথা ভাবিলেই অনায়াসে একত্ব বহুত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। স্থূল ও সূক্ষ্মাদি অবস্থাভেদেও অজ্ঞানের প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ, লিঙ্গশরীর (সূক্ষশরীর) প্রভৃতি অজ্ঞানের সূক্ষ্মাবস্থা। স্থূল শরীর বা কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি স্থূলাবলা। বেদান্ত মতে মায়া (প্রকৃতি) ও অজ্ঞান প্রায় এক পদার্থ। মায়ার একবিধ পরিণামকে অজ্ঞান বলে। সত্ব, রজ ও তম এই ত্রিবিধ পদার্থে প্রকৃতি সঙ্গঠিত। এই পদার্থ ত্রয় "গুণ" বলিয়া কথিত হয়। এইগুণ অম্লত্ব, মধুরত্ব, সাধুতা, বিদ্যাবত্তা প্রভৃতির ন্যায় গুণ নহে, ঐ তিনটি প্রকৃতির উপাদান উপকরণ। উহারা গুণ শব্দে কেন ব্যবহৃত হয়, পরে লিখিত হইবে। আমরা যে কোন পদার্থ দেখিতে পাই সমস্তই ত্রিগুণে নির্ম্মিত। কোন পদার্থ সত্ব প্রধান, কোন পদার্থ রজঃ প্রধান, কোন পদার্থ তমঃ প্রধান। সমস্ত জগতের মূল উপাদান মায়া ত্রিপদার্থ বা ত্রিগুণে প্রস্তুত। মায়া যখন বিশুদ্ধ-সত্ব প্রধানা, তখন মায়া বা প্রকৃতি; আর যখন মলিন-সত্ব প্রধানা তখন অবিদ্যা বা অজ্ঞান। গুণান্তর কে গুণ অভিভব করিয়া প্রাবল্য ধারণ করে। মায়ার একবিধ পরিণাম কে অবিদ্যা বলে। মায়োপাধিক চিৎকে "সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর" বলে। অবিদ্যা বশবর্ত্তী-চৈতন্য, জীব। সুতরাং, উপাধির সম্বন্ধেই চিৎ, ঈশ্বর ও জীব প্রভৃতি বিভিন্ন নাম হইয়া থাকে। উপাধি নশ্বর। নশ্বর জ্ঞান স্থিররূপে অন্তরে প্রতিভাত হইলে সত্য ব্রহ্মজ্ঞানের বিমল জ্যোতি বিভাসিত হয়। জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া পাপ পুণ্যাদি ভস্মীভূত করে, সমস্ত বন্ধন বিদূরিত হইয়া যায়, তখন জীব জীবন্মুক্ত। প্রারব্ধ শরীর পরিত্যক্ত হইলে উপাধির নাশ হইয়া যায়, তখন একমাত্র সৎ পদার্থই থাকে, তাহাই নির্ব্বান মুক্তি। তখন আর কিছুই কর্ত্তব্য থাকে না। ভূমানন্দ বিরাজিত হইয়া চিরসুখ-ময় হয়, জন্ম, মরণ, শোক, দুঃখ জ্বালা প্রভৃতি কিছুই নাই, নিরবচ্ছিন্ন সুখমাত্রই তদানীন্তন অবস্থা। বেদান্তের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল। এবং জানাগেল যে ইহাতে পুরুষ বা ব্রহ্মই হর্ত্তা, কর্ত্তা, তমিস্রহা। প্রকৃতি বা মায়ারপ্রাধান্য নাই, অতএব বেদান্ত মতে, "পুরুষ" বড়। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিবেন যে

এই যে প্রকৃতি ও পুরুষের কথা বলা হইল ইহা কালী ও শিব, বা বিষ্ণু, লক্ষ্মী অথবা ব্রহ্মা ব্রহ্মাণী নহেন। আমরা যে কালী ও শিবাদির উপাসনা করি তাঁহারা সকলেই প্রকৃতি ও পুরুষ এতদুভয়াত্মক অর্থাৎ ঈশ্বর। অতএব তাঁহারা সকলেই এক পদার্থ, একই বস্তু, ছোট বড় নাই। এবং কালী জড় শিব চৈতন্য তাহাও নহে।

ফলসিদ্ধি।

ফলসিদ্ধির তিনটী উপায় শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যথা

'পৌরুষং দৈব সম্পত্ত্যা কালে ফলতি পার্থিব'; মহাভারত।

অর্থাৎ পৌরুষ, দৈব ও কাল এই তিনের উপর ফলসিদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এতন্মধ্যে কালের সহিত ফলের কি সম্বন্ধ কেবল তাহাই এই প্রবন্ধে বিবেচিত হইবে।

১ম। যে ব্যক্তি অকালে ফলের আশা করে, সে মূর্খ। তাহার সকল পরিশ্রম পণ্ড হইবেই হইবে। যে কৃষক, ক্ষেত্রে শস্য রোপণ করিয়াই, ধান্যে গৃহ পরিপূর্ণ করিতে চায়, লোকে তাহাকে বাতুল বলে। যে ব্যক্তি অদ্য আম্রবৃক্ষ রোপণ করিয়া কল্যই তাহার ফল আস্বাদন করিতে চায়, সেও বাতুল। যে ছাত্র বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই, ধনে মানে আপনাকে সকলের শীর্ষস্থানে বসাইতে চায়, তাহাকেও বাতুল বলা উচিত। আর যে ব্যক্তি একটী ধর্ম্মসভা স্থাপন করিয়াই দেশস্থ নর নারীকে বুদ্ধের ন্যায় জিতেন্দ্রিয়, শঙ্করের ন্যায় জ্ঞানী ও চৈতন্যের ন্যায় ভক্ত করিতে চায়, তাহাকেও ভ্রান্ত বলিতে হয়।

এই সঙ্গে সঙ্গে আরও একটী, কথা স্মরণ রাখা উচিত। সুফল যেমন কাল সাপেক্ষ; কুফলও তেমনি কাল সাপেক্ষ। একটী গৃহ দুই দশদিনের অযত্নে ধরাশায়ী হয় না। একটিউদ্যান দুইদশ দিনের অযত্নে কণ্টকে সমাকীর্ণ হয় না। আমেরিকার অধিবাসী দুই দশদিনের অত্যাচারে জন্মভূমি হইতে বিলোপিত হয় নাই। কোন একটী ধর্ম্ম দুই দশদিনের অনা-

চারে বা কদাচারে, লোকের মনোরাজ্য হইতে অন্তর্হিত হয় না। ধনবানের ধননাশ, বিদ্বানের বিদ্যানাশ, পুণ্যবানের পুণ্যনাশ সমস্তই কাল সাপেক্ষ। বিদ্বান্ বিদ্যার আদর না দেখিয়া বিদ্যায় নিরুৎসাহ হন; পুণ্যবান্ পুণ্যের সুখোৎপাদিকতা না দেখিয়া হতাশ হন; জ্ঞানী জ্ঞানের বিকাশ না দেখিয়া বিষন্ন হন; ভক্ত ভক্তির উৎকর্ষ না দেখিয়া মর্ম্মাহত হন। কিন্তু ইহাঁরা যদি মনে রাখেন যে ফল কাল-সাপেক্ষ, তাহা হইলে ইহাঁদের নৈরাশ্যের স্থল থাকেনা। এই জগতের এক জন ন্যায়পর বিচার কর্ত্তা আছেন। তিনি অনবরত কর্ম্মের সহিত কর্ম্ম ফলের যোজনা করিতেছেন। সুকর্ম্ম করিলে সুফল হইবেই হইবে। কিন্তু মনে রাখিবেন 'কালে ফলতি পার্থিব'। ক্ষেত্রে বীজ রোপণ করিয়াই কর্ত্তরিকা হস্তে শস্যচ্ছেদের প্রয়াস পাইবেন না। ধৈর্য্য ও বিচক্ষণতার সহিত যে যাহার কর্ত্তব্য পালন করুন, দেখিবেন, কালে কর্ম্মের সহিত ফলের যোজনা হইবেই হইবে।

অন্যদিকে যে পাপী, সে যদি দেখে যে তাহার পাপের শাস্তি এখনও হইল না, তাহা হইলেও তাহার হর্ষ প্রকাশ করা উচিত নহে। কারণ বিষবৃক্ষও যথাকালে ভিন্ন ফল প্রসব করে না। যখন শরীরে কোনরূপ আঘাত লাগে, তখন তৎক্ষণাৎই তাহার বেদনা অনুভব করা যায় না। আজি মিথ্যা কথা বলিলে আজিই যে শাস্তি হইবে, তাহা নহে। আজি পরদারে প্রবৃত্ত হইলে, আজিই যে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিবে, তাহা নহে। (কালে ফল ফলে কি না, তাহা পাপীকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিবেন।) যিনি জ্ঞানী, তিনি পাপপুণ্যের ফলাফল পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়া তদনুসারে নিজ জীবনকে নিয়মিত করেন। আর যে অজ্ঞানী, সে ফলাফলের আস্বাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত কাহারও কথায় বিশ্বাস করে না। পিতা মাতা সহস্রবার নিষেধ করিতেছেন—"রে বালক, অগ্নিশিখায় হস্ত দিওনা।" কিন্তু যতক্ষণ না বালকের সেই ক্ষুদ্রহস্ত দগ্ধ হয়, ততক্ষণ বালক কোন কথায় বিশ্বাস করে না। বালক হয়ত মনে করে—"বাতাসে হাতদিলে হাত পুড়ে না, জলে হাত দিলে হাত পুড়ে না, মাটীতে হাত দিলে হাত পুড়ে না, আর আগুণে হাত দিলেই হাত পুড়িবে কেন? আগুণে হাত দিলে হাত পুড়ে, এ একটা কথার কথা, কুসংস্কার বিশেষ।" বৃদ্ধ মুনি ঋষিগণ জটাভার মস্তকে করিয়া, কক্ষে অজীন লইয়া, দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে, সদয় হৃদয়ে, সাশ্রু নয়নে, আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন—"আমরা বহুশতাব্দীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, আলোচনা প্রভৃতির

সাহায্যে দেখিতেছি যে হিন্দুর পক্ষে বাল্যবিবাহ বিহিত ও বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ।" আর আমরা ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিতেছি যে ঐ জটাধারী কুসংস্কারাবিষ্ট। কিন্তু কালে আমাদের অহিতাচরণের ফল ফলিবেই ফলিবে। আজি, পঞ্চাশ, ষাটি বৎসর ধরিয়া ভারতবক্ষে যে বিষবৃক্ষের পোষণ ও রক্ষণ হইতেছে, এক্ষণেই তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণে মুকুলোদ্গম হইয়াছে। ঐ দেখুন দেশের বার আনা লোকে নিরন্ন ও একরূপ দিগম্বর। বাকী চার আনা লোকের গৃহে অর্থপ্রাচুর্য্য থাকিলেও সুখশান্তি নাই। গৃহে গৃহে আর সাক্ষাৎ কমলা স্বরূপা গৃহিণী বিরাজ করেন না। লক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে গৃহিণীরা সরস্বতীর আদর করিতেছেন। (আবার আমাদের অদৃষ্ট-দোষে আজি কালি দুষ্ট সরস্বতীরই সমাদর দেখিতে পাই।) যে দিন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে অখাদ্য নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন, যে দিন রামমোহন রায় বেদ বেদান্তের নিন্দা করিয়া বেকনের 'নোভম অরগেনমের' সুখ্যাতি করিয়া ছিলেন, যে দিন গ্র্যাণ্ট ডফ্ ও মেকলে হিন্দুজাতির ও হিন্দুধর্ম্মের সমুচ্ছেদ বাসনায় নানাবিধ কল কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই দিনই যে এই সব কুফল ফলিয়াছিল, তাহা নহে। কালে ফলিয়াছে ও ফলিতেছে। এবং এই সব কুফল দেখিয়াই আমরা পুনরায় স্বধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতেছি। বিধবা বিবাহ অতি অল্পদিন মাত্র প্রচলিত হইয়াছে। এখনও ইহার ফল ফলিবার সময় হয় নাই। সময় হইলে আমরা বুঝিব যে ইহাতেও মুনি ঋষির আজ্ঞা পালন করা আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল।

ফল ফলিবার সম্বন্ধে আর এক নিয়ম এই যে, যে ফল যত গুরুতর, সে ফল তত বিলম্বে ফলে। তৃণ লতার বৃদ্ধি হইতে বহুকাল লাগে না। কিন্তু বহুকালের যত্ন ব্যতীত কেহ আম্রাদি ফলের আস্বাদন পাইতে পারে না। এইরূপ সামান্য সামান্য কার্য্য অল্পকালের মধ্যেই সুসিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু গুরুতর কার্য্যের সময় দীর্ঘকালের প্রতীক্ষা করা উচিত। ধন অপেক্ষা বিদ্যা গরীয়সী, বিদ্যা অপেক্ষা সাধুতা গরীয়সী, সাধুতা অপেক্ষা ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। এই জন্য ধন অপেক্ষা বিদ্যার, বিদ্যা অপেক্ষা সাধুতার, এবং সাধুতা অপেক্ষা ধর্ম্মে অধিক সময় লাগে। যাহারা দুই চারিমাস ধর্ম্মার্চ্চনা করিয়াই ধার্ম্মিকতার ভান করে, তাহারা হয় প্রতারক, নয় প্রতারিত। বাল্মীকি দশসহস্র বৎসর রামনাম জপ করিয়া পরে ধর্ম্মে মতিবান হইয়া ছিলেন। যখন কোন বালক দুই চারিদিন ধর্ম্মালোচনা করিয়া, আপনাকে ধার্ম্মিক, শুদ্ধ ধার্ম্মিক

কেন, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করে, তখন তাহাকে আমার যাদুকর বলিয়া ভ্রম হয়। কারণ, যাদুকর ভিন্ন, ক্ষণেকের মধ্যে বীজ রোপণ, করিয়া ফলভোগ করা অন্যের সাধ্যায়ত্ব নহে। দেখুন, ধর্ম্ম এক বিশাল কল্পপাদপ স্বরূপ। ভূলোক ইহার মূল, অন্তরীক্ষ ইহার শাখা প্রশাখা ও স্বর্গলোকে ইহার পুষ্পফল বিরাজ করিতেছে। চৈতন্যদেব বলিয়া ছিলেন

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালি হয়ে সেই বীজ করয়ে রোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পর-ব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণ চরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

বৃদ্ধেও যে বৃক্ষের কাণ্ডে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না, এখন বালকেও দম্ভ সহকারে বলে, যে, সে তাহার পুষ্পফলের অধিকারী হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা মোহকরী প্রহেলিকা আর কি হইতে পারে?

৩য়। সৎকার্য্যের ফল বিলম্বে হয় বলিয়া, যে, সৎকার্য্য বিলম্বে আরম্ভ করিতে হইবে, অথবা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে আলস্য ও দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা নহে।

"অদীর্ঘ সূত্রস্য ভবেৎ সর্ব্বকর্ম্মসু পার্থিবঃ।
দীর্ঘ সূত্রস্য নৃপতেঃ কর্ম্ম নষ্টং ভবেৎ স্বয়ং॥"

মহাভারত

দীর্ঘসূত্রীর কর্ম্ম আপনাপনিই নষ্ট হয়। অতএব সৎকার্য্যে দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করিবেনা। কোন্ কোন্ স্থলে দীর্ঘ-সূত্রিতা ভাল, শাস্ত্রে তাহাও লিখিত আছে।

"রোগে দর্পেচ মান্যেচ দ্রোহে পাপেচ কর্ম্মনি।
অপ্রিয়ে চৈব কর্ত্তব্যে দীর্ঘসূত্রঃ প্রশস্যতে॥"

অর্থাৎ "রোগ হইলে রুগ্ন অবস্থায় কোন কার্য্য সত্বর করা উচিত নহে। রুগ্ন অবস্থায় মতিভ্রমের বিশেষ সম্ভাবনা। অহঙ্কারে বা অভিমানে উত্তেজিত হইয়া হঠাৎ কোন কার্য্য করা উচিত নহে। অন্যের অনিষ্টাচরণে কাল-

বিলম্ব করা ভাল। পাপানুষ্ঠানেও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিলে পাপে প্রবৃত্তি থাকে না। অপ্রিয় কোন কার্য্য করিতে হইলে, পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির মনে বেদনা দিতে হইলে, কালবিলম্ব করা ভাল।" কিন্তু সৎকার্য্যের সময় অবিলম্বে অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া ধৈর্য্য সহকারে উহার ফলের প্রতীক্ষা করা উচিত।

৪র্থ। ইহা ভিন্ন গ্রহনক্ষত্রাদির গতি অনুসারেও কালের শুভাশুভত্ব নির্দ্ধারিত হয়। হিন্দু জ্যোতিষে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু বলিতে পারিলাম না।

(ভবিষ্যতে ফলসিদ্ধির অন্য দুই উপায় অর্থাৎ দৈব ও পৌরুষ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিবার বাসনা রহিল)

আচার।

ভূমিকা।

জীব মাত্রই, অনুকরণপ্রিয়। একটী পিপীলিকা যে পথে যায়, গোটে গোটে শত শত পিপীলিকা সেই পথে প্রধাবিত হয়। বিশেষতঃ মনুষ্যের অনুকরণপ্রিয়তা যাবতীয় প্রবৃত্তি অপেক্ষা সমধিক বলবতী। সুখ বল, দুঃখ বল—সবই অনুকরণস্তম্ভ বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। বৈদিক কাল হইতে আবহমান এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তাহার প্রমাণ সামবেদ সংহিতার ছন্দ আর্চ্চিকের দ্বিতীয় প্রপাঠকে আম্নাত হইয়াছে। যথা—

"যে তে পন্থা অধোদিকে যে ভি বিশ্ব মৈরয়ঃ।"

হে ইন্দ্র! (পরমাত্মন্) দ্যুলোকে অধস্তলে যে পথ বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং যে পথ অবলম্বন করিয়া (অবতাররূপে) বিশ্বসংসারের অবতীর্ণ হইয়াছ, যজমান কর্তৃক সেই পথ স্তুত হউক; অর্থাৎ যজমানগণ যেন সেই পথে বিচরণ করেন।

ক্রমে লোক সরলবুদ্ধি হওয়ায় বেদের এই নিগূঢ় ভাব ধারণা করিতে সমর্থ হয় না; তাই ইহারই আব্‌ছায়া লইয়া গীতায় ভগবানের শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইয়াছে—

"যদ্‌ যদাচরতি প্রাজ্ঞ স্তত্ত দেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে॥"

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহা যাহা আচরণ করেন, ইতর সাধারণ তাহাই আচরণ করিয়া থাকে। সেই প্রাজ্ঞ যাহা প্রমাণ অর্থাৎ কর্ত্তব্যত্বরূপে স্থির করেন, সাধারণে তাহাই অনুসরণ করে।

লোকের বুদ্ধি ধাপে ধাপে সরল হইতে সরলতর হওয়ায় পুরাণের আবির্ভাব হইল। তাই পুরাণে লিখিত হইল—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

মহাজন যে পথে যান, সেইই পথ। এই মহাবাক্যটী আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই অবগত আছে; কিন্তু আপন আপন মোহজালে জড়িত হইয়া মহাজন চিনিতে ভ্রম হয়। তাই প্রায়শঃ মহাজন ভ্রমে কুজনের আচরিত পথই অনুসৃত হইয়া থাকে, ভ্রমের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া কাচে কাঞ্চনের আদর করে। চন্দন-বুদ্ধিতে মল অনুলেপন করে। কি আশ্চর্য্য! অমৃত ভ্রমে পীত হলাহলে জীবন কণ্ঠাগত! তথাপি চৈতন্য নাই—বিষপানে নিবৃত্তি নাই। চিনিবার দোষে অর্থ অনর্থে পরিণত হয়।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" এই সরলতর কথাটীও আধুনিক সরলতম বুদ্ধিতে ধারণা বড় হয় না, তাই অপেক্ষাকৃত সরলতম করিতে এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। প্রারম্ভেই একটী গল্প উপহার দিব। একদা কয়েক জন সহাধ্যায়ী যথাবুদ্ধি বিদ্যাভ্যাস করিয়া চতুষ্পাটী হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন। পথিমধ্যে একটী চতুষ্পথ দৃষ্ট হইল। তাঁহারা বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। কোন্‌ পথে যান কিছুই নিরাকরণ করিতে পারেন না। কেহ বলেন উত্তর, কেহ বলেন পশ্চিম—এইরূপ সকলেই স্ব স্ব বুদ্ধিসুলভ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে লাগিলেন। অবশেষে, একবাক্যে সিদ্ধান্ত হইল "শাস্ত্রে যে পথ নির্দ্ধারিত আছে, সেই পথে গমন করাই যুক্তিযুক্ত।" শাস্ত্র মুখে নাই, কক্ষে বিলম্বিত। তৎক্ষণাৎ কক্ষস্থ পুস্তক উদ্‌ঘাটিত হইল। দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

তখন সকলেই আহ্লাদে আট্‌খান হইয়া মহাজনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অদৃষ্টের জোরে অন্যতম পথ দিয়া একজন ধেনো মহাজন যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া বৃহস্পতিকল্প জনৈক সুচতুর সহাধ্যায়ী বলিলেন, "এই পথেই আমাদের গমন করা কর্ত্তব্য; কেননা এই পথ দিয়া ঐ মহাজন চলিতেছে।" তখন বিনা বাক্যব্যয়ে সকলেই সেই পথের অনুসরণ করিলেন। বর্ত্তমান সময়েও আমাদের ঠিক ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে। আমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ ঐরূপ ধেনো-মহাজনের আচরিত পথে বাটী যাইতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু তাঁহারা জানেন না—উহা ব্যাপারির পথ, বাড়ী যাওয়ার পথ নয়। এইরূপ বুদ্ধি বিপর্য্যয়ে মহাজন চিনিতে না পারায় আজ সমাজের এত অধোগতি সাধিত হইয়াছে। পরিণামে যে সকলেই পথহারা হইয়া চিরকাল প্রবাস-দুঃখে কাল কাটাইবেন, তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় নাই। অতএব এই সময় হইতে সতর্ক হইয়া মহাজন চিনিবার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

আমরা এক্ষণে ঘোর দুর্গম পথে আসিয়া পড়িয়াছি। এখান হইতে পথ চিনিয়া বাড়ী যাওয়া ভার। মহাজন ভাবিয়া যে সকল আদর্শ পুরুষের আচরিত পথে যতই বিচরণ করিতেছি, ততই দেখিতে পাইতেছি, দুর্গম হইতে দুর্গমতর পথে পতিত হইতেছি। এইরূপ কিছুকাল তাঁহাদের পথের অনুসরণ করিলে এরূপ দুর্গমতম স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে, যে, তথা হইতে পূর্ব্বতন পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উপায়ও থাকিবে না। তাই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলি, এখনও সতর্ক হইলে ভাল হইত।

অধুনা আমরা পাশ্চাত্য "ধেনো-মহাজনের" মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বিনা শঙ্কোচে তাহাদের পদানুসরণ করিতেছি, তাহাদের উপদেশে উপদিষ্ট হইয়া, তাহাদেরই শিক্ষানুসারে বর্ত্তমান দুর্গমপথে বিচরণ করিতেছি। পাশ্চাত্য মহাজনের নিকট কি শিক্ষা করিতেছি—স্বাধীনতা? স্বাধীনতা শিখিতেছি; কিন্তু পরাধীনতা শৃঙ্খলে দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ হইতেছি। ইংরেজি কাজে সকলই ভেল; আসলের গন্ধমাত্র নাই। ইংরেজি-স্বাধীনতা গিল্‌টী করা। 'উপরে রঙ্‌ চঙ্‌ ভিতরে লেল্লাই খেড়।' গিল্‌টী-করা অলঙ্কার দেখিতে ভাল, শুনিতে ভাল, বলিতে ভাল, দরেও ভাল, ব্যবহারে ভাল; কিন্তু কাজে কিছু নয়—দুদিন বাহ্য চাকচিক্যমাত্রই সার। আমরা ইংরেজি গিল্‌টী-করা-চরিত্রবান্‌ মহাজনের অনুকরণে চরিত্র গিল্‌টী করিতে শিখিয়াছি,

বাহ্য ও আন্তরিক ভেদে চরিত্র দ্বিপ্রকৃতিক হইয়াছে। বাহ্য চরিত্র বড় পরিষ্কার; ভিতরে গরল, উপরে দুধের সর। বাহ্য চাকচিক্যে জগৎ ঋল্সিত, স্তম্ভিত ও মুগ্ধ। ভিতরের কালিমায় জগৎ আবৃত, বিড়ম্বিত ও ঘৃণিত। বাহিরের মধুর পরিচ্ছদে, মধুর সংলাপে ও মধুর স্মিতভাবে বড় কুশল হইয়া পড়িয়াছি; কিন্তু ভিতরের পরিচ্ছদ বড় অনিষ্টকর, ভিতরের সংলাপ বড়ই অরুচিকর, এবং ভিতরের স্মিতভাব স্বার্থসিদ্ধিতে জড়িত। আমরা যেন বেশ্যা সাজিয়া সংসারে পশার করিতে আসিয়াছি। আপন আপন ভাবি-ইষ্টানিষ্টের প্রতি লক্ষ্য নাই। লক্ষ্য কেবল অর্থের প্রতি—লক্ষ্য কেবল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির প্রতি। ভিতরে স্বাস্থ্যহানিকর মলিন পরিচ্ছদ, উপরে তোফা ধৌত ইস্ত্রিকরা-জামা। ইহাকেই বলে, "ভিতরে ছুঁচার কীর্ত্তন, উপরে কোঁচার পত্তন।" যাঁহারা এইরূপ দ্বিধাবিভক্ত চরিত্র ভাল বাসেন, তাঁহারা সমাজে আপনার প্রকৃত পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন। ইহার মধ্যে যাঁহারা বিকৃত মুখ, বোধ হয়, তাঁহারা মুখোষ মুখে দিয়া সমাজে অবতীর্ণ হইতে লজ্জিত হন না; কেননা তাঁহারা ভিতরের আবর্জ্জনা বাহিরে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। পাকাগোঁপে কলপ দিয়া যুবক সাজায় কি পৌরুষ, তাঁহারাই বলিতে পারেন। কালের কুটিল গতিকে পবিত্র আর্য্যসমাজ আজ এইরূপ জালিয়াৎ লোককে পূজা করিতেছে। হাটে, মাটে, ঘাটে, বাটে—সর্ব্বত্রই এইরূপ ময়ুরপুচ্ছধারী বায়সে সমাজ ছাপিয়া পড়িয়াছে।

জগতের এই নিয়ম—লোকে সমচরিত্রের আদর করে, বিষম চরিত্রের ঘৃণা করে। পণ্ডিতে পণ্ডিতে, মূর্খে মূর্খে প্রীতি এবং বিপর্য্যয়ে বিপরীত হইয়া থাকে। তাই ইদানীন্তন কুলধুরন্ধরগণের মুখে আর্য্যগণের গর্হা শুনাযায়। তাঁহারা জানেন না, যে স্বাভাবতঃ সুন্দর হয়, বাহ্য আবরণে তাহার মাহাত্ম লুপ্ত হয় না। মলিন মেঘ কি চন্দ্রের গৌরব অপহরণ করিতে পারে? না—সুন্দরত্বেকি মাকালফলের গৌরব বর্দ্ধিত হয়? আর্য্যগণ এই তত্ত্ব বুঝিতেন বলিয়া বাহ্য দৃশ্যের তত আদর করিতেন না, ভিতরের সারে গৌরবান্বিত হইবার চেষ্টা করিতেন। পাশ্চাত্য সভ্যতানুকারী ভ্রাতৃগণ কেবল শরীর লইয়াই তৎপর। শরীরের পুষ্টি, শরীরের শক্তি, শরীরের শোধন, শরীরের গোপন করিতেই ব্যতিব্যস্ত। আর্য্যগণ এরূপ এক অঙ্গের পোষণ, অপর অঙ্গের শোষণ করিতে ইচ্ছা করিতেন না। তাঁহারা তুলাদণ্ডে তুলিত করিয়া মনের ও শরীরের সামঞ্জস্য সমভাবে বিধান করিতেন।

প্রাচীন ও আধুনিক স্বাধীনতার ফলগত বিশেষ এই—কাজে আর মুখে। আমরা মুখে স্বাধীনতার ভান করি; কার্য্যতঃ, ঘোর পরাধীনতা স্বীকার করি। আমরা গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মুখে স্বানুবর্ত্তিতার পরিচয় দিই, কার্য্যতঃ নাক-ফোঁড়া বলদের মত পরের অনুবর্ত্তী হইয়া ভার বহন করি। আমরা ইন্দ্রিয়ের কুহকে পড়িয়া ইন্দ্রিয়ের অধীনে চাকরি স্বীকার করিয়াছি। ইন্দ্রিয় মনের অধীন, মন আবার প্রবৃত্তির বা ইচ্ছার অধীন। প্রবৃত্তি যথন যাহা অনুমতি করিতেছে, মন অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পাদন করিতেছে। মনের এমন অবকাশ নাই যে সে প্রবৃত্ত্যনুমোদিত ইন্দ্রিয় কার্য্য করিয়া অতীন্দ্রিয় কার্য্য কিছু করে বা ভাবে। তবেই দেখুন, দাসানুদাস তস্য দাস হইয়া স্বাধীনতার বড়াই করি। যাহার স্বরাজ্যে বিন্দুমাত্র প্রভুত্ব নাই, তাহার পররাজ্যে প্রভুত্ব-বিস্তারের ইচ্ছা মুর্খতার পরিচায়ক মাত্র। যাহার পরিবার বর্গের মধ্যে স্বাধীনতা নাই, তাহার স্বাধীনতার নাম করিতে লজ্জা হয় না? যাহার আপন ভূমি দখল নাই, তাহার পরভূমির অধিকারের প্রয়াস কি বিড়ম্বনার বিষয় নয়? বহির্জগতে সকলেই রাজা হইতে পারে না; এবং যে রাজা হয়, সেও অন্যমুখাপেক্ষী না হইয়াও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে পারে না। কিন্তু অন্তর্জগতের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। এরাজ্যে সকলেই চেষ্টা করিলে স্বাধীন রাজা হইতে পারে, এবং নিরপেক্ষভাবে একাকীই সতেজে রাজত্ব রক্ষা করিতে পারে। আর্য্য ঋষিগণ এই রাজ্যের রাজা হইয়া ফর ফর রবে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইতেন, তাহার সৌন্দর্য্য ও ঔৎকর্ষ সাধন করিতেন এবং তাহারই পথ, ঘাটের মলা মাটী পরিষ্কার করিয়া রাজা সর্ব্বেশ্বর হইয়া বসিয়া থাকিতেন। এখন যেমন গুরু, তেমনি শিষ্য। যাহার অনুগ্রহে সংসারে নররূপে পরিচয় দিতেছি, যাহার প্রভাবে সংসারে বিচরণ করিতেছি, যাহার কৃপায় ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিতেছি, যাহার সদ্ভাবে আমি, এই ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছি, তাহার প্রতি লক্ষ্য নাই, লক্ষ্য কেবল শরীরের প্রতি। বহির্বাটী পরিপাটী, অন্দরমহল জঙ্গলময়। অথচ অন্দরমহলে অধিক কাল থাকিতে হয়। আহার বল, নিদ্রা বল, শয়ন বল, আরাম বল, বিরাম বল, সকলেই অন্দরমহল লইয়া। বহির্বাটীতে সকের জিনিষ—থাকিলেও হয়, না, থাকিলেও হয়।

কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে আমরা যাহা কেবল

মাত্র সকের দ্রব্য অর্থাৎ যাহা মনুষ্যের জীবনযাপনে কোন প্রয়োজনেই আইসে না তাহাই লইয়া সর্ব্বদা ব্যাপৃত। হতভাগ্য ব্যাশ্বাসক্ত শ্রীহীন মাতালের ন্যায় বহির্বাটির পারিপাট্য বিস্তারে-সর্ব্বদাই-ব্যতিব্যস্ত, অন্দরে পরমানন্দদায়িণী, পবিত্র সুখ সম্বর্দ্ধিণী লক্ষ্মী স্বরূপা ভার্য্যা অনাহারে দীনা হীনা মলীনা হইয়া জীবন যাপন করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা ঘোর দুর্দ্দশা আর কি হইতে পারে। হায়! কি কুক্ষণেই পাশ্চত্যবাসী ম্লেচ্ছজাতি একমাত্র কর্ম্মভূমি, পুণ্যক্ষেত্র শোণার ভারতে আসিয়া স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়া বাহ্য চাকচিক্যময়ী পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রচলন করিয়াছে। কালে যে এই অতি প্রাচীন আর্য্য সংসার কোথায় অধঃপতনের অতল জলধি গর্ভে বিলীন হইবে তাহা কে বলিতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতাই আমাদের সমস্ত অনর্থের মূল। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণেই আমরা আমাদের বহুযুগের সঞ্চিত অনুভবশক্তি হারাইয়াছি ও হারাইতেছি। মনের সে সহিষ্ণুতা নাই—স্নেহহীন দ্বীপের ন্যায় সহিষ্ণুতা নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছে। আর ও কত অনিষ্ট সজ্ঘটন হইতেছে তাহার নির্ণয় কে করিবে?

ক্রমশঃ।—

স্বধর্ম্মত্যাগ।

২য় প্রস্তাব।

কি ছিল কি হইল।

উপরি লিখিত উপোদ্ঘাত দর্শনে, অনেকে মনে করিতে পারেন, যে আমরা, অতীত কাল ও বর্ত্তমান কালের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতীত কালে, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে ভারতবাসী বিশেষতঃ হিন্দুজাতি কিরূপ ছিলেন, এবং এইক্ষণই বা তাঁহারা কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, সম্ভবতঃ এই সকল বিষয়েরই উত্তর আমাদের নিকট প্রত্যাশা করিতে পারেন। কিন্তু আমরা বেদব্যাসের ন্যায় পত্রিকায় এই সকল বিষয়ের আলোচনায়, এখনও অবসর পাইনাই। ইনি যে ধর্ম্মালোচনরূপ মহাব্রতেব্রতী হইয়াছেন, তদ্বিষয়েই ইহার অনেক কর্ত্তব্য

শেষ রহিয়াছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া বিষয়ান্তরে হস্তার্পণ এখন উচিত বলিয়া বোধ হয় না। অতএব, এই প্রস্তাবে ধর্ম্ম বিষয়ে, আমাদের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাই আলোচিত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ। (১)

যিনি কি মানুষ, কি মহিষ, কি মশক—সকল ভূতে ভগবানের নিরতিশয়ৈশ্চর্য্য ভগবদ্ভাব সাক্ষাৎ দর্শন করেন। কোন তারতম্য অনুভব না

এই শ্লোকে "আত্মন্" শব্দের অর্থ নারায়ণ। আত্—অর্থ বিস্তৃত; মন—অর্থ প্রমাতা—সংশয়ও নয় বিপর্য্যাসও নয়—এবংবিধ যথার্থ জ্ঞানের আশ্রয়। এই দুই পদের যোগে ব্যুৎপাদিত হইলে আত্মন্ শব্দ তাঁহাকেই বুঝাইতে পারে। তন্ত্র শাস্ত্রে এইরূপ ব্যুৎপত্তি নিরূপিত হইয়াছে যথা—

"আতত্বাৎ প্রমাতৃত্বাদাত্মাহি পরমো হরিঃ"।

আতত অর্থাৎ বিস্তৃত এবং প্রমাতা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া পরাৎপর হরিই আত্মা। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে জীবকেও আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কারণ জীবেরও ব্যবহারিক যথার্থ জ্ঞানআছে; যথার্থ জ্ঞান দ্বিবিধ—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক—লোকে কিরূপ ইহারবৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় তাহা আলোচনা করুন—মনে করুন যেন আপনারা রামাভিষেক নাটকেরঅভিনয় দেখিতেছেন। তখন যদি আপনারা রাজমহিষী কৌশল্যাকে সুমিত্রা বা সীতা বলিয়া মনে করেন একজন বিচক্ষণ দর্শক আপনাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিবেন। পরন্তু এই বিচক্ষণ দর্শকের যথার্থ জ্ঞান, হয়ত, অভিনীত রূপ বিষয়েই পর্য্যাপ্ত; কোন্ ব্যক্তি ঐ রামজননী বেশে অশ্রুমোচন করিতেছেন; তাহা তাঁহার নিকটও অবিদিতই রহিয়াছে। এই সংসার নাটকে ও আমরা ঐরূপ প্রমাতা—অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানী, যথা কনাদ বলিতেছেন—অবিকসিত পদ্মে তোমরা দ্বিবিধ সংযোগ দেখিতেছ— এই পুষ্পের একটি দল দলান্তরের উপর যে সংযুক্ত রহিয়াছে—এই সংযোগকে অনারম্ভক সংযোগ বলে, কিছুকাল পরেই উহা বিনষ্ট হইবে, কিন্তু উহাতে পুষ্পের নাশ হইবে না প্রত্যুত উহার শোভা এবং সৌরভ পরিবর্দ্ধিত হইবে। আর এক প্রকার সংযোগ আছে যাহাকে পদ্মের আরম্ভক সংযোগ বলে—কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ উহা দ্বারা সম্মিলিত হওয়াতে পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছে—উহার অভাবে পদ্মের কোনও অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। আমরা এই উপদেশ লাভে উপকৃত হইলাম সন্দেহ নাই কিন্তু পরমার্থতঃ ঐ আরম্ভক সংযোগ কি? তাহা আমাদের নিকট অবিদিতই রহিল। তাহার উত্তর দানে আমাদের অধিকার নাই। ইহা কেবল ভগবানই জানেন—অতএব তিনিই পরমার্থিক প্রমাতা, সংসারিগণ ব্যবহারিক প্রমাতা মাত্র।

করেন এবং বুঝিতে পারেন—যে জাড্য নাই, মালিন্য নাই, ভূতাশ্রয়ত্ব নাই, অথচ সকল ভূত ভৌতিক পদার্থ তাহাতেই অবস্থান করিতেছে, তিনিই উত্তম ভাগবত।

তাঁহার দ্বিতীয় লক্ষণ এই—

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈর্থান্ যো ন দেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ সবৈভাগবতোত্তমঃ।

নারায়ণাসক্ত চিত্ত উত্তম ভাগবত ব্যক্তি ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার নিবন্ধন অধ্যাত্ম লোচনে তাঁহাকেই দর্শন করেন। তদীয় ইন্দ্রিয়গণ বিষয় পরিগ্রহ করে না। যদি করে, তথনও তাহার রাগ বা দ্বেষ উৎপন্ন হয় না।

তাঁহার তৃতীয় লক্ষণ এই—

দেহেন্দ্রিয় প্রাণ মনো ধিয়াং যোজন্মা প্যয়ক্ষুদ্ভয় তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসার ধর্ম্মে রবিমুহ্যমান স্মৃত্যা হরের্ভাগবত প্রধানঃ।

ভাগবত প্রধান ব্যক্তি, সতত নারায়ণের স্মরণ নিবন্ধন, দেহের জন্ম, মৃত্যু, প্রাণের ক্ষুৎপিপাসা, মনের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা, এবং ইন্দ্রিয়ের শ্রম ইহার কিছুতেই বিমুগ্ধ হয়েন না।

তাহার চতুর্থ লক্ষণ এই—

নকাম কর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈক নিলয়ঃ সবৈভাগবতোত্তমঃ।

এক মাত্র বাসুদেবেই, একান্ত নির্ভর নিবন্ধন, যাঁহার চিত্তে, কাম, কর্ম্ম, এবং বাসনার উৎপত্তি না হয়—তাহাকে ভাগবত প্রধানবলে।

তাঁহার পঞ্চম লক্ষণ এই—

ন যস্য জন্ম কর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিহংভাবো দেহে বৈ সহরেঃ প্রিয়ঃ॥

সৎকুলে জন্ম, তপস্যাদি কর্ম্ম, ব্রাহ্মণাদিবর্ণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম, অনুলোম বিলোমে মূর্দ্ধাভিষিক্ত প্রভৃতি জাতি—এতন্নিবন্ধন যাঁহার দেহে অহঙ্কার উৎপন্ন না হয়—তিনি ভগবানের প্রিয়।

ন যস্য স্বঃপরইতিবিত্তেম্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃশান্তঃ সবৈভাগবতোত্তমঃ॥

যাঁহার চিত্তে স্বকীয় এবং পরকীয় বলিয়া ভেদ জ্ঞান নাই এবং আত্মবিষয়ে আমি এবং অন্য, এই পার্থক্য বোধ নাই। যিনি সৰ্ব্বভূতে সমান এবং শান্ত তিনি প্রধান ভাগবত।

এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে, ভাগবত ধর্ম্মে এবং শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মে প্রভেদ কি? ইহার উত্তর--কোন প্রভেদ নাই। তবে একটু প্রভেদ এই থাকিতে পারে, যে ব্রহ্মনিষ্ঠ পরমহংসগণ সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় জ্ঞান মার্গী, ভাগবতগণ সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত, ভক্তি তরণীর যাত্রী।

বর্ত্তমানে বাবুদিগের যে ব্রাহ্মধর্ম্ম উহা শাস্ত্রীয় নহে, সুতরাং আমাদের শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও বাবুদের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ কারণ বাবুরা কোন শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না।

ভাগবতগণ সকল জাতিতে সমভাব প্রদর্শন করিতেছেন; বাবুগণ ও জাতি ভেদ পরিত্যাগ করিতেছেন—ইঁহাদের প্রভেদ কি? বিশেষ প্রভেদ আছে। পূর্ব্বে রণজিৎ সিন্ধিয়া এবং মহলাররাও হোলকার, মহারাষ্ট্র রাজের অধীনে রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়েও ত অনেকে রাজার পর রাজা বাহাদুর পদও পাইয়া থাকেন—তথাপি উহা যেমন এক জাতীয়ই নয়;—শাস্ত্রীয় সমভাব এবং বাবুদিগের সমভাব ও তদ্রূপ। প্রাগুক্ত দুই ভারতীয় কৃতীপুরুষের অর্থসাধক রাজপদের সহিত বর্ত্তমান অনর্থকর রাজপদের যেমন প্রাচ্য প্রতীচ্যবৎ বৈপরীত্য অনুভূত হয়, শাস্ত্রীয় ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভূত সাম্যবাদের সহিত বাবুদিগের শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাম্যবাদেরও তদ্রূপ অন্তর বুঝিতে হইবে।

ভাগবতগণ বলেন, এই সংসার এক নাট্যশালা ইহাতে কোন এক ব্যক্তি, নানা ভূমিকায় আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া রঙ্গস্থ সংসারী দিগকে কখন ও প্রেমে মুগ্ধ, কখন ও বিষাদে ম্রিয়মাণ কোন সময়ে শোকে আতুর, অন্য সময়ে আনন্দে বিহ্বল করিতেছেন; আমরা তাঁহাকে, রঙ্গে বসিয়া, পৃথক ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেছি। কিন্তু যে ব্যক্তি রঙ্গস্থান অতিক্রম করিয়া মায়াময়ী যবনিকার অন্তরালে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিতেছেন যে যাহাকে আমি পূর্ব্বে নানা ব্যক্তি মনে করিয়াছিলাম, তিনি কেবল ভূমিকা ভেদে বিভিন্নরূপ হইয়াছিলেন কিন্তু বাস্তবিক একই ব্যক্তি। এই এক ব্যক্তি কে? অষ্ট

মূর্ত্তি সদাশিব বা অষ্ট প্রকৃতি নারায়ণ। (১) সংক্ষেপতঃ ভাগবত ও পরমহংসগণ যে, জাতি ভেদে অনাস্থাবান্ হন্—তাহার কারণ "বাসুদেবঃ সর্ব্বং"—এই সর্ব্বাত্মদর্শন। বাবুরা যে জাতি ভেদ পরিত্যাগ করেন—তাহা সর্ব্বাত্মদর্শন বা ঈশ্বর জ্ঞান সাপেক্ষ নহে—তাহার যুক্তি এই,—

"তুল্যত্বেব পুংসাং মুখাদ্যবয়বৈবর্ণক্রমঃ কীদৃশঃ।
যো যেয়ং বস্তুবা পরস্যতদনুং ভেদং ন বিদ্যোবয়ং" ॥

প্রবোধ চন্দ্রোদয়।

মুখ হস্ত পদ প্রভৃতি যখন তুল্য, তখন আবার বর্ণ ভেদ কি? এই স্ত্রী বা এই ধন পরের এই কি ভেদ? ইহাত আমরা বুঝিতে পারি না।

বাবুগণ, এই প্রকার চার্ব্বাক যুক্তি অনুসারে জাতি ভেদ পরিত্যাগে উদ্যত। অতএব ইহা অশাস্ত্রীয় ও অজ্ঞান বিজৃম্ভিত। এবং প্রাগুক্ত জাতি ভেদ ত্যাগ শাস্ত্রীয় ও জ্ঞানকৃত।

পাঠকগণ, জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যখন উভয়েরই কার্য্য এক; তখন একটি অজ্ঞান কৃত, অপরটি জ্ঞান কৃত কেন? এবং উহাদের ফল গতই বা তারতম্য কেন হইবে? আমরা এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের নিমিত্ত, এই স্থানে, একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি।

মনে করুন, আপনারা যেন বেণীসংহার নাটকের অভিনয় দেখিতেছেন। প্রথমে ভীমসেনের কথা শুনিলেন এবং ভাবভঙ্গি দেখিলেন; কিছুকাল পরে রাজা দুর্যোধন আপনাদের নিকট উপস্থিত। আপনারা এই উভয় বীরের পৃথক্ পৃথক্ ভাব অনুভব করিয়া পরমপ্রীতি অনুভব করিতেছেন; কল্পনা করুন—আপনার পার্শ্বে যে বিলাস বাবু

(১) এইজন্য শিবপূজা কালে, শৈবগণ, তাঁহাকে ক্ষিতি জল অনল আনল গগণ যজমান চন্দ্র ও সূর্য্য—এই অষ্ট মূর্ত্তিতে আরাধনা করেন। ইহার মন্ত্র ভবিষ্য পুরাণে লিখিভ আছে—যথা সর্ব্বায় ক্ষিতি মূর্ত্তয়ে নমঃ, ভবায় জল মূর্ত্তয়ে নমঃ, রুদ্রায় অগ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ, উগ্রায় বায়ু মূর্ত্তয়ে নমঃ ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে নমঃ, মহাদেবায় সোম মূর্ত্তয়ে নমঃ, ঈশানায় সূর্য্য মূর্ত্তয়ে নমঃ, বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকে ও অষ্টবিধ প্রকৃতিতে বিরাজমান দর্শন করেন যথা—

ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃখং মনোবুদ্ধিরেবা।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।

গীতা ৭ম অধ্যায় ৪র্থ শ্লোক।

বসিয়া আছেন তাহার বিবেচনায়, ঐ উভয়ই একব্যক্তি! আপনারা তখন অবশ্য স্বীকার করিবেন যে বিলাস বাবু বড় হস্তি মূর্খ! তাহার অভিনয় দেখা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি—আর একজনও বলিতেছেন যে ঐ উভয় ব্যক্তিই এক। তিনি হরিদাস বাবু! হরিদাস বাবু নেপথ্য শালায় গিয়া জানিয়াছেন যে একই ব্যক্তি প্রথম বার ভীমসেন বেশে এবং দ্বিতীয় বার দুর্যোধন বেশে রঙ্গস্থানে অভিনয় করিয়াছেন। আপনারা কি তাহাকেও হস্তি মূর্খ এবং অভিনয় দর্শনের অযোগ্য বলিবেন? আমরা, বলি, কখনও নয়।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তে উভয়েই এক কথা বলিতেছে অথচ একজন অজ্ঞ, ও অকর্ম্মা এবং দ্বিতীয় জন বিজ্ঞ ও কৃতী। এই উভয়ের যে বৈলক্ষণ্য, ভাগবত ও বাবুগণেরও সেই বৈলক্ষণ্য। অতএব, এক বিষয়ই, ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে শাস্ত্রীয় ও জ্ঞানমূলক, এবং অপরের পক্ষে সম্পূর্ণ তদ্বিপরীত, ইহাতে কোন বাধা নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বাবুগণ কোন্ সাহসে এই শাস্ত্র বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন? কোন্ মূর্খই বা স্বাধীন জগদ্গুরু ঋষিগণের মত উপেক্ষা করিয়া, পরাধীন, দুর্ব্বল, বিষণ্ণ, বিজাতীয় শিক্ষায় বিকৃতিভাবাপন্ন বাবুদিগের মত অনুসরণ করিয়া চলিতে সাহস করে?

সমাজের এই প্রকার গতি, অনেকাংশে কাল, অবস্থা এবং শিক্ষাদোষে ঘটিয়াছে। বাবুদিগের নিজের দোষ তত নয়। কালে এই ঘটিয়াছে; রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত ভাগবতগণের বাক্যের অর্থকামপরতন্ত্র বাবুগণ কেন, শিশুগণও করিয়া থাকে। এইক্ষণে যাঁহারা শাস্ত্রে বিরুদ্ধ মত অনুসরণ করিতেছেন তাঁহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, । যেমনএকপার্শ্বে বহুকাল শয়ন করিলে পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে অভিলাষ হয়; নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, অনেকে সেই ভাবে, ধর্ম্ম, আচার বেশ পরিচ্ছদ সমুদায় পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

২য়তঃ। কেহ কেহ অর্থ ও কামের বিরোধী বলিয়া সনাতন ধর্ম্ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক নবধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। অপরেরা অজ্ঞতানিবন্ধন তাহাদের অনুসরণ করিতেছেন।

আপনারা অবশ্য দুঃখিত হইবেন না যে আমাদের দেশের প্রাচীন কালের ব্যবস্থা এই যে—

প্রবুদ্ধ শ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্মং অর্থঞ্চাস্যাবিরোধিনং।
অপীড়য়াতয়োঃ কাম মুভয়োরপি চিন্তয়েৎ।
বিষ্ণুপুরাণং।

প্রাতে গাত্রোত্থান কালে প্রথমতঃ ধর্ম্ম চিন্তা করিবে, পরে উহার অবিরোধে অর্থার্জনের উপায় অনুসন্ধান করিবে, অনন্তর উক্ত উভয়ের পীড়া না হয় এমন ভাবে সুখভোগের জন্য যত্নবান হইবে। কালে কি এই হইল—যে

প্রবুদ্ধ শ্চিন্তয়েৎ কাম মর্থ ঞ্চাস্যাবিরোধিনং।
অপীড়য়াতে ধর্ম্ম মুভয়োরপি চিন্তয়েৎ। ?

ইহার উত্তরে আমরা বলি যে ইহা দৈব দুর্ব্বিপাক সন্দেহ নাই।

৩য়তঃ আর এক সম্প্রদায় আছেন; তাঁহারা, ধর্ম্মের জন্য তত নয়, কিন্তু রাজনীতির জন্য জাতি ভেদ উন্মূলিত করিতে উদ্যত—এবং তদনুরোধে ধর্ম্মত্যাগ করিতেও প্রবৃত্ত। বোধ হয় এই সম্প্রদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ। এই সম্প্রদায় দ্বারা, নব্য সমাজ, সমধিকরূপে পরিরক্ষিত হইতেছে। ইহাদের অভিপ্রায় এই যে, জাতি ভেদ থাকিলে ঐক্য সম্ভবেনা, তদভাবে সমবেত হওয়া যায় না। অসমবেত অবস্থায় থাকিলে, রাজনৈতিক দুর্ব্বলতার পরিহার হয় না, তদ্ব্যতিরেকে প্রতিদ্বন্দিগণ পরাভূত হইতে পারে না, তাহা না হইলেই বা দেশের উন্নতি সম্ভাবনা কি ?

পাঠক দেখিলেন, যে, শ্যেন পক্ষী আকাশে উড্ডীন হইতেছে বটে, কিন্তু উহাকে পৃথিবী আকর্ষণ করিতেছে—উহার পতন অনিবার্য্য। বাবুগণও ভাগবতদিগের বড় কথা বলিতেছেন বটে কিন্তু তাহাদের গতি নিম্ন দিকে।

যাহা হউক, যাঁহারা রাজনীতি অনুসারে ধর্ম্ম সংস্কার এবং সমাজ সংস্করণ করিতে উদ্যত, তাঁহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, বাবুদিগের বাবু ধর্ম্ম যেমন ঐক্য বন্ধনের প্রতিকূল; অন্য কোন ধর্ম্মই তদ্রূপ নহে। কারণ, এক বিষয়ের আস্থা থাকিলে মনের গতি এক প্রকার হয়, তদনুসারে লোকের ঐক্যমত্য ঘটে; বাবুগণ তাদৃশ বিষয়ে বঞ্চিত; সুতরাং, ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মতপার্থক্য এত অধিক। এবং ইহারা, এই প্রকার প্রাতিস্বিক মতভেদ উন্নতির লক্ষণও মনে করেন। যাঁহাদের মনের গতি এই প্রকার, তাহাদের ঐক্য সম্ভাবনা কোথায় ?

বিশেষতঃ প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায়কে একেবারে উচ্ছিন্ন করিয়া, জাতীয় নৈতিকবল সাধন করিবার উদ্যমত "তাল রুইয়া তাল খাওয়ার" প্রত্যাশা মাত্র; ইহার দৃষ্টান্ত, যে, ইতিমধ্যেই যাহাদের ঐক্যমত্য ছিল তাহারা সহস্রধা বিভক্ত মতাবলম্বী হইয়া উঠিল।

যাঁহারা নীতিশাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া স্বধর্ম্মে উপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়ের চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

১ম। স্বধর্ম্মত্যাগ নিবন্ধন স্বজাতি বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য কি না ?

২য়। যাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নব্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য হইতেছে কি না ?

৩য়। ব্রাহ্মণাদিবর্ণের মধ্যে জাতিভেদ নিবন্ধন, যে, একটু পার্থক্য ছিল, তদপেক্ষা এই মতভেদ তীব্রতর কি না ?

৪র্থ। প্রকৃত হিন্দুরা, যেমন, প্রত্যেক বিষয়ে সমাজের কল্যাণ কামনায়, সমাজের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, অগ্রসর হন, যাঁহারা স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে উহা কষ্টতর হইয়া উঠিতেছে কি না ?

৫ম। স্বধর্ম্মত্যাগ করায়, মহানুভব সিদ্ধ, পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিশ্রদ্ধার লাঘব হইবে কি না ? এবং তাঁহাদের বংশধর বলিয়া যে আত্মাদর টুকু আছে, তাহাতে জাতি সঙ্কর নিবন্ধন, অধিকারের ত্রুটি হইবে কি না ?

৬ষ্ঠ। যদি হয়, তবে হীন দশা হইতে, উদ্ধার পাইবার জন্য যত্নের ত্রুটি সম্ভব কি না ?

৭ম। শোণিতভেদ মূলক জাতিভেদ উন্মূলিত হইলে, ধনমূলক জাতিভেদ উপস্থিত হইবে কি না ?

৮ম। যদি হয়, তবে ধনের প্রতি সমধিক সম্মান নিবন্ধন, লোক, নীচোপায়ে ধনোপার্জ্জনে, সমধিক অনুরক্ত হওয়ায় সাধু সচ্চরিত্র মনুষ্যের অধিকতর অভাব হইবে কি না ?

৯ম। স্বধর্ম্মত্যাগ করিলে, আর্য্যশোণিতে অনার্য্যশোণিত মিশ্রিত হইবার ভূয়সী সম্ভাবনা কি না ? এবং তন্নিবন্ধন আর্য্যজাতির গৌরব ও প্রকৃতির হানি হইবে কি না ?

১০ম। কোন মহাপুরুষের মতে বা গ্রন্থে লোকের আস্থা না থাকিলে, দণ্ডবিধিতে যতদূর অনুমোদন করে, পরস্পর তদপেক্ষা অতি-

রিক্ত বিশ্বাস করিতে লোক সাহস করিবে কি না? অন্ততঃ উহার হ্রাস সম্ভব কি না? এবং তন্নিবন্ধন একতাবন্ধন শিথিলীকৃত হইবে কি না? বেদব্যাসের পাঠকগণ অবশ্য বলিতে পারেন যে কি ছিল কি হইল? কোথায়, ধর্ম্মব্যবস্থার অধীন হইয়া রাজনীতি কার্য্য করিত; এখন কি না ধর্ম্মব্যবস্থা হইল রাজনীতির অধীন!

আমরা বলি, যাহার লক্ষ্য স্বর্গ ও অপবর্গ, সেই ধর্ম্মশাস্ত্রকে, যাহার লক্ষ্য ক্ষণভঙ্গুর অর্থ ও কাম সেই নীতি শাস্ত্রের আয়ত্ত হইতে হইল, ইহা যে, কালের বিষম পরিণাম, তাহারত সন্দেহই নাই। বিশেষতঃ আমাদের নৈতিকগণ যেভাবে উহার পরিচালনা করেন তাহাতে সেই অর্থ কামইবা সিদ্ধ হয় কোথায়? যদিও নীতি-শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে দুর্ব্বল, তথাপি উহা দূরদর্শীর হস্তে ন্যস্ত হইলে, কার্য্যতঃ, ঐ উভয়ের বড় বৈলক্ষণ্য হয় না; অতএব, আমাদের নৈতিক-গণ যেন একটু অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদ।

ওঁ নমঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহায়। সমগ্র বেদ, বেদান্ত, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র যথোচিতরূপে অধ্যয়ন করিলেও আত্মধ্যান ব্যতীত যাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান-নেত্রের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয় না; যাঁহার প্রকাশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইতেছে; স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তি অবস্থায় যিনি কেবল সাক্ষীরূপে বিদ্যমান থাকেন; সেই বাক্য ও মনের অগোচর পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ দ্বৈতভাবে জগতে বর্ত্তমান আছে কিনা,—সমগ্র বেদ ও দর্শনের ভিত্তি স্বরূপ এই গুরুতর বিষয়ের বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সহজেই এরূপ প্রশ্ন মনে মনে উপস্থিত হয়, যে, মহাত্মা মহর্ষিগণ কি এরূপ গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে বাকি রাখিয়াছেন? কখনই নহে, এবং আমরাও এ প্রবন্ধে তাঁহাদের মীমাংসারই পর্য্যালোচনা

করিব, তদ্ভিন্ন এবিষয়ের নূতন মীমাংসা করা আমাদের সাধ্য নয় এবং করিলে ম্যাক্সমিউলার প্রমুখ "নব্য বেদজ্ঞ" গণের ন্যায় হয়ত, ঈশ্বর-বাক্য সনাতন বেদকে "কৃষকের গান" বলিয়া বসিব। কেহ এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে, মীমাংসিত বিষয়ের আলোচনার আবশ্যক কি? আবশ্যক এই, যে, আজ কাল নূতন সভ্যতার প্রভাবে আর্য্যগণের প্রাণ-ধন বেদ, বেদান্তাদি শাস্ত্র সকল প্রায়ই নব্যভাবের অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইতেছে, যাহা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্যের বিপরীত; সুতরাং, তদ্দ্বারা শাস্ত্রের অবমাননা হয়। দ্বিতীয়তঃ পূজনীয় মহর্ষিগণ আপন আপন গ্রন্থে,—তাঁহাদের সন্তান গণের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত, কিরূপ সুধামাখা উপদেশ সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিবার নিমিত্ত অনেকেই অত্যন্ত পিপাসু। আবার কোন কোন মহাপুরুষ (?) "বেদ, দর্শনাদির অনুবাদ পাঠ করিলে মহর্ষিগণকে 'কৃষক' বলি-বারসুযোগ হইবে" এইরূপ অভিপ্রায়ে ঐসকল গ্রন্থ ক্রয় ও অধ্যয়ন করিতে-ছেন। এইরূপে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মার্থ অবগত হইতে না পারিয়াই অনেকে আস্তিক গ্রন্থ অর্থাৎ ঈশ্বর প্রতিপাদক গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া নাস্তিক হইয়া বসেন, আম্রফল লাভের আশায় মাকাল ফল লাভ করেন। যে ব্যক্তি একমণ মোট বহন করিতে না পারে, তাহাকে, তিনমণ মস্তকে করিলে, যেরূপ ফল পাইতে হয়, অধিকারী না হইয়া বেদ দর্শনাদির সহিত "চড়ুইভাতি" খাইলেও ঐরূপ কষ্টের কারণ উপস্থিত ঘটিয়া থাকে। আমরা অনেকেই আজ কাল দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ যুক্ত অনেকানেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছি, কেহ কেহ বা উপনিষৎ ও পঞ্চদশী প্রভৃতি গ্রন্থের "মায়াবাদ"— অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন সকলই মায়ার কল্পনা মাত্র; অতএব আমরা যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, করিতেছি তৎসমুদায়ই মিথ্যা, স্বপ্নের ন্যায় অলীক, —এইরূপ উপদেশ সকল পাঠ করিয়া, বলিতেছেন, যাগ, যজ্ঞ, পূজা, সন্ধ্যা, যোগ তর্পণ সকলই মিথ্যা ও মায়ার কল্পনা মাত্র। দেব, দেবী, কিছুই নাই কেবল "একমেবাদ্বিতীয়ম্"!

পাঠক মহোদয়গণ! এইরূপ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" রূপী অদ্বৈত বিশ্বাস, নাস্তিকতার অন্য নাম মাত্র। সহজেই মন যাগ, যজ্ঞ, সন্ধ্যা, পূজাদির প্রতিবাদী, তাহাতে মহর্ষিগণের গ্রন্থও সাপক্ষ্যে দাঁড়াইল, তবে আর নাস্তিক মনকে কে আস্তিক করিতে পারে? একেই ভোলা গাঁজাখোর

তাতে আবার গুলির আড্ডায় বাস। এই জন্য, আমরা অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধি হইয়াও এই গুরুতর বিষয়ে হস্তার্পণ না করিয়া সুস্থির থাকিতে পারিলাম না।

এখন দেখা যাউক অদ্বৈতবাদযুক্ত গ্রন্থ সকলেরই বা কি অভিপ্রায় আর দ্বৈতবাদযুক্ত গ্রন্থ সমূহেরই বা অভিপ্রায় কি এবং কেনই বা মহর্ষি গণের মধ্যে এইরূপ মতভেদ উপস্থিত হইল ?

অদ্বৈত শ্রুতি বলিতেছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (১)। "আত্মা বা ইদমেকএবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ (ঐতরেয়োপনিষৎ) এই সমস্তই ব্রহ্ম।

জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান ছিলেন। আত্মা ভিন্ন এই পরিদৃশ্যমান-জগতের কোন অংশও ছিল না। "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ (মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। মন্ত্রঃ ৮)। ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের চতুর্থপাদ সর্ব্বপ্রকার প্রপঞ্চ রহিত। জাগ্রত, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ স্থান-ধর্ম্ম তাঁহার নাই, অতএব তিনি শান্ত। তিনি শিব স্বরূপ, তিনি অদ্বৈত অর্থাৎ দ্বিতীয় শূন্য ও ভেদ রহিত। তিনি পরমাত্মা এবং তিনিই বিজ্ঞেয় অর্থাৎ একমাত্র জানিবার বিষয়॥

অদ্বৈতবাদী।—মাণ্ডুক্যোপনিষদের গৌরপাদীয় কারিকাতে "এই শ্রুতির অদ্বৈত শব্দের মর্ম্মার্থ সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে সংক্ষেপে উক্ত কারিকার ২টী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

"কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মদেহঃ স্বমায়য়া।
স এব বুধ্যতে ভেদা নি তি বেদান্ত-নিশ্চয়ঃ" ॥ ১২ ॥

বৈতথ্যাখ্যং দ্বিতীয় প্রকরণম্।

আত্মা স্বয়ংই আত্মাকে কল্পনা করেন, তিনি কোনরূপ কারণাদির অপেক্ষা করেন না। আত্মা আপন মায়া দ্বারা আপনাকে (নানারূপে) কল্পনা করিয়া থাকেন। তিনিই সকলের ভেদ জানিতে পারেন। এক অদ্বিতীয় আত্মাতেই সকল পদার্থ কল্পিত হইয়া থাকে, ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রের নিশ্চয় ॥ ১২ ॥

"জীবং কল্পয়তে পূর্ব্বং ততো ভাবান্ পৃথক্ বিধান্।
বাহ্যানাধ্যাত্মিকাংশ্চৈব যথা বিদ্যস্তথা স্মৃতিঃ" ॥ ১৬ ॥

আত্মা স্বীয় মায়া দ্বারা পৃথিব্যাদি কল্পনা করণাভিপ্রায়ে প্রথমতঃ জীব কল্পনা করেন। বাহ্য (পৃথিব্যাদি) আধ্যাত্মিক (সুখ, দুঃখ, রাগাদি) পদার্থও আত্মার কল্পনা মাত্র। জীবের যেরূপ বিদ্যা ও যেরূপ স্মৃতি সেইরূপই কল্পনা হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

অজ্ঞানাৎ প্রভবৎ সর্ব্বং জ্ঞানেন প্রবিলীয়তে।
সঙ্কল্পোবিবিধঃ কর্ত্তা বিচারঃ সোহয়মীদৃশঃ ॥ ১৫ ॥

অপরোক্ষানভূতিঃ।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য তৎকৃত অপরোক্ষানুভূতি নামধেয় গ্রন্থে—কিরূপে এই জগতের উৎপত্তি হইল, চতুর্দ্দশ শ্লোকে তাহাই নিরূপণ করিতেছেন। এইনামরূপাত্মক জগৎ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়; জ্ঞান জন্মিলে জগদাদি নানারূপ বিকল্প নষ্ট হইয়া যায়। একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন। অজ্ঞানই (ব্রহ্মে) নানারূপ কল্পনা করে। অতএব, ইহাই স্থির হইল, যে, সংকল্প হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, ইহাই প্রকৃত বিচার। ১৪॥

"সত্তত্ত্বমাশ্রিতা শক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিয়াঃ।
বর্ণা-ভিত্তি-গতা ভিত্তৌ চিত্রং নানাবিধং যথা ॥" ৫৩

পঞ্চদশী। ভুতবিবেকঃ ২য় পরিচ্ছেদঃ

অগ্নির যেরূপ দাহিকা শক্তি আছে, সেইরূপ পরমাত্মার শক্তি মায়া, পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাতেই নানা প্রকার বিকার অর্থাৎ পদার্থ সকল কল্পনা করে। যেরূপ শুক্ল, নীল, পীতাদি বর্ণ সকল, ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া তাহাতে নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র সকল কল্পনা করে সেইরূপ ॥ ৫৩

দ্বৈতবাদী———"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতের্ম্মহান। মহতোহহঙ্কারঃ। অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি, উভয়মিন্দ্রিয়ং। তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি। পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ ॥ ১ অধ্যায়ঃ সূত্রঃ ৬১ ॥

মহর্ষি কপিল-প্রণীত-সাংখ্যদর্শনম্ ॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই শক্তি ত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি কহে। এই অজা প্রকৃতি হইতে অজ চেতন পুরুষের (আত্মার) সান্নিধ্যে সত্ব শক্তি অন্য অন্য দুই শক্তি অপেক্ষা বলবতী হইলেই, মহত্তত্ত্বের অর্থাৎ সমগ্র বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। পরে রজঃ গুণের বিকারে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। এই

অহঙ্কার দ্বারা মহত্তত্ব ত্রিধা বিভক্ত হইয়া সত্বাংশে মন, রাজসিকাংশে উভয় ইন্দ্রিয় এবং তামসিকাংশে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। এই তন্মাত্রের পরস্পরে সংমিশ্রণে ক্রমে পঞ্চ স্থূলভূত (ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ) উৎপন্ন হয়। সাংখ্য মতে প্রকৃতি ও পুরুষই জগতের কারণ। দিক্ দেশ কাল আকাশের ধর্ম্ম বিশেষ, অতএব, প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে। উক্তপঞ্চবিংশতি পদার্থ ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি আর পুরুষ উভয়ই অনাদি। সাংখ্যাচার্য্য প্রকৃতি পুরুষকে কখনও এক বলেন না; কারণ এইমতে প্রকৃতি পুরুষের অবিবেক নিবন্ধন সংযোগই জগদুৎপত্তির প্রতি কারণ। শক্তি আর শক্তিমান রূপে অগ্নিও দাহিকা শক্তির ন্যায় প্রকৃতি পুরুষকে এক পদার্থ বলিলে এক পদার্থের আবার সংযোগ কি? দুইটী পদার্থ না হইলে কখনও সংযোগ সম্ভবেনা। অবিবেক বুদ্ধির ধর্ম্ম প্রলয় কালে অনন্ত-বাসনারূপে প্রকৃতিতে সূক্ষ্মাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে এবং পূর্ব্ব সৃষ্টির "বাসনাই" পর-সৃষ্টিতে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের কারণ হয়।

"ন নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্যোগস্তদ্যোগাদৃতে ॥ ১৯॥"

১ম অধ্যায়ঃ

সাংখ্যের এই সূত্র পাঠে জানা যায় নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্তস্বভাব আত্মার, প্রকৃতির সংযোগ ভিন্ন সংসাররূপ দুঃখের উৎপত্তি হয় না॥

না সদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ ১১৪। ১ম অধ্যায়ঃ

সাংখ্যাচার্য্য বিশ্বমধ্যে কোন বস্তুকেই অসৎ স্বীকার করেন না। কারণ অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা বস্তুর উৎপত্তি সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। কেহই মনুষ্যের শৃঙ্গ অথবা খ-পুষ্পের উৎপত্তি দর্শন করেন নাই। অতএব বাহ্য জগৎ সকলই সত্য, কিছুই মিথ্যা নহে।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই চরাচর বিশ্ব, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতির শক্তি ত্রয়ের ব্যক্তাবস্থায় সৃষ্টি ও অব্যক্তাবস্থায় প্রলয় হয়, কিন্তু আত্মার অধিষ্ঠান ভিন্ন এই শক্তিত্রয় কোন কার্য্যই করিতে পারে না। অতএব ব্রহ্মশব্দে প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের সংযোগাবস্থাই, ইহাই শ্রুতিতে লক্ষ্যকরা হইয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রকৃতি পুরুষ সংযোগাবস্থায় বর্ত্তমান আছেন, অতএব সকলই ব্রহ্ম এই শ্রুতি বলবতী রহিল।

"দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যাম্ ॥১৮॥

দ্রষ্টাদৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ॥ ২০ ॥

পাতঞ্জলদর্শনম্। সাধনপাদঃ॥

মহর্ষি পতঞ্জলির মতেও দ্রষ্টা পুরুষ আর দৃশ্য অর্থাৎ প্রকৃতি এ উভয়ের সংযোগই সংসাররূপ-দুঃখোৎপত্তির কারণ। সত্বগুণের প্রকাশ, রজোগুণের ক্রিয়াপ্রবৃত্তি এবং তমোগুণের আবরণ অর্থাৎ অপ্রকাশ—এই তিন, সকল দৃশ্য বস্তুতেই বর্ত্তমান আছে। এই গুণত্রয় সহ সংযোগ নিবন্ধনই, পুরুষ বিশুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত হইয়াও, সুখ, দুঃখ ও মোহপ্রাপ্ত হন। পুরুষের ভোগ সম্পাদন ও মোক্ষই দৃশ্য পদার্থের প্রয়োজন॥ ১৮॥ দ্রষ্টা পুরুষ চৈতন্য মাত্র, তাঁহাতে সুখ দুঃখ, মোহ প্রভৃতি কোন ধর্ম্মই বর্ত্তমান নাই। তিনি, শুদ্ধ অর্থাৎ বিকার বিহীন হইয়াও, সান্নিধ্য বশতঃ প্রতিবিম্ব রূপে সকল বিষয় ভোগ করেন। ২০ ॥

এক্ষণে দেখা গেল বেদান্তী ভিন্ন সকল দার্শনিকগণই দ্বৈতবাদী। কোন দর্শন প্রণেতাই আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই এবং যাহা আছে তাহাও মিথ্যা এইরূপ কথা বলেন না। এইরূপ মতভেদের কারণ কি জ্ঞানার্থী সকলেরই মনে এই মহৎ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু একটুক স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলেই এইরূপ বোধ হইবে যে প্রকৃতপক্ষে কিছুই বিরোধ নাই, কারণ সমস্ত আস্তিক গ্রন্থেরই মুখ্য উদ্দেশ্য জীবকে মুক্তি পথ প্রদর্শন করান। কি দ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, যে, বিবেক উৎপত্তি দ্বারা সংসার বাসনা সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল না হইলে, জীব কিছুতেই মোক্ষ লাভ করিতে পারেন না। শ্রুতিতে আছে তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্য পন্থা বিদ্যতেহয়নায়" নকর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকেমৃতত্ব মানস্তঃ।"

কেবল তত্বজ্ঞান হইলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, তদ্ভিন্ন মোক্ষ লাভের অন্য পথ নাই; কর্ম্ম, প্রজা অথবা ধন দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না কেবল ত্যাগ অর্থাৎ বিবেক দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়"। এই বিবেক উৎপাদনের নিমিত্ত পরম দয়ালু মহর্ষিগণ ভিন্ন ভিন্ন পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। মনুষ্য এক রকম রুচি বিশিষ্ট নহে, অতএব অধিকারী ভেদে মুক্তি লাভের পথ ও ভিন্ন ভিন্ন। মুক্তি লাভের যত প্রকার পথ আবিষ্কৃত হইয়া থাকুক,

তন্মধ্যে দ্বৈতবাদীগণের দুইটী (ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ) আর অদ্বৈতবাদী-গণের—"ব্রহ্ম আর আমি এক" অর্থাৎ—"ব্রহ্ম ও জীবের" ঐক্যপ্রতি-পাদক পথ, এই ত্রিবিধ বিবেকোৎপাদক পথের কথা উল্লেখ করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য প্রয়োজন।

অদ্বৈতবাদীগণ বলেন,—এই বাহ্য জগৎ সমস্তই মায়াময় ভোজ বিদ্যার ন্যায় নিতান্ত ভ্রমাত্মক, স্বপ্ন সদৃশ মিথ্যা। তুমি, আমি, জল, বায়ু, আকাশ সমস্তই, জলের তরঙ্গের ন্যায়, সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মে মায়ার কল্পনা মাত্র। একমাত্র আত্মাই সত্য আর সমস্তই অসৎ, অতএব এই অনাত্ম সংসারকে ত্যাগ করিয়া "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অদ্বৈত দৃষ্টিতে ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিতি কর। "হে! জীব তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই আনন্দ স্বরূপ, কেবল মায়াজালে মোহিত হওয়া বিধায়, স্বপ্নের ন্যায়, জাগ্রত অবস্থাতেও স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, গৃহ প্রভৃতি অলীক বস্তুকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছ। এইভ্রম পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ব্রহ্মরূপে জান, এইরূপ করিলে শীঘ্রই মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।" কিন্তু অধিকারী না হইলে এইরূপ অদ্বৈত জ্ঞান কিছুতেই ফল প্রদান করিবে না। অতএব ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন ঃ—

"স্ববর্ণাশ্রম ধর্ম্মেণ তপসা হরি তোষণাৎ
সাধনং প্রভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদি চতুষ্টয়ং। ৩
সদৈব বাসনা ত্যাগঃ শমোহয়মিতি শব্দিতঃ।
নিগ্রহো বাহ্যবৃত্তীনাং দম-ইত্য ভিধীয়তে॥ ৬
বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্তিঃ পরমোপরতি হি সা।
সহনং সর্ব্বদুঃখানাং তিতিক্ষা সা শুভা মতা॥ ৭
ইত্যাদি—
উক্ত সাধনযুক্তেন বিচারঃ পুরুষেণ হি।
কর্ত্তব্যো জ্ঞান সিদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ শুভ মিচ্ছতা॥ ১০

অর্থাৎ স্বীয় আশ্রম বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান, তপস্যা ও ভগবদ্ভক্তি দ্বারা মনুষ্যের বৈরাগ্যাদি গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর শম (অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ) দম (বাহ্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ) উপরতি (সর্ব্ব বিষয়ে বাসনাত্যাগ) তিতিক্ষা (দুঃখ সহিষ্ণুতা) শ্রদ্ধা (বেদ ও গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাস) আর সমাধান (চিত্তৈকাগ্রতা) এই সকল গুণ যুক্ত ব্যক্তিই অদ্বৈত জ্ঞান "অর্থাৎ আমিই

ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানের অধিকারী, অন্যথা যেরূপ বিদ্যাশূন্য তর্কালঙ্কার, ম্লেচ্ছপদানত রাজ্য-শূন্য রাজা, রায় বাহাদুর ইত্যাদি উপাধি-ধারী ব্যক্তি-গণ উপহাসের যোগ্য হন, ঐ সকল কামাতুর মূর্খ "সোহং" বাদীর ও সেই দশা ঘটে।

অন্যান্য দার্শনিকগণও বিবেক উৎপত্তির জন্য দ্বিতীয় পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের মতে এই জগৎ মিথ্যা নহে। সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে, বিবেক অর্থাৎ তত্বজ্ঞান জন্মিলেই, পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গ হইতে মুক্ত হন। এই বিবেক উৎপত্তির জন্য পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। পুরুষ তত্বজ্ঞান লাভ করিলে প্রকৃতি যে নিতান্ত দুঃখ প্রদায়িনী ইহা সম্যক্‌রূপে জানিতে পারেন; এজন্য প্রকৃতিও ভ্রষ্টা স্ত্রীর ন্যায় দোষদর্শী তত্বজ্ঞানী পুরুষকে সংযোগ দ্বারা মুগ্ধ করিতে লজ্জা বোধ করিয়া, তাঁহার নিকট আর গমন করেন না।

দার্শনিকগণের মধ্যে মহর্ষি বেদব্যাস ও শাণ্ডিল্য, নারদ প্রভৃতি উপরোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগ ব্যতীত মুক্তি লাভের আর একটী পথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেইটী ভক্তিযোগ। এই মতে ভগবানকে ঐকান্তিক ভক্তির সহিত উপাসনা করিলেও জীব মুক্তি লাভে সমর্থ হয়। আজ কাল ভ্রম বশতঃ অনেকে এইরূপ মনে করেন যে ঈশ্বরকে ভক্তি করা অতি সহজ ব্যাপার। সপ্তাহের মধ্যে একদিন, অবকাশ মতে স্ত্রী ও পুরুষ একটী মনোরম সুসজ্জিত গৃহে উপবেশন করিয়া দুই একটী গান ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া—"হে পিতঃ আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোতে লইয়া যাও!। আমাদের পিতা মাতা সাকার উপাসনা দ্বারা যে ঘোরতর পাপ অর্জ্জন করিয়াছেন তুমি তাহা মাপ কর!।" ইত্যাদি ইত্যাদি রূপে, যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহা বলিলেই, মুক্তি-ফল টুপ্ করিয়া স্বর্গ হইতে হস্তে পতিত হইবে। কি ভ্রান্তি! কি বালকত্ব!! পাঠক মহোদয়গণ! ভগবান্‌কে ভক্তি করা কিরূপ কঠিন এবং ভক্ত হইতে কি কি সাধনের আবশ্যক, একবার শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখুন ঃ—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সম দুঃখ সুখঃ ক্ষমী॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ
ময্যার্পিত-মনো বুদ্ধি যোমদ্ভক্তঃ সমে প্রিয়ঃ॥ ১৪

যস্মান্নো দ্বিজতে লোকো লোকান্নো দ্বিজতেচয়ঃ
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগে মুক্তো যঃ সচ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষ উদাসীনো গত ব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যোমদ্ভক্তঃ সমে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ইত্যাদি…
ভগবদগীতা ১২ অধ্যায়ঃ।

যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর প্রতি দ্বেষ না করিয়া উত্তমের প্রতি মাৎসর্য্য রহিত ও সমানের সহিত মিত্রতা করে। যে ব্যক্তি অহঙ্কার শূন্য আর অন্যের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হয়। ১৩॥ যে ব্যক্তি লাভালাভে প্রসন্ন চিত্ত, সব্বদা অপ্রমত্ত ও সংযত স্বভাব (জিতেন্দ্রিয়) অথচ আমার বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া মন ও বুদ্ধিকে আমাতে সমর্পণ করে সেই ভক্ত আমার প্রিয় হয়। ১৪ ॥ যে ব্যক্তি হইতে কোনও প্রাণী ভীত হয় না এবং যে ব্যক্তি লোক হইতেও উদ্বিগ্ন না হয়, যে ব্যক্তি অভিষ্ট বস্তু লাভে আহ্লাদ, পরের মলিনে বিমর্ষ, ত্রাস ও মনের গ্লানি রাহত হয়। ১৫ ॥ যে ব্যক্তি অনায়াস লভ্য প্রয়োজনীয় বস্তুতেও নিস্পৃহ এবং বাহ্য ও আন্তরিক শৌচযুক্ত অথচ আলস্যে পক্ষপাত ও মনঃ পীড়া যুক্ত এবং ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলকর কর্ম্মের উদ্যম রহিত হইয়া কেবল আমাকেই ভক্তি করে সেই ভক্তই আমার প্রিয় হয় ॥ ১৬ ॥

ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তির যেরূপ সাধন ও ভক্তের যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে প্রকৃত পক্ষে "যোগী" ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই ঐরূপ ভগবদ্ভক্ত হইতে পারে না। যোগানুষ্ঠান দ্বারা যাহার চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয় নাই, ইন্দ্রিয়গণ যাহার স্বেচ্ছাচারী, সে ব্যক্তি কখনই নিষ্কাম ভক্তির অধিকারী হইতে পারে না। অতএব মোক্ষ লাভও তৎপক্ষে আকাশ কুসুম মাত্র। বস্তুতঃ নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তি দ্বারাই মোক্ষ লাভ হইতে পারে ইহাই ব্যাসাদি মহাত্মার অভিপ্রেত। তবে আমাদের ন্যায় সাংসারিক লোক নিয়তঃ অভ্যাস করিলে কথকাংশে প্রকৃত ভক্তি উদ্দীপন করিতে পারে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতেও ঐহিকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু, আশ্রম-বিহিত-কার্য্যানুষ্ঠান-পরাঙ্মুখ পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকৃত-মস্তিষ্ক, শৌচাচার-বিহীন, নবীন সভ্যগণ ভক্তি যোগকে যত সহজ মনে করেন প্রকৃত পক্ষে উহা তত অনায়াস-লভ্য নহে।

সে যাহা হউক, কি দ্বৈত কি অদ্বৈত উভয় পথানুসারেই, বিষয়

বৈরাগ্যের সহিত নির্ব্বিকল্প সমাধিবান্ না হইলে "বিবেক" লাভ করা যায় না। এই বিবেক জ্ঞান লাভ কিম্বা ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক ভগবান্ আদি পুরুষকে তন্ময় হইয়া নিষ্কাম ভক্তি সহকারে উপাসনা না করিলে জীব কোন মতেই প্রকৃতি-সংযোগরূপ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। বৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক আত্ম ধ্যান করিলে অথবা তন্ময় হইয়া ঈশ্বর উপাসনা করিলেই ক্রমে সমাধি উপস্থিত হয়। যোগী গণের যেরূপ আত্মধ্যান করিবার সময় বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়, সেইরূপ ভাব, শিখ-গুরু নানক কিম্বা "চৈতন্য দেবের" জীবন-চরিত পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, যে, ভগবান্‌কে উপাসনা করিবার সময় ইহারাও তন্ময় এবং বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া যাইতেন, ইহাই প্রকৃত ভক্তি, ইহাঁই যথার্থ ঈশ্বর উপাসনা।

সাংখ্য মতাবলম্বী ও অন্যান্য যোগীগণ এই সংসারকে বিকার যুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল, ভয়ঙ্কর ও শান্তি বিহীন, অবশীভূত, রজঃ ও তমঃ গুণে পরিপূর্ণ, দুঃখদায়ক বিবেচনা করিয়া অপত্যস্নেহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারবন্ধনকে ছিন্ন করেন; আর অদ্বৈতবাদীগণ এই সংসারকে মায়াময় স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করেন; অতএব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীগণের মূলে কিছুই বিরোধ নাই—জীবগণকে মোক্ষলাভের পন্থা প্রদর্শন করাই উভয়ের পক্ষের উদ্দেশ্য। জ্ঞান-চক্ষে বিচার করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, যে, এই উভয় মতেই মোক্ষ লাভ হইতে পারে; তবে বিষয় বৈরাগ্য-উৎপত্তির-পক্ষে উপদেশের কিছু বিভিন্নতা আছে। সে যাহা হউক, অধিকারী বিশেষেও সময়ানুসারে অদ্বৈতবাদীগণের এই মায়াবাদ অনেক ক্ষতি করিতে পারে। আর মায়াবাদের গ্রন্থ সকল অধ্যয়নে জ্ঞানার্থী মন্দাধিকারী গণের মনে যে সকল প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, ঐ সকল গ্রন্থে তাহার প্রকৃত উত্তর মন্দবুদ্ধির বুঝিবার উপযুক্ত মতে সন্নিবেশিত নাই। কয়েকটী প্রশ্ন নিম্নে প্রদত্ত হইল পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন মায়াবাদীগণের মধ্যে কজনে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন।

১ প্রশ্ন—"শ্রুতিতে লিখিত আছে, যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ তস্মাদেত ব্রহ্ম নাম রূপ মন্নঞ্চ জায়তে।" মুণ্ডকোপনিষৎ মন্ত্র ৯॥ এই শ্রুতি বাক্যের মর্ম্মানুসারে জানা গেল আত্মা সর্ব্বজ্ঞ এবং জ্ঞানময়। "সাক্ষী, চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইহাদ্বারা জানাগেল আত্মা সর্ব্বসাক্ষী,

"চৈতন্যময় এবং নির্গুণ। চৈতন্যং চিন্মাত্রং সচ্চিদেকরসোহয়মাত্মা"— এই শ্রুতিতে জানাগেল আত্মা অকর্ত্তা, চিন্ময়, সচ্চিদানন্দরূপী। অতএব অসৎ-কল্পনে নিপুণা, অজ্ঞানান্বিতা মায়া কখনই নির্ব্বিকার, জ্ঞানময় আত্মা হইতে উৎপন্ন বা অভীন্ন রূপে তাঁহার শক্তি হইতে পারে না। এইরূপ হইলে আত্মাকেও মায়ার সহিত অভিন্ন অর্থাৎ এক বিধায় অজ্ঞানময় বলা যাইতে পারে, কিন্তু আত্মা যে অজ্ঞানময় অদ্বৈতবাদী তাহা স্বীকার করেন না। মায়া আর আত্মাকে যদি বিভিন্ন বল, তবে তুমিও দ্বৈতবাদী হইলে। দ্বৈতমতে প্রকৃতি পুরুষ দুইটী পদার্থ, সংযোগ দ্বারাই উভয়কে এক বলা হয়, কিন্তু সংযোগ নষ্ট হইলেই তাঁহাদের একত্ব নষ্ট হইয়া যায়। অতএব এই মতে উপরোক্ত দোষ ঘটেনা।"

২। "বাহ্য জগৎকে অদ্বৈতবাদীগণ মিথ্যা বলিয়া অনুমাণ করেন, কারণ উহা মায়ার কল্পনা মাত্র।" তবে জিজ্ঞাস্য এই যে "আত্মা আছেন" এই কথা কে বলে! যদি বল মায়া বলে; তবে মায়ার কথা সকলই মিথ্যা অতএব, আত্মা আছেন ইহাও মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। যদি বল আত্মা বলেন, তবে আত্মা সগুণ হইলেন, অতএব সগুণ আত্মা কখনও নির্গুন হইতে পারেন না, কারণ স্বভাবের অন্যথা স্বীকার করা যুক্তি বিরুদ্ধ। নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিই "আত্মা আছেন" এইরূপ স্থির করে, কিন্তু মায়াবাদীগণের মতে মন, বুদ্ধি মায়ায় কল্পনা মাত্র, অতএব তাহাদের বিস্বাস ও সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা। যদি বল "আমি আছি" অতএবই আত্মা আছেন। আমি বলি তুমি আছ এটীও তোমার ভ্রম ও কল্পনা মাত্র। তুমিও নাই আমিও নাই কেবল মিথ্যারূপ মায়ায় কল্পনাই আছে।

৩। তত্বজ্ঞানার্থী, প্রত্যক্ষ অনুমাণ ও বেদ বাক্য দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন। তোমাদের মতে প্রত্যক্ষও মায়ার কল্পনা, অনুমাণও মায়ার কল্পনা, এমন কি মায়াবাদীগণ বেদকেও মায়ার কল্পনা বলিয়া থাকেন। কল্পিত বস্তু মাত্রই মিথ্যা, অতএব প্রত্যক্ষ অনুমাণ ও বেদ সকলই মিথ্যা। মিথ্যা যাহা তাহা মিথ্যাই থাকুক। এইরূপ মিথ্যা মোক্ষ লাভের জন্য দুষ্কর যোগানুষ্ঠান করার কিছুই প্রয়োজন নাই। শশ-শৃঙ্গের ন্যায় মিথ্যা বস্তু (মোক্ষ) পাইতে কেহই মায়াবাদীগণের বাক্যে প্রলোভিত হইবে না।'

৪। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ঘট পট, তুমি, আমি এইরূপ দ্বৈত বুদ্ধি থাকে না বলিয়া মায়াবাদীগণ যে আপন অদ্বৈতমত সমর্থণ করেন এইটী

তাঁহাদের ভ্রম মাত্র; কারণ নির্ব্বিকল্প সমাধির সময় সমাধিবান ব্যক্তির অদ্বৈত কি দ্বৈত অথবা কিরূপ জ্ঞান থাকে তিনি নিজেই তাহা জানেন না, অথচ তুমি বলিতেছ অদ্বৈত জ্ঞান থাকে। দ্বৈতবাদী মহর্ষি কপিল, পতঞ্জলি, ব্যাস প্রভৃতি দার্শনিকগণ কি ঐরূপ সমাধিবান্ ছিলেন না? তবে তাহারা দ্বৈতবাদী কেন? নির্ব্বিকল্প সমাধিতে, বুদ্ধি প্রকৃতিতে লীন হয় বিধায়, ঐ সময় আত্মা বুদ্ধির মহতীরূপে সুখ দুঃখের প্রতিবিম্ব হইতে মুক্ত হন, এ জন্যই যোগীগণ বলেন আত্মা সুষুপ্তি সমাধি ও মোক্ষের সময় সুস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ হন। বাসনা শূন্য হওয়াতে আত্মার সহিত এ তিন অবস্থাতেই প্রকৃতির সংযোগ থাকে না। অতএব সমাধিতে আত্মা ভিন্ন দ্বৈতবস্তু প্রভৃতি থাকে না এইরূপ বলা সম্পূর্ণ ভুল।"

উপরে মায়াবাদের দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক যে কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপিত করা হইয়াছে এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা সহজ নহে। কিন্তু বাস্তবিক এই সমস্ত প্রশ্নেরই সদুত্তর আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা কজনে জানেন? আমাদেয় মতে ঐরূপ মায়াবাদ অল্পজ্ঞের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর।

মনে করুন দেবার্চ্চনা, পরদার প্রভৃতি সদনং কার্য্য সকলই মিথ্যা। এই বাক্যের গূঢ় অর্থের প্রতি দৃষ্টি না করিলে, স্থূল দৃষ্টিতে নিতান্ত অনর্থ হইয়া উঠে। অতএব জ্ঞানার্থীর পক্ষে মায়াবাদ নিতান্তই পরিত্যাজ্য। বোধ হয় এই জন্যই মহাদেব মায়াবাদকে এরূপ নিন্দা করিয়াছেন; মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবচ ময়েব কথিতং দেবীজগতাং নাশ কারনাৎ"—পদ্মপুরাণম্। হে পার্ব্বতি জগতের নাশের নিমিত্ত মায়াবাদমুক্ত অসৎ শাস্ত্র ও অজ্ঞানময় বৌদ্ধশাস্ত্র আমিই বলিয়াছি।

শ্রদ্ধা ও যুক্তি।

শাস্ত্রার্থ জানিতে হইলে শ্রদ্ধা ও তৎসহকারে যুক্তির কিরূপ প্রয়োজনীয়তা আছে, আবশ্যকবোধে অদ্য উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধারই সর্ব্বদা প্রয়োজন ও তদনন্তর যুক্তির আবশ্যকতা বলিয়া প্রথমতঃ প্রধানরূপে শ্রদ্ধার ও পরে উহার আনুষঙ্গিকরূপে যুক্তির আলোচনা করা যাইতেছে।

এই শ্রদ্ধা পদার্থ কি? দেবল ঋষি বলেন, “প্রত্যয়ো ধর্ম্মকার্য্যেষু তথা শ্রদ্ধেত্যুদীরিতা”। ধর্ম্মকার্য্যে প্রত্যয়ের নাম শ্রদ্ধা, অর্থাৎ শাস্ত্রের যাবতীয় তাৎপর্য্যে দৃঢ় বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। যদিও বিশ্বাস, প্রত্যয় প্রভৃতি শব্দ দ্বারা শ্রদ্ধাশব্দের মর্ম্ম বুঝান হইতেছে, তথাপি উভয়ের পরস্পর তুলনায় প্রত্যয়াদি অনেক পরিমাণে লঘু ও শ্রদ্ধা অনেক পরিমাণে গুরু। প্রত্যয় যাহাকে তাহাকে স্পর্শ করে; শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থ, গুরুবাক্য প্রভৃতি গুরুতর পদার্থ ভিন্ন স্পর্শ করে না। প্রত্যয় অনেক অংশে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়; শ্রদ্ধা হৃদয়ের অন্তরালে গাঢ় আস্পদ লাভ করে। প্রত্যয় অনেক সময় প্রকৃত পাত্র প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং কোন ফল প্রসব করিতে পারে না। শ্রদ্ধা সততই সৎপাত্র প্রাপ্ত হয়, সুতরাং শ্রদ্ধা প্রায় বিফলা হইতে দেখা যায় না। ফলতঃ প্রত্যয় বহু উর্দ্ধে আরোহণ না করিলে, বহু গাঢ়ভাব ধারণ না করিলে শ্রদ্ধাপদবী প্রাপ্ত হয় না। শ্রদ্ধার পদ এতই উচ্চ যে উহা প্রায় ভক্তির সমকক্ষ। তবে শ্রদ্ধার যেমন দৃঢ়তা অধিক, ভক্তির তেমনি কোমলতা অধিক, ইত্যাদিরূপে বস্তুগত বাহ্য ভেদ যতই থাক্, কিন্তু গৌরব উভয়েরই প্রায় সমান।

শাস্ত্রার্থ জানিতে হইলে শ্রদ্ধার কতদূর প্রয়োজন? উক্ত দেবল ঋষিই তদ্বিষয়ে বলিয়াছেন যে “নাস্তিহ্যশ্রদ্দধানস্য ধর্ম্মকৃত্যে প্রয়োজনম্” শ্রদ্ধাশূন্য ব্যক্তির ধর্ম্মকৃত্যে কোন প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তির ধর্ম্মকার্য্য সকল কোন ফলপ্রদ হয় না। পক্ষান্তরে শ্রদ্ধার ফলজনকতা সম্বন্ধে কোন ঋষি লিখিয়াছেন, শ্রদ্ধাবিধিসমাযুক্তং কর্ম্ম যৎ ক্রিয়তে নৃভিঃ। সুবিশুদ্ধেন ভাবেন তদানন্ত্যায় কল্প্যতে। অর্থাৎ শ্রদ্ধাবিধিসহকারে সুবিশুদ্ধভাবে মনুষ্য যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা অনন্ত ফলের নিমিত্ত কল্পিত হয়। ভগবন্ মনুও অনেক স্থানে অনেকরূপে ঐ মর্ম্মের কথাই বলিয়াছেন। এমন কি, একস্থানে লিখিয়াছেন, শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। অর্থাৎ নিকৃষ্ট ব্যক্তির নিকটও যদি কোন মঙ্গলকারী বিদ্যা থাকে, বিদ্যার্থী সমুচিত শ্রদ্ধা সহকারে তাহার নিকট তাহা গ্রহণ করিবেন। বাস্তবিক, ফলানুসারে গণনা করিলে, শ্রদ্ধা অন্তঃকরণের একটী অতি হিতকরী, অতি মহতী বৃত্তি। যেমন বহু ভাগ্যবশে পতিতপাবনী গঙ্গা হিমাদ্রির গভীর কন্দর হইতে বহির্গত হইয়াছেন; তেমনি বহু পুণ্যফলে এই পতিতপাবনী শ্রদ্ধাবৃত্তি মানবের পাষাণ, কঠিন অন্তঃকরণে অতি গূঢ় স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই বৃত্তি প্রবাহিত হইতে থাকিলে মানবের পতিত ক্ষেত্র সর্ব্বথা সফল হয়। কিন্তু ইহার অভাবে মানুষের কি দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকে! ইহার অভাবে অভ্রান্ত বেদবাক্যও আমাদের নিকট মিথ্যাবৎ প্রতীয়মান হয়; গুরুপদেশ সকল আমাদের হৃদয়ের সমীপে আগত হইয়াও তাহাতে সংলগ্ন হয় না। হৃদয়, প্রাণ সেই সকল পরম উপদেশে ঐকান্তিক নির্ভর করে না। কিন্তু না করিলে প্রতি পদে ভ্রমপ্রমাদপতিত প্রাণীর আর উপায় কি আছে? আমাদের বুদ্ধিশক্তি

কতটুকু, যে, আমরা আপনার উপর নির্ভর করিয়া সকল তত্ত্ব অবগত হইতে পারিব? বিশেষতঃ পরমার্থতত্ত্ব, যাহা মনুষ্য জীবনের সারভূত, তাহা কিরূপে উপলব্ধি করা যাইবে? সে সকল কি বাহ্যদৃষ্টির গম্য? যদি অনুমাণ-প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে চাও, তাহাও তো প্রত্যক্ষোপজীবী! দেখ, গুরু তোমার দেহের বিশেষ বিশেষ স্থানে মূলাধারাদি চক্রসমূহে কুণ্ডলী শক্তি সঞ্চারণের উপদেশ দিবেন। তুমি কিরূপে ঐগুলি প্রত্যক্ষ করিবে? শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিলেওতো উহা দেখিতে পাইবে না। প্রত্যক্ষ অনুমান ব্যতিরেকে যুক্তিই বা কিরূপে অগ্রসর হইবে? তুমি বলিতে পার, যুক্তিহীন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব না। ঋষিগণই একথার অনুকূল কথা বলিয়াছেন। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন-বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে। অর্থাৎ কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া বিচার করিবে না। যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে। আমি উহা স্বীকার করি। আমিও বলি, অবিচারিতভাবে তুমি কোন শাস্ত্রকথা গ্রহণ করিও না, যুক্তি মার্জ্জিত করিয়া উহা হৃদয়ঙ্গম কর। কিন্তু উহা কিরূপ যুক্তি? ঋষিরাই তাহা নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন, আর্য্য ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ। অর্থাৎ, ঋষি সেবিত বেদবাক্যাদি ও তন্মূলক ধর্ম্মোপদেশ, যিনি, বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক দ্বারা, মীমাংসা করেন, তিনিই ধর্ম্মজ্ঞাত হইতে পারেন, অন্যের পক্ষে উহা অজ্ঞেয়। সুতরাং যুক্তিপথে চলিলেও আমাদিগকে শাস্ত্রীয় যুক্তি অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা না করিয়া, কেবল লৌকিক যুক্তির অনুসরণ করিলে, আমরা কখনই প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিব না। কেন না, তর্কের ইয়ত্তা নাই। যিনি যেমন বুদ্ধিমান্ হইবেন, তিনি তেমনই নূতন নূতন যুক্তি উদ্ভাবন দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের খণ্ডনে সমর্থ হইবেন। তাদৃশ স্থলে শাস্ত্র রক্ষিত হওয়া দূরে থাক্, অনেক সময়ে প্রতিপক্ষের লৌকিক যুক্তি বলে তাহা খণ্ডিতই হইয়া পড়িবে। যেমন, গোমাংস ভক্ষণের নিষেধ শাস্ত্রকে, যিনি, লৌকিক যুক্তিমূলক বলিয়া গোমাংস ভক্ষণের কুষ্ঠাদিরোগজনকতারূপ যুক্তির উপন্যাস করিবেন, অতি শীতপ্রধান অথচ গোবহুল দেশে তাঁহার যুক্তি কখনই অবকাশ লাভ করিতে পারিবে না। অতএব শুদ্ধ লৌকিক যুক্তির অনুসরণে কখনই সর্ব্বত্র শাস্ত্রার্থ জ্ঞাত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত ভগবান্ বেদব্যাস বেদান্তদর্শনে “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ” এই সূত্রে আপ্তবাক্যকে যুক্তিমূলক না করিয়া যুক্তিকে আপ্তবাক্যের অনুকূলে প্রয়োগ পূর্ব্বক শাস্ত্রার্থ মীমাংসা করিতে বলিয়াছেন। গীতাতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ “তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন চার্জ্জুন” এই শ্লোকে প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্নরূপ জ্ঞানলাভের বাহ্য উপায় কীর্ত্তন করিয়া, অবশেষে “শ্রদ্ধালুর্লভতে জ্ঞানং” এই বাক্যে শ্রদ্ধাকেই মুখ্য উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সকলের মূলীভূত শ্রুতিও এই নিমিত্ত “নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া” এই বাক্যে

তর্কের নিরাস পূর্ব্বক সর্ব্বথা আপ্ত বাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হইতেই উপদেশ দিয়াছেন। অন্যান্য শাস্ত্রেও দেখা যায়, যে, যাঁহারা আপ্তবাক্যবিরোধীযুক্তি পথের অনুসরণ করেন, তাঁহারা হৈতুক বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, যে, ঐ সকল বাক্য শাস্ত্রানুকূল যুক্তির নিষেধক নহে। কারণ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে শাস্ত্রীয়যুক্তিপরিমার্জ্জিত করিয়াই শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে ঋষিগণ উপদেশ দিয়াছেন। তাহাতে লৌকিক যুক্তি যতদূর প্রয়োগ পূর্ব্বক শাস্ত্রের সমর্থন করিতে পার, কর, কিন্তু যথায় লৌকিকযুক্তি লব্ধপ্রসর হইবে না, তথায় যেন শাস্ত্রের ভ্রান্তি বা ত্রুটি মনে না কর। কিম্বা যে স্থানে শাস্ত্র লঙ্ঘন করিলে তৎকালের জন্য লৌকিক ক্ষতি দৃষ্টি না হয়, শাস্ত্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক যেন তাবৎকাল সেই নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না কর। কারণ কিয়ৎকালের নিমিত্ত বা কোন দেশের নিমিত্ত তোমার পক্ষে তাহা দৃষ্ট অপকার জনক না হইলেও তদ্দ্বারা তোমার বিধি বাক্য লঙ্ঘন করা হইতেছে। যদি বল, যদি ক্ষতিকারকই না হইল, তবে, তাবৎকাল ঐ নিষেধ বিধির অবহেলনে প্রত্যবায় কি? প্রত্যবায় আছে। একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া কথাটী প্রমাণিত করি। বিবেচনা কর, কেহ উৎকোচ গ্রহণ করিবে না, এইরূপ একটী রাজকীয় বিধি আছে। বিচারপতি যথাধর্ম্ম বিচার করিয়াও যদি উক্ত রাজবিধির লঙ্ঘন পূর্ব্বক উৎকোচ গ্রহণ করেন, সে স্থলে বাদী প্রতিবাদীর কোন ক্ষতি না হইলেও ঐ নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান অপরাধ মধ্যে গণ্য হইবে কি না? বিধি লঙ্ঘন দ্বারা বিধি প্রবর্ত্তয়িতা নৃপতির অসন্তোষোৎপাদন করা হইবে কি না? যদি হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রীয় স্থলেও ঐরূপ হওয়াই সম্ভাবিত। তবে সেরূপস্থলে উহাতে জগদীশ্বরের ক্রোধোৎপত্তি অবশ্য কল্পনা করা যাইতে পারে না। কেন না, জীবগণ সর্ব্বদা যেরূপ মদমত্ত ও ভ্রমপ্রমাদপতিত, তাহাতে তাহাদিগের প্রতি সর্ব্বদাই ঈশ্বরের ক্রোধোৎপত্তির সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠে, এবং তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাঁহার সদানন্দময় স্বরূপের ব্যাঘাত হয়। অতএব শাস্ত্রীয়-বিধি ও নিষেধেরই এরূপ একটি শক্তি কল্পনা করিতে হইবে, যাহাতে ঐ বিধি ও নিষেধবোধিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পুণ্য ও পাপ জন্মিয়া থাকে। এবং তদ্দ্বারাই জীবগণ তদনুরূপ পৃথক্ পৃথক্ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ ফল ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকারই হইতে পারে। অতএব শাস্ত্রবাক্যে অগ্রে শ্রদ্ধা স্থাপন করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। পরে শাস্ত্রার্থ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রানুকূল যুক্তির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। পাছে তাহা না হইয়া শ্রদ্ধাই যুক্তির অনুগামিনী হয় এবং অনুগমন করিতে করিতে স্খলিত পদ হয়, এই আশঙ্কায় স্বয়ং বেদ ও বেদদর্শী ঋষিগণ শাস্ত্রের নানাস্থানে বিলক্ষণ সতর্ক করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল সতর্কতা সূচক বচনের উহাই তাৎপর্য্য এবং এ সম্বন্ধে আমাদের গুরূপদেশও ঐরূপ।

ক্রমশঃ

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

[illegible]

বেদব্যাস।

"১ম ভাগ | ১২৯৩ সাল। | ১২শ খণ্ড।

পাপ ও পুণ্য।

পাপ ও পুণ্য কাহাকে বলে? কতকগুলি কার্য্য কি নিত্য পাপকর ও কতকগুলি কার্য্য নিত্য পুণ্যকর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে? অর্থাৎ এমত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ব্যাপার বা কার্য্য আছে তাহা সম্পাদিত হইলেই পাপ ও এমত কতক গুলি নির্দ্দিষ্ট ব্যাপার বা কার্য্য আছে তাহা সম্পাদিত হইলেই পুণ্য হয়? ঐ নির্দ্দিষ্ট পাপকার্য্য গুলির অনুষ্ঠান সকলেরই একু কালে অকর্ত্তব্য ও ঐ নির্দ্দিষ্ট পুণ্য-কার্য্য গুলির অনুষ্ঠান সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য? তাহা যদি হইল তবে ঐ পাপ সকলের সৃষ্টি হইল কেন? কে ঐ পাপকর কার্য্য,ব্যাপার এবং তৎসাধক বৃত্তি ও উপকরণ গুলির সৃষ্টি করিল? সে গুলি ঈশ্বরের সৃষ্টি বলিয়া কদাপি বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কেন না যখন বলা হইতেছে সে গুলির অনুষ্ঠান, তাঁহার অনুমোদিত নহে, প্রত্যুত তদনুষ্ঠানকারীদিগকে তিনি যথেষ্ট দুঃখ প্রদান করেন তখন সে গুলির সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি কখনই হইতে পারেন না। কোন্ মূর্খ ব্যক্তি অনীপ্সিত পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন? যদিও কেহ ইচ্ছা করিয়া মন্দ দ্রব্য প্রস্তুত করে অথবা দৈববশতঃ হইয়া পড়ে তাহা হইলে তজ্জনক তাহার উপর বীতরাগ না হইয়া অনুরক্তই হইয়া থাকেন। সেই জন্য প্রবাদ আছে :—

সন্তান যদ্যপি হয় অসিত বরণ, জননীর কাছে সেই কষিত কাঞ্চন।

সাধারণ ব্যক্তিবর্গ যদৃচ্ছালব্ধ আপনার বস্তুকে প্রিয় জ্ঞান করেন, আর পরমেশ্বর আপনার বস্তুকে ঘৃণা করেন? ইহা কি সম্ভব? বিশেষতঃ তিনি সর্ব্বশক্তিমান,ইচ্ছা না থাকিলে কখনও তাঁহার অপ্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং বলিতে হইতেছে পাপ বলিয়া যদি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ,থাকে।

তাহা কখনও ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে; অথবা যদি তৎসমস্ত তাঁহার সৃষ্ট হয় তবে কখনও তাঁহার অনভিপ্রেত নহে।

বোধ হয় এই জন্য কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে পাপ ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে, সয়তানের সৃষ্ট। কিন্তু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাস্য, সয়তান কাহার সৃষ্ট? সয়তান যদি ঈশ্বরের সৃষ্ট হয় তবে সয়তানের সৃষ্ট পাপকেও তাঁহার সৃষ্ট বলিতে হইবে। কেন না তিনি যদি সয়তানকে পাপ সৃষ্টি করিবার উপযোগী শক্তিবিশিষ্ট না করিতেন তাহা হইলে কখনই সয়তান পাপ সৃষ্টি করিতে পারিত না। আমরা যে সন্তান উৎপাদন করি ও অন্য যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করি তাহা কি ঈশ্বরদত্ত শক্তি হইতে নহে? যে শক্তি তিনি আমাদিগকে দেন নাই সে শক্তি অনুসারে কার্য্য করিবার শক্তি কি আমাদের আছে? তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে এত দিনে পশুরা মানব হইত ও মানব দেবতা হইত; কোন ব্যক্তিই দুঃখে জরজর হইত না, সকলেই সুখের চরম সীমায় বিচরণ করিত। সুতরাং সয়তান ঈশ্বর সৃষ্ট হইলে পাপকেও তাঁহার সৃষ্ট অভিপ্রেত বলিতে হইতেছে। যদি সয়তানকে ঈশ্বর সৃষ্ট না বলা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের আর ঈশ্বরত্ব থাকে না। কেননা তাহা হইলে আর ঈশ্বর সর্ব্বস্রষ্টা নহেন, সর্ব্বশক্তিমানও নহেন। সয়তান তাঁহায় ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহার ন্যায় সয়তানও অনাদি অনন্ত, তাঁহার ন্যায় সয়তানও সৃষ্টিকর্ত্তা। অর্থাৎ ঈশ্বর যেমন ভালর সৃষ্টিকর্ত্তা, সয়তান সেইরূপ মন্দের সৃষ্টিকর্ত্তা। অধিকন্তু সয়তানকেই সমধিক শক্তিসম্পন্ন বলিতে হইবে। কেন না ঈশ্বর অপেক্ষা সয়তানাশক্ত ব্যক্তিই অধিক—পৃথিবীতে পাপাশক্ত লোকেরই সংখ্যা অধিক, ঈশ্বরানুরক্ত ধার্ম্মিক লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এমন কি বিশুদ্ধ পুণ্যপরায়ণ অর্থাৎ কেবল মাত্র ঈশ্বরসেবক ব্যক্তি নাই বলিলেই হয়। যাঁহারা পুণ্য পথ অবলম্বন করেন তাহার অধিকাংশ বা সমস্তই ঈশ্বরভয়ে ভীত হইয়াই তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। লোকে শত্রুর আশ্রিতকে যে প্রকার দুঃখ প্রদান করে, তিনি সয়তানানুগত পাপ-পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে তদপেক্ষাও অধিক দুঃখ প্রদান করেন, সয়তান সে দুঃখ হইতে মানবকে উদ্ধার করিতে পারে না, তাই অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত মানব তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়াই পাপের সুখাস্বাদন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ ও পুণ্য কার্য্য করিতে

প্রবৃত্ত হয়। পাপের ন্যায় আশু সুখকর বলিয়া প্রায় কেহই পুণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে না—পাপ আদৌ ভাল নয় নিতান্ত অরুচিকর পুণ্যই সদ্য রুচিকর এরূপ ভাবিয়া কয়জন জন্মকাল হইতে এক কালে পাপের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ পুণ্য কার্য্য করণে অনুরক্ত হয়? বোধ হয় এক জনও নয়; অথবা শুকদেব প্রভৃতির ন্যায় ২।১ জন মাত্র। বস্তুতঃ দণ্ডভয় না থাকিলে কেহই পাপের রসাস্বাদন পরিত্যাগ করিত না। পুণ্যের এমত আশু মনোহারিণী শক্তি নাই যে তদ্দ্বারা মানবকে আকৃষ্ট করিতে পারে। তবে আর ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কৈ? কি প্রকারে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান ও বিশ্বের হিতকারক বলিব? সুতরাং বলিতে হইতেছে এ মত নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। বাস্তবিক কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই এ মতের আদর করেন না; এই জন্য এসম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিস্ফল। কিন্তু তাহা হইলে বলিতে হইতেছে পুণ্যকর কার্য্য গুলির ন্যায় পাপকর কার্য্য গুলিও ঈশ্বরের সৃষ্ট। কিন্তু কেন তিনি ঐ পাপকর কার্য্য গুলির সৃষ্টি করিলেন?

কেহ কেহ বলেন পাপ ঈশ্বরেরও সৃষ্ট নহে সয়তান বা অন্য কাহারও সৃষ্ট নহে। উহা আদৌ সৃষ্ট বস্তু নহে। যেমন হিম ও অন্ধকার কোন পদার্থ নহে, তাপের অভাবই হিম, ও আলোকের অভাবই অন্ধকার সেইরূপ পুণ্যের অভাবই পাপ; উহা কোন পদার্থ নহে সুতরাং ঈশ্বর বা কাহারও সৃষ্ট নহে। ঈশ্বর বলিয়াছেন, সত্য বলিবে, দয়া করিবে ইত্যাদি, মানব তাহা করিল না, না করিলেই তাহার অভাব হইল অর্থাৎ মিথ্যা বলা হইল নিষ্ঠুরতা করা হইল। সুতরাং পাপের জন্য ঈশ্বর দায়ী নহেন, মানবই উহার সম্পূর্ণ দায়ী। একথাও নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। কেন না তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অন্যথা যে সম্ভবে, এবং সেই অন্যথাচরণ যে ভয়ানক বিপরীত ফলপ্রদ হয় এ নিয়ম কি তাঁহার নহে? তাহা যদি হইল তবে পাপ তাঁহার সৃষ্ট নহে কি প্রকারে? বিশেষতঃ কোনটী সৎভাব ও কোনটী অসৎ তাহা স্থির হইবে কি প্রকারে? শান্তির অভাব ক্রোধ না ক্রোধের অভাব শান্তি? স্বার্থপরতার অভাব পরার্থপরতা না পরার্থপরতার অভাব স্বার্থপরতা? আর এক কথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি কি বাস্তবিক অসৎ পদার্থ? উহাদের কি প্রকৃত সত্তা নাই? এ যুক্তিহীন বাদের আর অধিক সমালোচনার আবশ্যক বোধ করি না।

কেহ কেহ বলেন পাপ ঈশ্বরের সৃষ্ট বটে, কিন্তু মানবকে তাহার সংশ্রব গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ঈশ্বর মানবকে স্বাধীন করিয়াছেন, মানব সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া পাপাশ্রয় করে। একথাও উপরোক্ত কথাগুলির ন্যায় নিতান্ত অযৌক্তিক। কেন না মানবের পাপাশ্রয় যদি ঈশ্বরের অনাভপ্রেত হইত, তাহা হইলে কখনই মানব পাপী হইতে পারিত না। তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার শক্তি মানব কোথায় পাইবে? যদি সে শক্তি মানবের থাকে তবে তাহাও ঈশ্বরের দেওয়া, সুতরাং সে শক্তি অনুসারে অনুষ্ঠিত কার্য্যও ঈশ্বরানুমোদিত। যদি সে শক্তি ঈশ্বর দত্ত না বল, তাহা হইলে মানবকেও এক প্রকার সয়তান বলিতে হয়। কিন্তু তাহা যে অসম্ভব তাহা প্রথমেই দেখান হইয়াছে। বিশেষতঃ দেখা যাইতেছে মানব যাহা চায় তাহা প্রায়ই পায় না। নিয়তই মানব দুঃখের বশবর্ত্তী হইয়া দৈবের দোষোদ্ঘোষণ করে। স্বাধীন ব্যক্তির কখন দৈব অত্যাচার হইতে পারে না। বাস্তবিক যদি ঈশ্বর মানবকে স্বাধীনতা দিতেন তাহা হইলে তিনি কখনও মানবের কার্য্যের ফল প্রদান করিতেন না। কেন না তাহা হইলে তাঁহার আর স্বাধীনতা দেওয়া হইল কৈ? তাহা হইলে আর মানবের যাহা ইচ্ছা করিবার অধিকার থাকিল কৈ? তাহা হইলে ত মানবকে তাঁহারই নির্দ্দেশবর্ত্তী হইতে হইল। কেহ কেহ বলেন "এই সকল অন্যায় কার্য্য, এই সকলের অনুষ্ঠানে এই দণ্ড এবং এই সকল ন্যায় কার্য্য এই সকলের অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার পাওয়া যায়, ইহা বুঝিয়া তোমরা কার্য্য কর" ঈশ্বর এইরূপ বলিয়া দিয়া মানবকে যথেচ্ছ ব্যবহারের শক্তি প্রদান করিয়াছেন; মানব জানিয়া শুনিয়াও অন্যায় কার্য্য করিয়া দুঃখ পায়, সে দোষ তাহারই। আমরা একথার কোন মূল দেখিতে পাই না। সুতরাং, ইহা লইয়া কোনরূপ আলোচনা করিতেও প্রবৃত্তি জন্মে না। বেদাদি যাবতীয় হিন্দু শাস্ত্রে এ ভ্রান্ত মতের পোষক কোন কথাই পাওয়া না। তবে যদি স্বতন্ত্র কোন ঈশ্বরপ্রণীত গ্রন্থ থাকে, তাহা কোন্ ব্যক্তিইবা চিনাইয়া দিবে কাহার কথাইবা বিশ্বাস করিব? স্বাধীনতাবাদিরা বলেন প্রত্যেক মানবের অন্তঃকরণে অন্তঃসংজ্ঞা (Conscience) নামক ঈশ্বরপ্রেরিত শক্তি অধিষ্ঠিত থাকিয়া মানবকে নিয়ত সৎপথে চালনা করে। আমরা কিন্তু অন্তঃসংজ্ঞার সত্তা আদৌ বুঝিতে পারি না। (মানবতত্ত্বে এ

বিষয়ের অনেক আলোচনা করা হইয়াছে এই জন্য তাহার পুনরুল্লেখ না করিয়া পাঠকগণকে তৎপাঠে অনুরোধ করি।) অথবা সকলের অন্তঃসংজ্ঞা সমান নহে, ও সকলের একরকম বয়সে তাহার প্রাদুর্ভাব হয় না, শিক্ষার প্রকৃতি অনুসারেও আবার তাহার মত ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়। সুতরাং সকলের অন্তঃসংজ্ঞা সকলকে একরূপ বাক্য বলে না। বাস্তবিক কোন আন্তরিক স্বাভাবিক শক্তি সাহায্যে কোনটী পাপ কর্ম্ম কোনটী পুণ্য কর্ম্ম তাহা আমরা আদৌ জানিতে পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই জন্ম কাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নিয়ত মত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তবে কি প্রকারে বলিব অন্তঃসংজ্ঞা আমাদের উপদেশক স্বরূপে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছেন।

তবে কি পাপ পুণ্য আদৌ নাই? সকল কার্য্যেরই কি সমান ফল? দুষ্কর্ম্ম ও সৎকর্ম্মের কি ইতর বিশেষ নাই? অবশ্য আছে। কিন্তু তাহার প্রকৃতি ভিন্নরূপ। এমত কোন কার্য্যই নাই যাহা সকল অবস্থায় সকলের পক্ষে সর্ব্বকালে পাপ জনক এবং এমত কোন কার্য্যই নাই যাহা সকল অবস্থায় সকলের পক্ষে সর্ব্বকালে পুণ্য জনক। এরূপ অনাবশ্যক পাপ কখনও ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে পারেন না। ঈশ্বরের কোন কার্য্যই এককালে উদ্দেশ্যশূন্য, মূল্যহীন ও অকর্ম্মণ্য নহে। এরূপ সর্ব্বাবয়ব বিষ তাঁহার সৃষ্টিতে সম্ভবে না।

আমরা কেবল যুক্তির অনুসরণ বা অনুমান করিয়া এরূপ বলিতেছি না। আমরা ইহা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমরা দেখিতেছি যে কালকূট বিষ প্রাণান্তকর বলিয়া কাহারও স্পর্শযোগ্য নহে তাহাই আবার প্রাণরক্ষার একমাত্র মহৌষধ। যেখানে সকল প্রকার ঔষধই ব্যর্থ হইয়া যায় সেখানে কালকূট বিলক্ষণ উপকারী হয়। বিষ যখন অমৃত হইতেছে তখন আর কোন্ দ্রব্যকে কেবল মাত্র অপকারক বলিব? বাস্তবিক এমত কিছুই এ বিশ্বে নাই, যাহা কেবল মাত্র অপকারক বা যাহা কেবল মাত্র উপকারক। যে দ্রব্য উদ্ভিদের উপকারী তাহা জীবের অপকারী, যাহা বালকের প্রিয় তাহা বৃদ্ধের অপ্রিয়, যাহা শীতকালে সুখকর তাহা গ্রীষ্মে কষ্টকর, যাহা দরিদ্রের তৃপ্তিকর তাহা ধনীর পর্য্যাপ্ত নহে, যাহা ভারতের উপযোগী তাহা ইংলণ্ডের উপযোগী নয়, যাহা সুস্থ শরীরে পরমোপকারী তাহা পীড়ার সময় নিতান্ত অহিতকর। দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থা ভেদে একই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রকাশ করে। এক্ষণে কাহাকে অপকৃষ্ট বলিব? কোন অবস্থায় কোন কালে, কোন দেশে,

কাহার অপকারী বা উপকারী হইলে সাধারণের অপকারক বা উপকারক বলিব? আমি পলাণ্ডুর দুর্গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া দূরে পলায়ন করি, কিন্তু পলাণ্ডু ভিন্ন তোমার খাদ্যে আদৌ রুচি হয় না; ঘৃত দুগ্ধ প্রায় সকলেই ভাল বাসেন, কিন্তু এমন অনেক লোক আছে যে তাহারা উহার গন্ধও সহ্য করিতে পারে না—ঘৃত সংযুক্ত ব্যঞ্জনও অনেকে খাইতে পারে না। যে রৌদ্র বাত ধনীগণের নিতান্ত অপ্রিয় ও অস্বাস্থ্যকর কৃষকগণের তাহা নিতান্ত আবশ্যক। যে অঙ্গারাম্ল জীবদেহের নিতান্ত অনিষ্টকর তাহা না থাকিলে উদ্ভিদ বাঁচিতেই পারে না। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যাহাকে আমরা অপকারক বলি তাহাকে যদি ঈশ্বরের সৃষ্ট বা অনুমোদিত না বলি তবে ঈশ্বর সকলের রক্ষার উপায়-বিধান করেন নাই বলিতে হয়। কেন না যাহা মানবের অপকারক তাহার অভাবে যখন অন্য জীব বা উদ্ভিদের অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকে না, তখন তাহা ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নাই বলিলে, ঈশ্বর ঐ সকলের রক্ষার উপায় বিধান করেন নাই বলিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে ঈশ্বরকে সর্ব্বকর্ত্তা বলা হয় না।

পদার্থ সম্বন্ধে যেরূপ মানসিক বৃত্তি সম্বন্ধেও ঐরূপ। দয়া, ক্ষমা, মৈত্রী, শ্রদ্ধা, প্রভৃতি যে কেবল মাত্র আবশ্যক, ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতি একান্ত অনাবশ্যক, একথাও বলা যায় না। কেননা শেষোক্ত বৃত্তি গুলির এক কালীন অভাবে জীবের স্থিতিই হইতে পারে না। সিংহ, ব্যাঘ্র, ইন্দুর, উকুন, মৎকুণ, প্রভৃতি শত শত জীব কেবল অপহরণ, চৌর্য্য ও পরানিষ্ট করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কোকিল যদি প্রতারণা না করিয়া স্বীয় সাবক কাকের বাসায় না দিত তাহা হইলে কোকিলের অস্তিত্ব থাকিত না। যদি অপহরণাদির উপযোগী বৃত্তিগুলি ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নাই বা ঐ সকলের ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন তবে তিনি ঐ সকল জীবের স্থিতির কি উপায় বিধান করিয়াছেন? আর যদি ঐ সকল উপায়ে জীবনরক্ষা করা তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে হয় তবে ঐ সকল মনোবৃত্তি একান্ত পাপজনক কি প্রকারে? তাই বলিতেছি কি পাপ, কি পুণ্য, কি হিতকর, কি অহিতকর, কি ভাল, কি মন্দ, সকল পদার্থ সকল ব্যাপার, সকল বৃত্তি ঈশ্বরের সৃষ্টি। সকলই বিশ্বের কল্যাণকর। এক কালীন কু কি এক কালীন সু কিছুই এ বিশ্ব মধ্যে নাই। কু, সু আপেক্ষিক ভাব

মাত্র। যেমন জড় মাত্রই এক অর্থে অচল ও অন্য অর্থে নিয়ত সচল সেই রূপ ঐ সমস্ত এক স্থলে উপকারক ও অন্য স্থলে অপকারক। অতএব কার্য্য বিশেষ এক কালে অকর্ত্তব্য ও কার্য্য বিশেষ এক কালে কর্ত্তব্য এবং বৃত্তি বিশেষ এক কালে পরিত্যাজ্য ও বৃত্তি বিশেষ সর্ব্ব সময়ে আবশ্যক এরূপ মনে করা অন্যায়। ঐরূপে পাপ পুণ্যও স্থির হইতে পারে না

অনেকে বলিতে পারেন, উদ্ভিদ্ ও ইতর প্রাণীর জন্য ঈশ্বর পাপকর কার্য্যের সৃষ্টি করিতে পারেন কিন্তু মানবের জন্য করেন নাই। ঐ পাপগুলি উদ্ভিদ্ ও ইতর প্রাণীর কর্ত্তব্য বলিয়া মানবের কর্ত্তব্য নহে। সত্য কথা উদ্ভিদ্ ও ইতর প্রাণীর যাহা কর্ত্তব্য মানবের তাহা ধর্ম্ম নহে। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে পাশবরৃত্তিসকল মানবেও নিহিত রহিয়াছে, ও যখন দেখা যাইতেছে পাশবরৃত্তিগুলির এককালীন পরিচালন রহিত হইলে মানবেরও অস্তিত্বথাকে না, তখন সেগুলি মানবের একবারে অনুপযোগী কি প্রকারে বলিব? সেই জন্য আধুনিক পণ্ডিতেরা নিকৃষ্টবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ভেদে মানবপ্রবৃত্তি দুইভাগে সকলকে বিভক্ত করিয়াছে। যে সকল বৃত্তি পশু ও মানব উভয়েরই আছে সেইগুলি নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি ও যেগুলি কেবল মানবেরই আছে সেইগুলি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। তাঁহাদের মতে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তিগুলির আবশ্যক মত পরিচালন আবশ্যক, ঐ সকলের অযথা পরিচালন পাপ। একথা সম্পূর্ণ সত্য বটে, কিন্তু ঐ ব্যবস্থা কি কেবল নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির বেলা? উৎকৃষ্টপ্রবৃত্তিগুলির অযথা পরিচালনে কি কোন দোষ নাই? উৎকৃষ্টবৃত্তির অযথা পরিচালনে কি কোন অনিষ্ট ঘটে না? অপরিমিত দয়া, অতিশয় শ্রদ্ধা, অতিশয় বিনয় কি দোষাবহ নহে? অপাত্রে দয়া শ্রদ্ধাদি কি সমূহ অনিষ্টকর নহে? বাস্তবিক ঐ সকলের অযথা পরিচালনে যে সমূহ অনিষ্ট ও জীবস্থিতির ভয়ানক ব্যাঘাত ঘটে তাহার অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অধিক কি "সত্য বাক্য কহা উচিত" এই নীতির অযথা ব্যবহারেও সমূহ অনিষ্ট ঘটে।

মনে কর এক ব্যক্তি কোন ব্যক্তির প্রাণ হনন মানসে তাহার অনুগামী হইয়াছে। তোমার সম্মুখদিক আক্রান্ত ব্যক্তি আততায়ীর দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়াছে। ঐ আততায়ী তোমার নিকট তাহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তুমি যদি সত্য কথা কহ তাহা হইলে তাহার প্রাণ বিনাশ হয়। এরূপ সত্য কদাপি হিতকর

নহে; বরং তুমি যদি মিথ্যা কহ অর্থাৎ পলায়িত ব্যক্তি যে দিকে গিয়াছে তুমি যদি তাহার বিপরীত দিক্ তাহাকে দেখাইয়া দাও তাহা হইলে ঐ মিথ্যা কথন দ্বারা মহোপকার সাধিত হয়। তুমি হয়ত বলিবে এমত স্থলে আমি মিথ্যা না বলিয়া তাহাকে স্পষ্ট বলিব "সে কোন দিকে গিয়াছে তাহা আমি বলিব না।" কিন্তু আততায়ী যদি অতি দুৰ্দ্ধৰ্ষ হয় তাহা হইলে হয় ত সে তোমার মস্তকচ্ছেদ করিবে। অথবা তুমি যদি সমধিক বলবান্ হও তাহা হইলে হয় ত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তাহার প্রাণনাশ করিবে। অনেক সময়ে অতি সাধু ব্যক্তিও অবস্থার দোষে আততায়ী হয়, একটু চৈতন্যোদয় হইবার সময় হইলে আবার সে শান্ত মূৰ্ত্তি অবলম্বন করিতে পারে। ঐরূপ মিথ্যা কথন দ্বারা, অন্তত যদি কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সে কিঞ্চিৎ পরে আপনিই শান্ত হইতে পারে। এরূপ স্থলে মিথ্যা কথন সমূহ কল্যাণের হেতু হয়। আর এক কথা—"বলিব না" বলিলে ত সত্য বলা হইল না। বিপরীত রূপ মিথ্যা বলা হইল না বটে কিন্তু সত্যকে ত গোপন করা হইল। সুতরাং যদি সত্য না কহিলেই পাপ হয় তবে "সত্য বলিব না" বলিলেও পাপ হইবে। কিন্তু বাস্তবিক এরূপস্থলে সত্য গোপন বা মিথ্যা কথন যদি পাপ হয় তবে জানি না কোন হিতকর কার্য্যকে পুণ্য বলে। যে কার্য্যকে সাধারণে পাপ বলেন উদ্দেশ্যের উৎকৃষ্টতা বশতঃ তাহা অতি কল্যাণকর হয়। ঐরূপ উদ্দেশ্যের অপকৃষ্টতা হেতু অতি কল্যাণকর অনুষ্ঠানও পুণ্যজনক হয় না। এরূপউদাহরণ দেখান যাইতে পারে। মনে কর কোন ব্যক্তি গৃহমধ্যে নিদ্রা যাইতেছেন এমত সময়ে একটী সর্প তাহাকে দংশন করিতে উদ্যোগ করিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে একজন চোর তাহার গাত্রালঙ্কার অপহরণ মানসে তাহার নিকট গমন করিল, সর্পকে তাড়াইয়া না দিলে তাহার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না সেই জন্য সে সর্পকে তাড়াইয়া দিয়া অলঙ্কার গ্রহণ করিল। ঐ চোর কি নিদ্রিত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করার জন্য ধৰ্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছে বলিতে হইবে? অবশ্য কথনই না। বাজে উদাহরণ দ্বারা আমরা আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। মহাভারত হইতে কএকটী উদাহরণ ও নীতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে।

ক্রমশঃ—

শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। সৰ্ব্বজ্ঞ মহর্ষিগণ তাঁহাদের উপদিষ্ট বিষয় সমস্ত এতই সংক্ষিপ্ত ও গূঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পাঠকালীন উহার সমগ্র মৰ্ম্ম সহজে আয়ত্ত করা তরলমতি ব্যক্তিদিগের পক্ষে একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠে। অত্যল্প পুণ্য বা পাপকার্য্যে প্রভূত সুখ বা দুঃখ শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ শাস্ত্রের উপর অবিশ্বাস হইতে থাকে। মনে হয় যে, ঋষিদের কোনরূপ সামান্য জ্ঞানও ছিল না, অথবা তাঁহারা সমাজে অপ্রতিহত প্রভুত্ব লাভরূপ স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য, ঐরূপ কতকগুলি অযৌক্তিক বাক্যোপন্যাস করিয়াছেন। এইরূপ অনর্থক কুতর্ক জাল মনে উদয় হওয়ায় আমরা দিন দিন নাস্তিকশিরোমণি হইয়া আহার-বিহার-মাত্র-নিরত একরূপ দ্বিপদ পশুভাবে পরিণত হইতে থাকি। কিন্তু যদি শাস্ত্রের কবাট খুলিয়া শাস্ত্রনিহিত অমূল্য উজ্জ্বল জ্ঞান-কহিনুর গুলি বাহিরে আনয়ন করা যায়, তখন তাহার অলৌকিক আভা সন্দর্শন করিয়া, চিত্ত বিমোহিত ও তৎপ্রতি একাগ্র না হয়, সেই রত্ন-নিচয় চিত্ত-ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতে ব্যগ্র না হয়, জগতে এরূপ মূঢ় ব্যক্তি অতি বিরল। অতএব অধ্যাপকের অধ্যাপনা কালে, গুরুদেবের দীক্ষাবিধান কালে, পুরোহিতের ক্রিয়া কলাপ বা ব্রতাদি কথা শ্রবণ কালে, উপদেষ্টার উপদেশ দান কালে, তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য যে তাঁহারা শাস্ত্রের প্রকৃত মৰ্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া শ্রোতৃগণের হৃদয়ঙ্গম করিতে সচেষ্ট হন,—অর্থবাদভাগ বিভক্ত করিয়া বিধেয় বা নিষিদ্ধ অংশ সমস্ত সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দেন।

উপরে যে অর্থবাদ শব্দটী লিখিত হইল, উহার অর্থ কি তাহা দুই একটী উদাহরণ দিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। পূৰ্ব্ব মীমাংসাশাস্ত্রে উক্ত আছে "প্রাশস্ত্য-নিন্দান্যতর-পরং বাক্যমর্থবাদঃ" অর্থাৎ যে সমস্ত বাক্য, বিধি বা নিষেধ বাক্যের বিষয়ীভূত, অর্থের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ মাত্র দৃঢ়রূপে বুঝাইয়া দেয়, তাহার নাম অর্থবাদ। এইরূপ বাক্যের নিজের স্বতন্ত্র কোন তাৎপর্য্য থাকে না, কেবল বিধি নিষেধ বাক্যের পরিপুষ্টি করিয়াই চরিতার্থ হয়। যেমন শ্রুতিতে একস্থলে উল্লেখ আছে, "সপ্রজাপতিরাত্মনো বপামুদখিদত" অর্থাৎ যাগকালে সেই প্রজাপতি [ব্রহ্মা] আপনার বপা অর্থাৎ মেদ

[কলিজা] উৎপাটন করিয়া তাহা দ্বারা হোম করিয়াছিলেন” অনেকে শুনিয়া হয়ত আতঙ্কিত হইবেন, বলিবেন কিরূপ অসঙ্গত, ভয়ঙ্কর কথা? নিজের বষা উঠাইয়া কি কখনও হোম করা যায়, না তাহা করিতে গিয়া যজমান জীবিত থাকিয়া যাগফল লাভে সমর্থ হয়, কখনই নহে। অতএব ইহার অর্থ অন্য ভাবে বুঝিতে হইবে। বিধি বাক্যের সহিত একবাক্যতা করিয়া ইহার তাৎপর্য্যাবধারণ করিতে হইবে। সেই বিধি বাক্য যথা। “স্বর্গাকামোহশ্ব মেধেন যজেত” ইত্যাদি, অর্থাৎ স্বর্গকামনা করিয়া অশ্বমেধ যাগ করিবে। যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত অশ্বের মাংস দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। এই স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যজ্ঞীয় পশুদেহের কোন্ ভাগ উপাদেয়? তখন ঐ অর্থবাদ বাক্যের স্মরণ হয়, প্রজাপতি নিজের বুক চিরিয়া হোম করিয়াছিলেন। অতএব জীবদেহের অপরাপর ভাগ অপেক্ষা হৃন্মেদই (কলিজা) হোম কার্য্যে প্রশস্ত। সুতরাং তাহা দ্বারাই হোম করিবে। নতুবা প্রজাপতি বুকচিরিয়া হোম করিবেন কেন? এখন দেখুন প্রকৃত অর্থবাদ বাক্যের তাৎপর্য্য কিরূপ হইয়া দাঁড়াইল। উহা কেবল যজ্ঞীয় পশু হৃন্মেদের উৎকর্ষ বুঝিয়াই বিশ্রান্ত হইল, স্বাংশে কোনই তাৎপর্য্য নাই। এইরূপ “বায়ব্য শ্বেতমালভেত। এইবিধি স্থলে “বায়ুর্ব্বৈ ক্ষেপীষ্ঠাদেবতা” ইত্যাদি শত শত অর্থবাদ ভাগ পরিলক্ষিত হয়। নিষেধস্থলেও ঐরূপ। যেমন যজ্ঞের দক্ষিণাদানকালে রজত দান নিষেধ করিতে গিয়া তাহার পরিপোষকরূপে “সোহ রোদীত ইত্যাদি বিস্তৃত এক ইতিহাস লিখিত আছে; তাহার বর্ণনায় প্রকৃত বিষয়ের বিশেষ কোন ফল নাই বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

এই অর্থবাদ ভাগ শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। “দৃষ্টাজন্মকৃতং পাপং স্পৃষ্টা জন্মশতস্মচ। তাতাজন্মসহস্রঞ্চ হন্তিগঙ্গা কলৌযুগে॥” রাগঙ্গোচ্চারণাদেব বহির্গচ্ছতি পাতকং” ইত্যাদি। এইরূপ বিধিবাক্যের পরিপোষক দুই চারিটী অর্থবাদ পাঠ করিলেই অনায়াসে প্রতীতি হইবে। পক্ষান্তরে নিন্দা স্থলে “কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিঃ স্যাত” ইত্যাদি নিষেধ বাক্যের পরিপোষকও অনেক আছে। বেদ অপেক্ষা পুরাণাদিতে অর্থবাদ ভাগ অতিরিক্ত থাকিবার বিশেষ কারণ আছে। বেদ বাক্য প্রভুবাক্যের ন্যায় স্বতন্ত্র। নিজ মন্তব্য বিষয়ে উপপত্তি প্রদানে বিশেষ ব্যগ্র নহেন। অধিকারী ব্যক্তির কর্ত্তব্য, ভৃত্যের ন্যায় অবনত মস্তকে তাঁহার আদেশ পালন করেন যেমন প্রভুর আদেশ সমালোচনা না করিয়াই আদিষ্ট

বিষয়ে অর্থসিদ্ধি হইবে কি না তাহা বিচার না করিয়াই তৎপালনে তৎপর হওয়া ভৃত্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। তদ্রূপ বেদ বাক্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াই কার্য্য করিবে। অশ্বমেধ যাগকরিলে স্বর্গ হইবে কি না, কারীরী যাগ করিলে বৃষ্টি হইবে কি না এরূপ কুতর্ক না করিয়া বেদ বলিয়াছেন অতএব অবশ্য কর্ত্তব্য এইরূপ বিশ্বাসেই অনুষ্ঠান করিবে। কার্য্য কারণ ভাব জান চাই না জান, ফল লাভে তুমি কখনই বঞ্চিত হইবে না। বস্ত্রের শীত নিবারিনী শক্তি আছে, শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতা ঠিক রাখে, বাহিরের শীতল বায়বীয় কণা শরীরে প্রবেশ করিতে দেয় না, এই সকল কারণে বস্ত্র ব্যবহারে শীত বারণ হয়। এইরূপ জড়তত্ত্ব তন্নতন্ন করিয়া জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি বস্ত্র ব্যবহার করেন, আর নিতান্ত জড়মতি কম্বল মাত্র সম্বল, পথের ভিখারী এরূপ ব্যক্তি, ইহাদের উভয়েরই তুল্যভাবে বস্ত্র ব্যবহারে শীতাপনোদন হয়; কেন না, জ্ঞান বা অজ্ঞানের সহিত বস্তু শক্তির কোনও সম্বন্ধ নাই। বস্তু শক্তি পণ্ডিত মূর্খ উভয়কেই তুল্য ফল প্রদান করে। তদ্রূপ বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপে স্বর্গাদি কি ভাবে জন্মিতে পারে তাহার জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, শক্তি মহিমায় অবশ্যই সম্পাদিত হইবে। বেদ যে সর্ব্বপ্রকার ভ্রমপ্রমাদশূন্য তাহাও প্রমাণে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। অটল বিশ্বাসে বৈদিক আদেশ পালনে সচেষ্ট হও, অবশ্যই ফল পাইবে। পুরাণাদির উপদেশ ওরূপ নহে, উহা বন্ধুর উপদেশের ন্যায় যুক্তিমালায় পরিবেষ্টিত। যেমন বন্ধুলোকের কোন কথাই প্রথমতঃ শিরোধার্য্য হয় না, তাঁহার উপদেশ গুলিকে তন্নতন্ন করিয়া বিচার করিয়া ভূয়ো ভূয়ঃ উদাহরণাদি দ্বারা যখন আর খণ্ডন করিতে সামর্থ্য থাকে না, বা আপনা হইতেই ইচ্ছা হয় না, সুতরাং, তখন আপনা হইতেই সেই উপদেশ পালনে রত হওয়া যায়; তদ্রূপ নানারূপ উদাহরণ, বিচার অর্থবাদাদি পাঠ করিয়া পুরাণাদি শাস্ত্রের আদেশ সমস্ত পালন করিতে ইচ্ছা হয়। এই ভাবে উপদেশ দিতে গিয়া পরম কারুণিক ঋষিগণ এই সমস্ত গ্রন্থ অতি বিস্তৃত করিয়াছেন, অধ্যাপকগণের কর্ত্তব্য শাস্ত্রের বিষয় ও উপায় ভাগ পৃথকরূপে বুঝাইয়া দেন। অমুক কার্য্য করিও, পরাশর ঋষি আদেশ করিয়াছেন, অমুক দিন শ্রাদ্ধ করিও না, গোভিল মুনি নিষেধ করিয়াছেন, এইরূপ বিধিনিষেধ বাক্য দর্শন করিয়া পাঠকের মনে উদয় হইতে পারে, ঋষিগণও মনুষ্য ছিলেন আমরাও মনুষ্য, তবে তাঁহাদের আদেশ পালন করিয়া কি কারণ আমরা নীচ

হইতে যাইব? আমরা, ইচ্ছামত যাহা ভাল বোধ হয়, যাহাতে আনন্দ হয়, সেইরূপ আহার বিহার করিতে কেন বিরত হইব? সচরাচর এই-রূপ ভাব সমাজে আজকাল প্রায়ই দেখা যাইয়া থাকে। কিন্তু যখন শাস্ত্রের সমস্ত ভাগ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করা যায়, তখন আর মনে এ কুতর্ক উপস্থিত হয় না। এই কারণেই পুরাণাদি, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে অর্থবাদ ভাগের এত ছড়াছড়ি হইয়াছে। তরলমতি মানবগণের বোধ-সৌকা-র্য্যার্থই ওরূপ ভাবে উপদেশের অবতারণা করা হইয়াছে। সুতরাং, এমন অকপট ঋষিদের উপর অযথা দোষারোপ করিয়া নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যাহারা অতি দীর্ঘকাল পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ সমাজের অবস্থা কিরূপ হইবে প্রত্যক্ষদ্রষ্টার ন্যায় তৎসমস্ত বিষদভাবে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি জানিতেন না যে প্রতিপদ তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণের সঙ্গে অর্থনাশের কোন সম্বন্ধ নাই। আহারীয় দ্রব্যের সহিত প্রতিপদ তিথিতে কুষ্মাণ্ড উদরস্থ হইল, আর অমনি চিরকালের সঞ্চিত রাজকোষস্থ ধন রাশি ভস্মসাৎ হইয়া উড়িয়া গেল, কোন্ সচেতন ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস করিবে? ঋষিগণ নিজেই বলিতেছেন উহার অর্থ ওরূপ নহে, ওটী অর্থবাদ বাক্য। তোমাকে সর্ব্বতোভাবে গর্হিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই ওরূপ ভয় দেখান হইয়াছে। তোমার সে ভাব বুঝিতে সামর্থ্য থাকে, তুমি নিজেই নিষিদ্ধ বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। আহার্য্য দ্রব্যের সহিত শরীর ও মনের কিরূপ সম্বন্ধ, দেশভেদে কালভেদে বস্তু শক্তির তারতম্য হয় কি না, বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবে। না হয় ঐরূপ অন্ধ বিশ্বাসেই শাস্ত্রের আদেশ পালন কর, ফল এক রূপই হইবে, কেন না পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জ্ঞান বা বাহ্য জ্ঞানের সহিত বস্তু শক্তির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ঐরূপ আড়ম্বর করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে উপদেশ দিবারই বা কারণ কি? আবার প্রয়াস সহকারে, উপক্রমাদি বিচার করিয়া সে কপাট খুলিবারই প্রয়োজন কি? সহজ ভাবে স্বচ্ছভাবে উপদেশ দিলেইত চলিতে পারে। "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং।" এটী অতি গুরুতর বিষয়, এইরূপ পুণ্যফলের অলৌকিক চাকচিক্য, এবং পাপফলের (নরক ভোগের) বিষম দৃশ্যেই সমাজচক্র চলিতেছে। একটু প্রণিধান করিলেই সহজে ঐ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইবে। স্বভাবতঃই

মনের বৃত্তি সুপথ অপেক্ষা কুপথে অধিকতর রূপে ধাবিত হইতে থাকে, তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা, সৎপথে ধাবিত করা, অনেক উপদেশ শ্রবণ, দীর্ঘকাল সাধুসহবাস, নিরন্তর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং সতত প্রণিধানের আবশ্যক। যেমন লুব্ধস্বভাব শিশুসন্তানকে কুপথ্য ভোজন হইতে নানারূপ ছলনা বাক্য দ্বারা, মিথ্যা ভয় দেখাইয়া নিবৃত্ত করা হয়, তদ্রূপ কুপথ প্রবণ চিত্তকেও শাসন করিবার জন্য নানা-রূপ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া অল্পধনের ধনী হইয়া আবার এইরূপ কঠোর বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে গেলে চিত্তের উন্নতি দূরে থাকুক, সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বাগ্রে নিজের অধি-কারের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। নিজের শক্তি নাই, অথচ গুরুজনের আজ্ঞা পালন করিব না, কেবল তাঁহাদের দোষানুসন্ধানেই রত থাকিব, এভাবে পদে পদে অবনতি ভিন্ন উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। অসমর্থ ব্যক্তির তত্ত্ববিচার পক্ষে মূঢ়ের ন্যায় অন্ধ বিশ্বাসেই কার্য্য করা বরং ভাল। বিশ্বাসের উপর সংস্কার করিতে গিয়া কেবল দুইদিকেই নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই অতদূর আড়ম্বর করিয়া উপদেশের প্রণালী অবতারণা করা হইয়াছে। যদি যথার্থ অধিকারী শ্রোতা পাওয়া যায় তবে শাস্ত্রের মর্ম্ম তাঁহার নিকট খুলিয়া দিবে, নতুবা অধমাধিকারীর পক্ষে অর্থবাদ রূপেই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা উচিত।

ধর্ম্মব্যাখ্যা।

পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধরতর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রণীত ধর্ম্মব্যাখ্যা ১ম পর্ব্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক বৎসরাধিক হইতে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছিল। এখন ছয় খণ্ড একত্রে বাঁধাই হইয়া ১ম পর্ব্ব সমাপ্ত হইল। ১ম খণ্ড মূল্য ।০ আনা তৎপর প্রতি খণ্ড ।৵০ আনা করিয়া। কিন্তু সমস্ত একত্রে ১ম পর্ব্ব অতি উত্তম বাঁধাই সোণারজলে সুশোভিত, মূল্য ২৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ৵০ আনা মাত্র।

আমরা শুনিয়াছি এই গ্রন্থ এইরূপ পঞ্চাশৎ খণ্ডে অর্থাৎ ১২শ পর্ব্বে সমাপ্ত হইবে। সমাপ্ত হইলে ইহা যে বঙ্গভাষায় এক অমূল্য জিনিষ হইবে

তাহার কোন মাত্র সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের ক্ষেত্রপাল পূজা হইতে দুর্গোৎসব ও কঠোর সমাধি অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত সকল প্রকার উপাসনা, মুখ প্রক্ষালন অবধি শয়ন পর্য্যন্ত সকল প্রকার আচার, গর্ভাধান সংস্কার অবধি শ্মশান-ক্রিয়া পর্য্যন্ত সকল প্রকার সংস্কার, এবং শ্রাদ্ধ, তর্পণ, প্রায়শ্চিত্ত ও ব্রত নিয়মাদি সকল প্রকার অনুষ্ঠান, যাহা শাস্ত্রে বিহিত আছে, তৎসমস্তই অর্থাৎ পুরাণ ও তন্ত্র অবধি বেদ পর্য্যন্ত যে কোন শাস্ত্রে যাহা কিছু বিহিত আছে, তৎসমস্তই যে সম্পূর্ণসত্য, এবং দুর্ভেদ্য বিজ্ঞানভিত্তির উপর গাঁথা, সুতরাং অখণ্ডনীয়, ইহা জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণের দ্বারা দেখান, এবং বেদ অবধি যে কোন শাস্ত্র আছে তৎসমস্তেরই যে প্রত্যেক অক্ষরে অমূল্য বিজ্ঞান-রত্ন নিহিত আছে, উহার একটী অক্ষরও মিথ্যা বলিয়া খণ্ডন করা যায় না, উহা অনন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের অঙ্কুরস্বরূপ ইহাও চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেওয়া এই "ধর্ম্মব্যাখ্যার" উদ্দেশ্য।

এ পর্য্যন্ত যে ছয় খণ্ড "ধর্ম্মব্যাখ্যা" প্রকাশিত হইয়াছে, এই ছয় খণ্ডে উল্লিখিত বহুতর বিষয় অতি বিস্তারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে! প্রথম এক একটি বিষয় ধরিয়া তাহাকে, স্মৃতি, দর্শন, ও সংহিতাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা এবং নানাপ্রকার দেশীয় ও বিদেশীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং যুক্তি, তর্ক, দৃষ্টান্ত ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষাদির দ্বারা অখণ্ডিতরূপে মীমাংসিত হইয়াছে। অতএব আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, এই ধর্ম্মব্যাখ্যার ন্যায় নাস্তিকমর্দ্দন ও জ্ঞানবিজ্ঞান বর্দ্ধন গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় কখনও প্রকাশিত হয় নাই। এই জন্য বলি, যাঁহাদের হিন্দু-ধর্ম্ম, হিন্দু-আচার, হিন্দু-ব্যবহার ও হিন্দু শাস্ত্রাদির উপরে কোন প্রকার সন্দেহ বা অনাস্থা আছে, কিম্বা যাঁহাদের প্রকৃত জ্ঞান লাভের অভিলাষ আছে, যাঁহাদের হিন্দু-ধর্ম্ম, হিন্দু-আচার হিন্দু-ব্যবহার ও হিন্দু শাস্ত্রের প্রত্যেক অঙ্গে অঙ্গে, অক্ষরে অক্ষরে অতীব গুরুত্ব, অতীব গাম্ভীর্য্য এবং অমূল্য বিজ্ঞাননিধি সন্নিবেশিত দেখিয়া হিন্দুকুলের গৌরবানুভব করিতে ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের এই ধর্ম্মব্যাখ্যা গ্রন্থ পড়া এবং দেখা আবশ্যক।

আমরা নিম্নে সংক্ষেপতঃ ধর্ম্মব্যাখ্যা ১ম পর্ব্বের বিষয় কিছু উল্লেখ করিলাম। পাঠকগণ তাহাতে উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কতকটা পরিচয় পাইবেন। ১ম খণ্ডে "ধর্ম্মের প্রয়োজন" সম্বন্ধীয় বিষয় সবিস্তার বর্ণিত

হইয়াছে। যথা—ধর্ম্ম কাল্পনিক পদার্থ নহে, ধর্ম্মের লক্ষণ, অধর্ম্মের লক্ষণ, ধর্ম্মের বর্ণন, পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের গতি প্রণালী, প্রাণীর উৎপত্তি, সম্পূর্ণ মনুষ্য ভারতেই সম্ভবে, ধর্ম্মক্ষয়ে আর্য্য বংশের উচ্ছেদের সম্ভাবনা, ধর্ম্মানুষ্ঠানে শরীর নির্ব্যাধি থাকে; ধর্ম্মব্যতীত প্রকৃত সুখ হয় না, ধর্ম্মক্ষয়ে পরকালে ক্লেশ ইত্যাদি নানা গুরুতর বিষয়ের কথা প্রথমখণ্ডে মীমাংসিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়খণ্ড—ধর্ম্মসাধন (ধর্ম্মের উপাদান নির্ণয়)। এখণ্ডে নিরোধ সক্তির বিবরণ, জীবাত্মার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, ইন্দ্রিয়নিরোধাদির লক্ষণ, আত্মজ্ঞান, দেহজ্ঞান নিবৃত্তি, মানসাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি, ঐদাসীন্যবিবরণ, ধৃতির বিকাশ, ক্ষমার বিকাশ ইত্যাদি বহুতর কথা আছে।

তৃতীয়খণ্ড—ধর্ম্ম সাধন (ধর্ম্মনিমিত্তাদি নির্ণয়। এখণ্ডে বিবেকাদির বিবরণ, ধারনার লক্ষণ, ধ্যানের বিবরণ, জ্ঞানের স্বরূপনির্ণয়, সুখদুঃখের স্বরূপনির্ণয়, আহারাদিজনিত সুখদুঃখ প্রভেদের কারণ নির্দ্দেশ, অলৌকিক সুখের বিবরণ, ইত্যাদি বিবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থখণ্ড—ধর্ম্মসাধন (ধর্ম্মনিমিত্ত কারণ সমাধিবর্ণন।) বাহ্যজ্ঞানের স্বরূপনির্ণয়, সুখ দুঃখাদি বিকাশকালে এবং ঘটাদি জ্ঞানকালে আত্মার অবস্থার তারতম্য, অনুভূতি কি পদার্থ, চৈতন্যের অনুভূতি কি পদার্থ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অবস্থা ভেদ ইত্যাদি কথা আছে।

পঞ্চমখণ্ড—সমাধিপ্রকরণ (আত্মসমাধি)। এখণ্ডে সমাধির লক্ষণ, সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিবরণ, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিবরণ, সমাধির পূর্ব্বাঙ্গ, যম, নিয়ম, আসন, সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, প্রাণায়াম, সমাধির ক্রম, মুক্তির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম, ইত্যাদি গুরুতর গভীরতত্ত্ব আছে।

উপরে ধর্ম্মব্যাখ্যার ব্যাখ্যাত বিষয়ের যে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশ করিলাম, তাহাতেই আমাদের বিশ্বাস সাধারণে ধর্ম্মব্যাখ্যার ন্যায় গ্রন্থের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিবেন। বঙ্গভাষায় এরূপ উপাদেয় ও বহুমূল্য গ্রন্থে কদাপি প্রকাশিত হয় নাই। বেদব্যাসের গ্রাহকগণকে অনুরোধ করি, যে, কাহারও যদি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে এখনও কোনরূপ সন্দেহ থাকে তাঁহারা এই মাহা গ্রন্থ পর্ব্বাকারে ক্রমশঃ পাঠ করুন, সমর সন্দেহ রাশি স্বল্প সময় মধ্যেই বিদূরিত হইবে, তখন হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত গৌরব অনুভব করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবেন।

পঞ্চ গ্রাস।

পৃথিবীর মধ্যে আর্য্যজাতিই কেবল পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসক। উপাসনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া চরমে সিদ্ধিলাভ করিয়া, কেবল আর্য্য-মহাত্মারাই উপাসনার অবশ্যম্ভাবী ফল আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে উপনীত হইয়াছেন। আবশ্যক হইলে হৃদয় শতদল উৎপাটন করিয়া ভগবৎ চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতে আর কোন্ জাতি সমর্থ? ধন জন যৌবন ও রাজ্যসুখ প্রভৃতি বিষয় ভোগবিলাষ অবলীলাক্রমে ঘৃণ্য ও নিন্দিত ভাবিয়া আর কোন জাতি বিসর্জ্জন দিয়াছেন? প্রত্যাগাত্মার নিকট রিপুবর্গকে বলি-দান করিয়া মন প্রাণ আহুতি দিতে, আর কোন জাতি অগ্রসর? এইরূপ উপাসনাঙ্গের প্রত্যেক বিষয়েই আর্য্য জাতির অসাধারণ মহত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। সেই আর্য্য জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ববিষয়ে বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনে ও উপাসনায় প্রধানতম সাধক। সুতরাং, জগৎ ব্রাহ্মণের নিকট ঋণী। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে সর্ব্বতত্ত্ব ব্রাহ্মণ মুখেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাঁহারা ঐই সমস্ত সানুরাগেও অকপট ভাবে পর্য্যা-লোচনা করিয়াছেন এবং যাঁহাদের অন্তরে কৃতজ্ঞতা রসের কিঞ্চিন্মাত্র সঞ্চার আছে তাঁহাদিগকে ইহা বুঝাইতে হইবে না। যুক্তি ও প্রমাণ জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইবেন না। ব্রাহ্মণের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষিত হইলে, কত উপদেশ লাভ করা যায়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তাবধি শয়ন পর্য্যন্ত প্রত্যেক সময়ের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মমা-ত্রেই ভগবদোপাসনা, সুতরাং সদ্ভাবে পরিপূর্ণ। কর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ, কর্ম্মযোগে ব্রহ্মের আরাধনা, আর্য্যগণই করিয়া থাকেন,—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ। আজ কাল ম্লেচ্ছচর্য্যায় দেহ উৎসর্গ করিয়া বিজাতীয় সংস্কার অন্তরে পরিপোষণ করিয়া কালদোষে ভাগ্যবশে অনেক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ-ধ্রুব হইয়া পড়িয়াছেন, অনেক দ্বিজ দ্বিজবন্ধু হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের কথা বা আচারাদি এস্থলে গ্রহণীয় বা দর্শনীয় নহে। উত্তমের অধোগতি প্রার্থনীয় নহে। কিন্তু অনেক স্থলে তাহাই হইতেছে। নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করাই পুরুষ কারের কার্য্য। প্রধানত, অনুকরণ প্রিয়তাই আমাদের চির ধ্বংশের দিকে লইয়া যাইতেছে। বিচার বুদ্ধিহীন হওয়ায় আমরা যেন দিন দিন কলের পুতুল হইয়া পড়িতেছি। কোন বিষয়ই

আমরা আর পূর্ব্বের ন্যায় বিচার করিয়া কার্য্য করি না তাহাই আমাদের এই দুর্দ্দশা।

যে জাতি যত প্রাচীন, সভ্য ও বিদ্বান্ সে জাতির তত বিচার। পর্ব্বত নিবাসী বর্ব্বর জাতির দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থ সাংসারিক ব্যাপারে বিবেচনা নাই বলিলেও বলা যায়, তদপেক্ষা কিছু সভ্য ম্লেচ্ছ জাতির কোন কোন বিষয়ে বিচার পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু, ইহাই বলিয়া পাশব বল ও নৃশংস-তাদি দ্বারা পরকে স্বায়ত্ত রাখিতে পারিলেই সভ্য হয় না। জ্ঞান ও বিজ্ঞান চাই। ম্লেচ্ছাপেক্ষা যবন জাতির বিচারাদি অধিক, আবার কোন কোন বিষয়ে ম্লেচ্ছাপেক্ষাও নিকৃষ্ট। কিন্তু, সর্ব্বাপেক্ষা আর্য্যজাতির প্রতিপদেই বিচার, প্রত্যেক কার্য্য ধর্ম্মানুমোদিত! অশণে, শয়নে, স্বপনে, ভ্রমনে ও অন্যান্য যাবতীয় কার্য্যে কেবল বিচার। জ্ঞানের পরিপাকের সহিত উহার উপচয় হইয়া থাকে। খাদ্য দ্রব্য পাইলেই পশু পক্ষিগণ উদরস্থ করিয়া থাকে। বর্ব্বর ও ম্লেচ্ছাদি ইতর জাতীয় মনুষ্যগণও প্রায় তদ্রূপ। স্বীয় উদর পরিপূরণে ক্ষুন্নিবৃত্তি প্রাণী মাত্রেরই হইয়া থাকে। সেই উদর পূরণের সহিত ভক্তিভাবে কৃতজ্ঞতা রসে ঈশ্বরে আহুতি প্রদান আর্য্যগণ, বিশেষতঃ দ্বিজাতিগণই করিয়া, বিজ্ঞতা, সভ্যতা ও ধর্ম্ম প্রবণতার উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া থাকেম।

ব্রাহ্মণগণ ভোজন সময়ে পূর্ব্ব কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন করিয়া "প্রাণায় স্বাহা প্রথম গ্রাস, অপানায় স্বাহা বলিয়া দ্বিতীয় গ্রাস, ব্যানায় স্বাহা বলিয়া তৃতীয় গ্রাস, উদানায় স্বাহা বলিয়া চতুর্থ গ্রাস ও সমানায় স্বাহা" বলিয়া পঞ্চম গ্রাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ পঞ্চগ্রাস বাস্তবিক পক্ষে পঞ্চাহুতি। ভাগবতে উহা গ্রাস বলিয়া ব্যবহৃত হয় এই জন্য আমরাও গ্রাস বলিয়া লিখিলাম। আহুতি অগ্নিতেই হইয়া থাকে। উক্ত পঞ্চাহুতিও জটরাগ্নিতে অথবা জটরাগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া বৈশ্বানরে প্রদান করা হইয়া থাকে। সুতরাং, উহাও একরূপ অগ্নিহোত্র বিশেষ। কেবল ঐ আহুতি, মন্ত্র পূর্ব্বক প্রদান করিলেই যে কর্ত্তব্যশেষ হইল, এমন নহে। উহার মধ্যে এত সদ্ভাব রহিয়াছে, যে, তাহা দুই এক কথায় শেষ হয় না। বায়ু আমাদের প্রাণ, সেই প্রাণ রক্ষার জন্য সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি বিরাজিত। বায়ুই নাসিকা পথে শরীরস্থ হইয়া বৃত্তি বিশেষে ও স্থল বিশেষে প্রাণ ব্যান, অপান, সমান ও উদান এই পঞ্চ আখ্যা গ্রহণ করিয়াছে। যতদিন

পর্য্যন্ত আমার সহিত দেহের সংযোগ থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত আমি দেহী। দেহ, ভুক্ত দ্রব্যের পরিণাম ভিন্ন, আর কিছুই নহে। ভুক্তদ্রব্যের এক পরিণাম মলমুত্রাদিরূপে পরিণত হইয়া বহির্গত হইতেছে, অন্য পরিণাম রস, শোনিত মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র রূপে পরিণত হইয়া, দেহের পোষণ ও ধারণ করিতেছে, এইজন্য উহারা ধাতু শব্দবাচ্য। সুতরাং, ঐদেহ রক্ষা, ভুক্ত দ্রব্যেই হইতেছে। প্রাণ উৎক্রমণ করিলে, শত শত ভুক্ত দ্রব্যেও দেহের রক্ষা প্রভৃতি কিছুই সংসাধিত হয় না। জঠরাগ্নিতে ভুক্তদ্রব্য পরিপাচিত হয়। যাহাদ্বারা বিকৃতি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে অগ্নিতাপ বা তেজ যাহা ইচ্ছা হয় বল, কিন্তু ফলকথা, অগ্নিভিন্ন আর কিছুই নহে। তাপ যখন ঘন হয়, তখনই লৌকিক অগ্নিরূপে প্রজ্জ্বলিত হয়। বিকীর্ণ থাকিতে অগ্নি না বলিয়া তেজ বা তাপ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। উক্ত পঞ্চাহুতিতে, প্রাণাদির উল্লেখে, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ও পরব্রহ্মের উপাসনা এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি (ভোজনের ফল) প্রসিদ্ধই রহিয়াছে, এখন উহাই লিখিত হইতেছে। যদিও একমাত্র বায়ুই প্রাণ অপনাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তথাপি স্থল বিশেষে কার্য্য বিশেষে তাহা ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং ভিন্ন আখ্যা। একব্যক্তির হাতে শাসন, করদান ও বিচার ভার অর্পিত হইলে, যখন তিনি শাসন করেন তখন তিনি শাস্তা, করগ্রহণ কার্য্য কালে কর গ্রাহী, ও বিচার কালে প্রাড়বিবাক। একই ব্যক্তি সময়ে সময়ে শাস্তা, কর গ্রাহী ও প্রাড়বিবাক। ইহাই জগতের নিয়ম। যে কর প্রদান করিবে, সে কখনও শাস্তা বা প্রাড়বিবাকের নিকট গমন করিবে না, অথবা বিচারপ্রার্থী শাস্তা বা করগ্রাহীর নিকট গমন করিবে না। যেখানে যার যে প্রয়োজন তথায় সে গমন করিবে। তেমন একই বায়ু, প্রাণ ব্যানাদি নাম কার্য্যতঃ পরিগ্রহ করিয়াছে।

আমরা খাদ্যাভাবে যত সময় জীবিত থাকিতে পারি, জলভিন্ন তদপেক্ষা ন্যূন সময় জীবিত থাকি, আবার বায়ু ব্যতীত অতি অল্প সময়ও জীবন রাখা দুর্ঘট হইয়া উঠে। এখন দেখা যাইতেছে, বায়ু জল ও খাদ্য ইহারা দেহধারণের প্রধান উপায়। সূর্য্য ভিন্ন জগৎ অণুমাত্রও তিষ্ঠিতে পারেনা। মন, প্রাণ, বায়ু, পৃথিবী প্রভৃতি যাহাই বলনা কেন এক সূর্য্যের অভাবে প্রকা গুড় পিণ্ডে পরিণত হইত। পৃথিবী আমা-

দের অধিষ্ঠান। শস্যাদি আমাদের দেহের অবলম্বন। সূর্য্য রসাদান করিয়া মেঘ জন্মাইতেছেন, মেঘ হইতে বৃষ্টি হইতেছে, বৃষ্টি দ্বারা ধরা সুশীতল হয়, এবং শস্যাদি উৎপাদিত হইয়া থাকে। শস্যোৎপাদনে চন্দ্রও এক সহায়; প্রখর রবিকিরণে যেমন উত্তপ্ত হইতেছে, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণে তাহা শীতল হইয়া অঙ্কুরোৎপাদনোন্মুখ করিতেছে, কেবলমাত্র তাপে তাহা একবারে দগ্ধ হইয়া যাইত। এই সমস্ত ভাবগুলি পঞ্চাহুতির তাৎপর্য্যে পরিলক্ষিত হয়। যেদিগে নিরীক্ষণ করা যায়, সকল পদার্থই আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। এই ব্রহ্ম চক্র নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া আমাদিগকে মোহিত করিতেছে। আর্য্য ভিন্ন এইব্রহ্ম চক্রের প্রবেশ নির্গম অন্যে বুঝিবে না। যদিও কেহ ভাগ্য বশে এই চক্রব্যূহে প্রবেশ করে, কিন্তু নিগম না জানিয়া অকালে কাল কবলে পতিত হয়। পঞ্চাহুতির উপরে যে তাৎপর্য্য লিখিত হইল, তাহা আমাদের স্বকপোল কল্পিত নহে। যাহারা শ্রুতির উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ইহা নূতন নহে। ছান্দোগ্য শ্রুতির পঞ্চম প্রপাঠকেই উহা সবিস্তর রহিয়াছে। আমরা বাহুল্য ভয়ে তাহার অল্পমাত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"তদ্যদ্ভক্তং প্রথম মাগচ্ছেৎ তদ্ধোমীয়ং স যাং প্রথমাহুতিং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহতি প্রাণস্তৃপ্যতি। ১। প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি চক্ষুষি তৃপ্যত্যাদিত্যস্তৃপ্যত্যাদিত্যে তৃপ্যতি দ্যৌস্তৃপ্যতি দিবি তৃপ্যন্তাং যৎকিঞ্চ-দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎতৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি॥" ইত্যাদি পঞ্চম প্রপাঠকে।

"তদ্বোতব্যং অগ্নিহোত্র সম্পনস্য বিবক্ষিত ত্বান্নাগ্নিহোত্রাঙ্গতি কর্ত্তব্যাতি প্রাক্তিঃ। ইহ স ভোক্তা যাং প্রথমামাহূতিং জুহুত্তং কথং জুহুযাদিত্যাহ প্রাণায় স্বাহা" ইত্যাদি ভাষ্যম্॥

৫ম প্রপাঠকের ঐখণ্ডের, ঐ শ্রুতিগুলির পরিশেষে এরূপ শ্রুত আছে যে "যত্রতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি এবং ইহার পূর্ব্বে "সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে, রহিয়াছে। যিনি ঐ তাৎপর্য্যগুলি অবগত আছেন, এবং যথারীতি আহুতি প্রদান করেন তাহার সম্বন্ধেই উক্তবিধ ফলশ্রুতি রহিয়াছে,—ফলকথা ভক্তিভাবে ঈশ্বরে অর্পণ করাই উদ্দেশ্য। এই জন্য শাস্ত্রে ভূয়োভূয়, বলিয়াছে, "ভুঞ্জতে তেত্বঘং পাপানে পচন্ত্যাত্ম কারণাৎ।

ব্রহ্মে সমস্তই আহুতিদিবে, ব্রহ্মার্পণ ভিন্ন আর কাহারও আহুতি নাই। পদার্থ কেবল উপলক্ষ বা অবলম্বন মাত্র। প্রতি কর্ম্মে জগৎ ব্রহ্মময় দেখিতে হইবে তাই ভগবগগ্গীতার চতুর্থাধ্যায়ে সুললিতরূপে লিখিত আছে।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং, ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা॥

এখন দেখাযাইতেছে, যে, ভোজন সময়ে বায়ু সূর্য্য পৃথিবী ও মেঘ প্রভৃতির মহোপকারিতার কৃতজ্ঞতা রসে গলিয়া প্রাণাদির উল্লেখ পূর্ব্বক জঠরাগ্নিতে আহুতি প্রদান করার বিধি হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্মে আহুতি কিরূপ সঙ্গতি হয়। আর বৈশ্বানর বিদ্যায়ই উহা বিবৃত হইয়াছে। বৈশ্বানর অগ্নিরই নাম, তবে ব্রহ্মার্পণ হইলনা। সুতরাং, অনভিজ্ঞ বায়েচ্ছের সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইতে হইবে যে, বৈদিকগণ, অগ্নি প্রভৃতির মাহাত্ম্য দেখিয়া, অগ্নির পূজা করিতেন, তাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বর তত্ত্ব জানিতেন না। আমরা বলি ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। কোন একটী বিষয়ের বিচার করিতে হইলে পূর্ব্বাপর দেখা আবশ্যক, উহাকে বেদান্তে উপক্রম উপসংহার বলে। উক্ত কাণ্ডের উপক্রমে প্রাচীন ঋষিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন "কো ন আত্মা" "কিংব্রহ্মেতি।" ইত্যাদি, আর উপসংহারে "আত্মনং বৈশ্বানরমুপাস্তে সর্ব্বেষু লোকেষু অন্নমত্তি।" বৈশ্বানরেরই উপাসনা ও তাহাতেই আহুতি প্রদান নিশ্চয়ীকৃত হয়। শারীর সূত্রের ১ম অধ্যায়ের ২য় পাদের সপ্তমাধিকরণে ৯টীসূত্রে উহা সবিস্তর বর্ণনা ও মীমাংসা রহিয়াছে, এস্থলে তাহা লেখা ঘটিয়া উঠে না। ভাষ্যকার স্বয়ংই "কিং বৈশ্বানর শব্দেন জঠরোগ্নিরূপ দিশুতে উত ভূতাগ্নিরথ তদভিমানিনী দেবতা, অথবা শরীর আহোস্বিৎ পরমেশ্বর" ইতি, এই সমস্ত সংশয় ও সংশয়ের কারণ উল্লেখ করিয়া এবং সে সমস্ত বিচক্ষণতার সহিত নিরস্ত করিয়া উৎপন্ন করিয়াছেন। "কোন আত্মা কিং তদ্ব্রহ্ম" ইতিচাত্মব্রহ্মসঙ্গাভ্যমুপক্রমঃ ইত্যেব মন্তানি ব্রহ্মলিঙ্গানি পরমেশ্বরমেব গময়ন্তি। "তস্মাৎ পরমেশ্বর এব বৈশ্বানরঃ" অতএব প্রাণায় স্বাহা প্রভৃতি বলিয়া জঠরাগ্নিতে যে আহুতি প্রদান করা যাইতেছে তাহা প্রথমে ব্রহ্মার্পণ করিয়া ভোজন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আমরা পূর্ব্বে যে পঞ্চ প্রাণ বা পঞ্চ বায়ুর কথা লিখিলাম, তাহা কেবল অভ্রান্ত শ্রুতিবাক্যেই বিবৃত আছে তাহা নহে, উহা হইতে বৈদ্যক

শাস্ত্রেও সংগৃহীত হইয়া কোন্ বায়ুর কিরূপ কার্য্য এবং কাহার বিকারে কিরূপ আময়ের উৎপত্তি হয় তাহা সবিস্তর লিখিত আছে। কেবল তাহাই নহে রোগ সকলের ঔষধ ব্যবস্থা ও রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও সেই সকল ঔষধে রোগের প্রতীকার অহরহ হইতেছে। সুতরাং পঞ্চ বায়ুকে যাহারা কল্পনা বলিয়া ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাহারা তাহাতে নিজের মূর্খতার পরিচয় দেন মাত্র। আমরা বৈদ্যক শাস্ত্র হইতে তাহার কিয়ৎপরিমাণ লিখিয়া দিলাম।

"উদান স্তদনুপ্রাণঃ সমানোঽপান এবচ।
ব্যান শ্চৈতানি নামানি বায়োঃস্থান প্রভেদতঃ॥
কণ্ঠে হৃদি তথাধস্তাৎ কোষ্ঠে বহ্নের্ম্মলাশয়ে।
সকলেঽপি শরীরেৎসৌ ক্রমেণ পবনো বসেৎ॥"

এতদ্ভিন্ন ১০টী শ্লোকে ইহার মর্ম্ম প্রপঞ্চিত রহিয়াছে। এস্থলে তাহা লিখিয়া বিশেষ কোন ফল নাই ভাবিয়া ক্ষান্ত রহিলাম।

যাঁহার আদেশ কৌশলে শরীর যন্ত্র সতত বিচলিত হইতেছে, যন্ত্র রক্ষার উপযুক্ত দ্রব্য সম্ভার পরিগ্রহ সময়ে, সেই মায়াময় আদেষ্টাকে নিবেদন করিয়া, কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হওয়া, ভক্ত শিষ্ট সাধকের কার্য্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। সত্ত্বগুণ ভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ ঐ মহিমা বিস্মৃত হইয়া আত্মাভিমানে প্রমত্ত হয়। প্রকৃত মুখ্য আমি জ্ঞান থাকে না, কেবল অহংতত্ত্বের বিকারে সমুদয় তুচ্ছ হইয়া থাকে। তাই ঐ সমস্ত প্রকৃষ্ট আর্য্যরীতি নব্য শিক্ষিত সমাজে উপেক্ষিত হইতেছে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ভারত ভিন্ন প্রীতির এমন সুরভি-কুসুম আর কোথাও প্রস্ফুটিত হয় না; কৃতজ্ঞতার এমন সুস্বাদু ফল কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না ভক্তির এমন পবিত্রতাময়ী ভাগীরথী অন্যত্র এরূপ প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় না। ধন্য দ্বীপ জম্বুদ্বীপ! ধন্য বর্ষ ভারতবর্ষ!! বর্ত্তমান সময়ে অনেকের অন্তর কুসংস্কারে পঙ্কিলময়। অন্তর পবিত্র হইলে অনায়াসেই আমাদের কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামী।

সাধুদিগের জীবনবৃত্তান্ত লেখা বড় দুরূহ ব্যাপার। ইচ্ছা থাকিলেও এ আশা পূর্ণ হয় না। আশ্রমত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের পূর্ব্ব আশ্রম সম্বন্ধে সংবাদ লইবার কোনরূপ সুযোগ পাওয়া যায় না; কারণ, পূর্ব্ব আশ্রম গোপন রাখাই ইহাঁদের শাস্ত্রীয় বিধি। জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে হইলে কোন্ সময়ে কোন্স্থানে কিরূপ অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে অধ্যয়নাদি জীবনের অবশ্য অবলম্বনীয় ব্রতাদি পালন পূর্ব্বক আশ্রমত্যাগী সাধু আত্মোৎকর্ষলাভ করেন তাহা অবশ্য আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই ধর্ম্মপিপাসুর তৎপাঠে প্রকৃত কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে এবং সাধুদিগের আচরিত পথ অনুসরণ করিয়া সাধুজনোচিত প্রকৃতি গঠনে সমর্থ্য হওয়া যায়। কিন্তু আমরা যাঁহাদের জীবনী লিখিতে অথবা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাঁরা উভয়ে আশ্রমত্যাগী সন্ন্যাসী; সুতরাং, ইহাঁদের পূর্ব্ব জীবনের ঘটনাবলী অবগত হইবার কোনরূপ সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। আমরা মহাত্মা ভাস্করানন্দের পূর্ব্ব জীবনের প্রথমাবস্থার সাধন প্রক্রিয়া জানিবার জন্য বহুতর আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন ফলই প্রাপ্ত হই নাই। তবে, ধর্ম্মপিপাসু হইয়া, প্রকৃত অনুরাগের সহিত ঈশ্বর সাধন করিলে, মানব যে ইহজীবনেই তাহার উপাদেয় ফল উপভোগে সমর্থ্য হয়, চিত্তের সমস্ত মলীনতা ছুটিয়া যায়, পূর্ব্ব ও ইহজীবনের সংস্কাররূপ আবর্জ্জনা রাশী ধর্ম্মানুরাগ রূপ বারিধী সলিলে বিধৌত হইয়া আত্মার নির্ম্মল সৌরভ বিকাশিত হয়, তাহাই জলন্ত ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইবার জন্য অদ্য আমরা মহাত্মা ভাস্করানন্দের বর্ত্তমান অবস্থারই বিষয় কিছু আলোচনা করিব। আমাদের ভরসা, বিশ্বাসীগণ মহাত্মার প্রশান্ত আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিলেই ইহাঁর প্রকৃত মহত্ব অনুভবে সক্ষম হইবেন।

আমরা অনেক সাধু সন্ন্যাসী দর্শন করিয়াছি, কিন্তু এরূপ অহর্নিশি হাস্য আনন কাহারও দেখি নাই। যেন হৃদয় মধ্য হইতে আনন্দ সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়া আনন পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, এবং নয়ন পথে আনন্দাশ্রুরূপে পরিণত হইয়া অপাঙ্গ দেশ বহিয়া পড়িতেছে। এরূপ পবিত্র মুখচ্ছবি একবার মাত্র দর্শনেও হৃদয় পবিত্র

হইয়া যায়। শরীর শীর্ণ, কিন্তু ঐ শীর্ণতার মধ্যেও যেন কি এক অপূর্ব্ব কান্তি বিভাসিত হইতেছে, দেখিলেই বোধ হয় জরা ব্যাধি যেন এদেহে কখন স্থান পায় না। যেরূপ পদ্মাশনে উপবেশন করিয়া হস্ত দুইখানি উপর্য্যুপরি ন্যস্ত করিয়াছেন, প্রায় সর্ব্বদাই এইরূপ অবস্থাতেই বসিয়া থাকেন। উপবেশন প্রণালী অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করিলেই এইটি সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়, যেন এই স্থুল দেহটার সহিত আত্মার সম্বন্ধ একবারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু বাহ্যিক ক্রিয়া করেন, তাহা কেবল শারীর ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, আত্মার সহিত মাখামাখিভাবে নহে; সুতরাং, উহাঁদের কোনরূপ ক্রিয়া ক্রিয়াই নহে। একবার স্বচক্ষে না দেখিলে এভাব উপলব্ধি করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। তাহাই আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা একবার তীর্থভ্রমণরূপ মহানুষ্ঠানে বহির্গত হইয়া, এই মহাত্মাদের দর্শন লাভ করিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করেন।

কাশীধামের সন্নিহিত দুর্গাবাড়ির অতি সন্নিকটে আনন্দবাগ নামক উদ্যানে এই আনন্দময় মূর্ত্তি সর্ব্বদা বিরাজিত। উপবেশন অথবা

শয়নের কোনরূপ আস্তরণাদি কিছুই নাই, ভোজনাদি করিবার কোনপ্রকার তৈজস পত্রাদিও নাই, সংক্ষেপে মনুষ্যের একান্ত আবশ্যকীয় কোন সম্বলই তাঁহার নিকট দেখিতে পাইবেন না। কেবল এক খণ্ড ব্যাঘ্র চর্ম্মাসন মাত্র সম্বল। এই ব্যাঘ্রচর্ম্মখানি অবলম্বন করিয়া আনন্দবাগের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে, আপন মনে আপন ধ্যানে নিস্তব্ধভাবে, উপবেশন করিয়া থাকেন। প্রচণ্ড শীতের প্রবল নিপীড়নে অথবা প্রখর সূর্য্যের তীব্র উত্তাপে কিছুতেই কোনরূপ কষ্টানুভব করেন না। যেন কোন রূপ বাহিক ক্রিয়াই তাঁহাকে স্পর্শকরে না। তাঁহার চিত্ত যেন এ পাপময় সংসার হইতে প্রস্থান করিয়া কোন লোকাতিত স্থানে উপস্থিত হইয়াছে এবং তথাকার অনুপম আনন্দ উপভোগ করিয়া আপন আনন্দে আপনিই হাসিতেছেন। মুখে কেবল প্রেম প্রেম শব্দ। যিনিই কেন উপস্থিত হন না তিনি যেন সচেতন জীব দেখিলেই আনন্দে উৎফল্ল হইয়া উঠেন এবং জীবমাত্রকেই শক্তি উপহিত চৈতন্য জ্ঞানে প্রেম পরিবর্ত্তনে লালায়িত হন। পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলকেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন, "রে ভাই! হামারা সাত্ প্রেম করো গে" ?

একদিবস, পৌষ মাসে, অতি প্রত্যুষে প্রাতঃ সমিরণ সেবনে বহির্গত হইয়া আমরা মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম তাহা অবর্ণনীয়। সমস্ত রাত্র শিশির বিন্দু নিপতিত হইয়া বৃক্ষের পল্লবাদি সিক্ত করিয়া শ্যামল দুর্ব্বাদলোপরি নিপতিত হইয়াছে, তদুপরি সেই সামান্য ব্যাঘ্রচর্ম্মখানি সংস্থাপন করিয়া স্বামীজী শয়ন করিয়া আছেন। সর্ব্বাঙ্গে শিশির বিন্দু মুক্তমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। শরীরে কোন আচ্ছাদন বস্ত্র নাই; তথাপি সেই নিদারুন শীতেও কোনরূপই ক্লেশানুভব করিতেছেন না। যেন সেদিকে কোন লক্ষ্যই নাই। আমরা যাইবামাত্রই সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "আইয়ে, ইহাঁ বৈঠিয়ে"। কি করি, সেই দারুন শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই শিশির সিক্ত দুর্ব্বাদলোপরি উপবেশন করিলাম। বসিবামাত্র আমাদের পরিধান বস্ত্র সমস্তই ভিজিয়া গেল; শীত আরও বাড়িতে লাগিল। হৃন্মধ্যে গুর্ গুর্ করিতে লাগিল, দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত হইতে আরম্ভ হইল। আমাদের অবস্থা দেখিয়া স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন,, "কিয়া বাচ্চা, বহুত ঠাণ্ডি হায়; নাই? আচ্ছা তোম্ ই'য়ে আসনপর্ বৈঠো" এই বলিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মখানি আমাদের

উপবেশনার্থ দিয়া, আপনি সেই উলঙ্গদেহ ভূতলে স্থাপন করিলেন। কোন্ লজ্জায় আর সে আসন গ্রহণ করিব! অপ্রতিভ হইয়া আমরা কোন প্রকারে আপনাকে প্রকৃতস্থ করিয়া স্বামীজীর কথাবার্ত্তায় মনোনিবেশ করিলাম। আমাদের কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় মহারাজা কাশীনরেশ (কাশীররাজা) ও বেতিয়াধিপ উভয়ে বহু পারিষদে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বামীর দর্শন লালসায় উপস্থিত হইলেন। স্বামী তাঁহাদের দেখিবামাত্র উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন "হে কাশীনরেশ! তোম্ পহিলে ইয়ে বাঙ্গালী বাবুকে সাত্ প্রেম্ কিয়ে, ওস্‌কে বাদ্ হাম্‌সে বাত্ করনা। নাহিত হাম্ তোম্ লোগোঁসে কুচ্ নাহি কহেঙ্গে।" মহারাজাদ্বয় স্বামীজীর আজ্ঞা শুনিয়া কি করিবেন ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন। দেখিয়া বোধ হইল যেন তাঁহারা আমাদের ন্যায় দরিদ্র বাঙ্গালীর সহিত পরিচয় করিতে কুণ্ঠিত। কিন্তু স্বামীর আজ্ঞা, কি করেন, অবশেষে দুই চারি কথার দ্বারা আমাদের কথঞ্চিৎ আপ্যায়িত করিলেন। এইরূপে সে দিনকার ব্যাপার শেষ হইল। কিন্তু সেই দিবসাবধি আমরা সর্ব্বদাই স্বামীর নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ মানসে গমনাগমন করিতে লাগিলাম। মনে বড়ই ভরসা, এরূপ মহাপুরুষের নিকট যদি কিছু উপদেশ লাভ করিতে পারি ইহ জীবন সার্থ্যক জ্ঞান করিব। প্রত্যহই মন মধ্যে নানারূপ প্রশ্ন সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম এবং প্রহরাধিক সময় অতিবাহিত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতাম, কিন্তু কোন প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হইত না। স্বামীজী এমনিই ভাবে কথোপকথন আরম্ভ করিতেন যে তাহার মধ্যে কোন ধর্ম্ম কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাওয়া যাইত না। উপদেশ চাহিলে, তিনি কিরূপ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, কিরূপ যত্নের সহিত অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, কেমন ভাবে আত্মীয় স্বজনেরসহিত ব্যবহার করিতে হয়, এই সমস্ত সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে কেবল উপদেশ দিতেন। কোন ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিলে পাকে চক্রে অন্য কথায় আনিয়া ফেলিতেন। এইরূপ কোন প্রকারেই আশা মিটিল না। অবশেষে একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে রোদন করিতে দেখিয়া, 'স্বামীজী আমার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "বাচ্চা, কিয়া হুয়া? রোতেহো কেঁায়" আমি বলিলাম "অদ্য যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার উত্তর না পাইলে কিছুতেই এস্থান পরিত্যাগ করিব না, আমি অনাহারে সমস্ত দিবস বসিয়া থাকিব,

আর কাঁদিব। স্বামী আমার কথা শুনিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তোম পাগ্‌লা হো, তোম্‌কো কিয়া বাতাওয়েঙ্গে? সন্ন্যাসী হোকর সংসারীকো গার্হস্থ্যাশ্রম ছোড়্‌কর আউর্ কোই দোস্‌রা উপদেশ দেনা না চাহিয়ে। যব তোম্ অধিকারী হোগা আপিসে উপদেশ মিল্‌জাগা। তোমকো কুছ্ আয়াস পানে নাহি হোগা। কেবল অধিকারী বন্ যাও। য়্যা সে তোম্ হাজারহঁ কহেনেভি কুছ্ নাই বোলেঙ্গে"। ক্রমশঃ

সন্ধিপূজা।

জগদম্বা ও ভোলা পাগ্‌লা।

এবার অষ্টমী তিথি ষাট দণ্ড ছিল, সুতরাং পরদিনেও ৪ দণ্ড পর্য্যন্ত অষ্টমী। অতএব সন্ধিপূজা পৃথক্ দিনে হইল; পৃথিবীর সৌভাগ্যে এবার চারিদিনই জগদম্বার সন্দর্শন ঘটিল। আজ পূজার তিনদিন, আর একদিনমাত্র অবশিষ্ট আছে। আজ ভোলদাসের মন বড় প্রফুল্ল নয়, কাল,বাদে পরশ্বই জগদম্বা অন্তর্হিতা হইবেন। ভোলাদাস মতৃহারা হইবেন বলিয়া, ভোলাদাসের পরিপূর্ণানন্দের উচ্ছ্বাস অস্তোন্মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ম্লান ম্লান পরিলক্ষিত হইতেছে। আজ ভোলাদাসের সরল মুখচ্ছবি যেন কিছু ক্ষীণ হইয়াছে। ভোলাদাস প্রাণ ভরিয়া মাকে দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন; মনে করিতেছেন "এবার খেদ মিটাইয়া এক বৎসরের মত মাকে দেখিয়া রাখি"। কিন্তু ভোলার মন পরিতৃপ্ত হয় না। যত অধিক আগ্রহ ও অনুরাগ সহকারে মাকে দেখেন, দর্শনেচ্ছাও ততই বলবতী হয়। মনের পিপাসা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভোলার সমস্ত তৃষ্ণা, সমস্ত বাসনা সমস্ত অনুরাগ বাহ্য বিষয় হইতে গুটাইয়া আসিয়াছে, সমস্ত অনুরাগ একত্রিত হইয়া কেবল মায়ের দিকেই প্রবাহিত হইতেছে। তাই ভোলাদাস মায়ের সন্দর্শনে তৃপ্তির অন্তলাভ করিতে পারিতেছেন না। মাতৃদর্শনের মধুরতা যেন পলে পলেই বাড়িয়া উঠিতেছে। আজ ভোলাদাস যে বাড়ী যান, অন্যদিনের ন্যায় শীঘ্র ফিরিতে পারেন না; তাই আজ জ্ঞানানন্দ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে, প্রায় আড়াই প্রহর বেলার সময়ে জ্ঞানানন্দের বাড়ীতে উপস্থিত। সরল ভক্তের ভক্তিমাখা পূজায় বড় আড়ম্বর থাকে না, সুতরাং সর্ব্বদা

লোক জনেরও সমাগম থাকে না; তাই আজও সেইরূপ নির্জ্জন মণ্ডপে আর কেহই নাই, কেবল ভোলাদাস। ভোলাদাস মায়ের সন্মুখে উপবিষ্ট হইয়া, অচল নয়নে কিছুকাল পর্য্যন্ত মাকে দেখিলেন; দেখিতে দেখিতে, সরল নয়নদ্বয় আদ্র হইয়া উঠিল, ক্রমে অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল, এবং নয়নদ্বয় ভাসাইয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তখন ভোলাদাসের বাহ্য জ্ঞানও নাই, অন্তর্জ্ঞানও নাই, ভোলার মন, প্রাণ, ও ইন্দ্রিয় এক হইয়া গিয়াছে, সুতরাং অন্তর্জ্ঞান আর বাহ্যজ্ঞানও এক হইয়া গিয়াছে। ভোলা অন্তরে ও বাহিরে মাকেই দেখিতেছেন, মাভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ভোলার নিকট অন্তরও নাই বাহিরও নাই, কেবল মাই ভোলার মন্ প্রাণ ও নয়ন ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। বরফ জল হইতে ভিন্ন বস্তু নহে, আবার নিতান্ত অভিন্নও নহে; বরফের আকৃতি আর জলের আকৃতি এক নহে, বরফ জলে গলিয়া জল হইয়া যায়, বরফ গলিতে গলিতে, না ভিন্ন না অভিন্ন হইয়া, জলে ভাসিতেথাকে। ভোলাদাসের ও সেইরূপ অবস্থা হইল। ভোলাদাস তখন মাহইতে ভিন্নও নহেন, একবারে অভিন্নও নহেন; ভোলাদাস ভিন্ন ও অভিন্ন ভাবে মায়ের ক্রোড়ে গলিয়া গিয়াছেন। ভোলার "আমি" এবং মায়ের, পার্থক্য বোধ নাই। আবার একবারে অপার্থক্য বোধও নাই। এই অবস্থায় থাকিয়া সাশ্রুনয়নে এই গানটী করিতে লাগিলেন—

আয়দেখি এখন আয় রসনে।
একবার মা মা বলি প্রাণপণে— ॥
আমার মন ডুবিল মায়ের ভাবে, রূপে ডুবাল দুনয়নে।
এখন তুইও আসি ডুবিয়ে দেখ্, জগদম্বার নামজপনে ॥
তোরাই তিন দল, ভোলার সম্বল, আমার বল্‌তে ত্রিভুবনে।
আয় পূজা সমাপন করি, তোদের তিনের সমাপনে ॥

এই বলিয়া মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত অনিমেষ নেত্রে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন, অনন্তর বাহ্যসজ্ঞা লাভ করিয়া, সবাস্প গদ গদ কণ্ঠে ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে জগদম্বাকে বলিলেন,———

ভোলাদাস।—মাগো! তোকে দেখিলে যে অমৃত সাগরে হাবু ডুবু খাইতে হয়, তাহা সর্ব্বদা অনুভব করিয়াও ভবাবহ সময়েধ দ্বারা অনেক সময় তোকে ভুলে যাই? কেন, তুইই কি ভুলিয়ে দিস্? তোকে সর্ব্বদা দেখিলে কি তোর কোন ক্ষতি হয়?

জগদম্বা।—বৎস! তুমি আমার কার্ত্তিক গণেশের ন্যায় প্রিয় সন্তান, কার্ত্তিক গণেশ যেরূপ আমাকে কখনই বিস্মৃত হয় না, তুমিও কখনই আমাকে বিস্মৃত হইও না, তবেই ইহাদের ন্যায় সর্ব্বদা আমার নিকট থাকিতে পাইবে। আর কল্য যে কথাটী বলিয়াছি তাহা কদাচ ভুলিও না। এই ত্রিভুবনকে আমার সংসার বলিয়া ধারণা রাখিবে, তুমি আমার সন্তান ইহাও যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। এইরূপ সংস্কার বদ্ধ মূল হইলে

ঐহিক পারত্রিক কোন প্রকার ক্লেশ বা দুঃখ হইতে পারে না। অবশেষে আমারই ক্রোড়ে বিলীন হইয়া যায়।

ভোলাদাস।— মাগো! তোকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইলে কোন দুঃখ থাকে না, কেবল তাহাই বুঝি; কিন্তু তোর সংসারে কিরূপে কি কার্য্য করিতে হয়, তদ্দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি কিরূপে হয়, তাহা বুঝিতে ভালরূপ পারি নাই।

জগদম্বা।—ক্ষণস্থায়ী পিতামাতার সংসারে যে নিয়মে কার্য্য করিতে হয়, আমার সংসার বুঝিতে পারিলেও সেই নিয়মেই সমস্ত কর্ম্ম করিতে হয়; এবং ক্ষণস্থায়ী পিতামাতার আজ্ঞানুসারে, তাঁহাদের সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিলে যেমন সন্তানের কোন রূপ দায়িত্ব বর্ত্তিতে পারে না, আমার সংসার জানিয়া, আমার আজ্ঞানুসারে আমার সংসারের কার্য্য সম্পন্ন করিলেও, কোন কার্য্যের নিমিত্ত আমার সন্তানের কোন-রূপ দায়িত্ব বর্ত্তেনা। এই নিয়মের ব্যত্যয় হইলে বিপরীত ফল ঘটে। অর্থাৎ ভাল মন্দ কর্ম্মের নিমিত্ত আমার সন্তানেরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব। ইহাও ক্ষণস্থায়ী পিতামাতার দৃষ্টান্তেই বুঝিবে।

মানব, যতদিনপর্য্যন্ত ক্ষণস্থায়ী পিতামাতার সংসারে থাকে, তাঁহাদেরই শুশ্রূষার্থে আত্মোৎসর্গ করে, তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া সকল প্রকার সাংসারিক কর্ম্ম সম্পন্ন করে, এবং পিতামাতার সংসার বলিয়াই ধারণা করে এবং আপনার কতৃত্ব বুদ্ধি কিছুমাত্র থাকে না, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ সকল কার্য্যের ভালমন্দ ফল তাহাকে সংস্পর্শ করে না; সুতরাং, তাহার নিমিত্ত কোন তিরস্কার পুরস্কারও পাইতে হয় না, ভালমন্দ বা তিরস্কার পুরস্কার যাহা কিছু তাহা পিতামাতারই হইবে। কিন্তু যে সন্তান পিতামাতার সংসারে থাকে না, পিতামাতাকে পৃথক করিয়া দিয়া আপন স্বার্থের নিমিত্ত আত্ম বিসর্জ্জন করে, আপন স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করে, এবং নিজেরই সংসার নিজেই কর্ত্তা বলিয়া ধারণা করে, সে নিজেই তাঁহার কার্য্যের ভালমন্দ ফল বা তিরস্কার পুরস্কার পাইয়া থাকে। যে মানব আপন কর্ত্তৃত্ব স্থাপন না করিয়া, এই ত্রিভুবনকে আমার সংসার বলিয়া সর্ব্বদা [কেবল মন্দ কার্য্যের সময় নহে] ধারণা করে, এবং আমারই শুশ্রূষার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়া আমার আজ্ঞা ও অভিপ্রায় পালনের উদ্দেশ্যেই সমস্ত সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করে, সেই আমার সুবুদ্ধি পুত্র, সে ঐ সকল কার্য্যের নিমিত্ত কোনরূপ পাপ পুণ্যে, তিরস্কার পুরস্কার পায় না। তাহার কোন ত্রাস, বা ভাবনা, চিন্তা কিছুই থাকে না কার্য্যের সিদ্ধি অসিদ্ধি বা লাভালাভেও কিছু মাত্র প্রহৃষ্ট বা দুঃখিত হইতে পারেনা, সে তাহার আপনার ভার আমার উপরে বিন্যস্ত করিয়া পরম শান্তি সুখে কালাতিপাত করে। এইরূপ ধারণা পরিপক্ক হইয়া ক্রমে নিজের কর্তৃত্ব বোধ একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন জীবের "আমিত্ব"ও বিনষ্ট হয়। তাহার কর্তৃত্ব যেমন আমাতে পর্য্যবসিত হয়,

তাহার আমিত্বও সেইরূপ আমাতে মিশাইয়া যায়। জীব আমি হইয়া যায় সুতরাং নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হইতে পারে।

ভোলাদাস।—মা! আমার বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নাই, তাই এক কথাই বারম্বার জিজ্ঞাসা করি, মা! তুই যাহা বলিলি তদ্দ্বারা, সংসারের কোন কার্য্যে কিরূপ চিন্তা করিতে হয় তাহা বুঝিতে পারি নাই।

জগদম্বা।— এই ত্রিভুবন আমা হইতে বিকশিত হইয়াছে, আমাদ্বারাই পরিরক্ষিত হইতেছে, আবার আমার দ্বারাই প্রতিসংহৃত হয়, এজন্য, আমিই ত্রিভুবনের, প্রসূতি, পালয়িত্রী এবং সংহার কর্ত্রী। আমি ব্যতীত আর কেহই ঐ সকল কার্য্য করিতে পারেনা। উপনিষদে, এবং বেদে আমি বারম্বার এই কথা বলিয়াছি, আমি উপনিষদে রহিয়াছি "আনন্দাদ্ধ্যের খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দংপ্রয়ন্ত্যভি সম্বিশন্তি"। ব্রহ্মা, মহাকাল, এবং বেদব্যাসাদি ঋষিগণও নানাস্থানে আমার ঐ বাক্যের অনুবাদ করিয়া[illegible] ব্রহ্মা বলেন, "ত্বয়ৈতদ্ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎসৃজ্যতেজগৎ। [মার্ক[illegible] পুরাণ] মহাকাল বলেন,— "প্রসূতে সংসারংজননী জগতীংপালয়তিচ সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয় সময়ে সংহরতিচ"।* * [তন্ত্র]। এই অসীম সংসারে সর্ব্বদা যে কোন কার্য্য হইতেছে তৎসমস্তই আমার উক্ত তিন প্রকার কার্য্যের অন্তর্গত। কতকগুলি কার্য্য আমার সৃষ্টি ক্রিয়ার অন্তর্গত, কতকগুলি কার্য্য পালন ক্রিয়ার অন্তর্গত, আর কতকগুলি সংহার ক্রিয়ার অন্তর্গত। এই তিন প্রকার ক্রিয়া ব্যতীত জগতে আর কোন ক্রিয়াই হইতেছেনা। এই যে, মনুষ্য, পশু, তির্য্যক্, কীট, পতঙ্গ, ও বৃক্ষলতাদির সর্ব্বদা উৎপত্তি হইতেছে ইহা আমারই সৃষ্টিক্রিয়া; উৎপত্তির সময় অবধি মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত যে যে উপায় দ্বারা ঐ সকল সজীবও নির্জীব পদার্থগুলি অবস্থিতি করিতেছে তাহা আমরই পালনক্রিয়া, এবং উহাদিগের যে মৃত্যু ঘটনা হইতেছে তাহাও আমারই সংহারক্রিয়া। প্রত্যেক প্রাণী বা অপ্রাণীর উৎপত্তির পূর্ব্বে যে সকল কার্য্যকারণের যে যেরূপ ঘটনাবলী হয়, তাহা ঐ সৃষ্টি ক্রিয়ারই অন্তর্গত। সৃষ্টি করার নিমিত্তই আমি ঐ সকল ঘটনা বা কার্য্যকারণ সংযোগাদি করিয়া থাকি। মৃত্যুর পূর্ব্বে মৃত্যুসাধনের নিমিত্ত যে সকল ঘটনাবলী হয়, তাহা আমার সংহারক্রিয়ার অন্তর্গত। এইরূপে সৃষ্টি, স্থিতি, এবং সংহার এই তিন প্রকার সার্ব্বভৌম ক্রিয়ার অভ্যন্তরে থাকিয়া আমিই সমস্ত কার্য্য করিয়াছি, সমস্ত কার্য্যের নিয়ম, প্রণালী এবং পৌর্ব্বপার্য্য আমারই হস্তে নিহিত। তাহা সাধনের নিমিত্ত আমিই সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছি, এবং পূর্ব্ব হইতেই তাহার সুকৌশল সংস্থাপিত করি। সৃষ্টির চেষ্টাও আমি করিতেছি, পালনের চেষ্টাও আমিই করিতেছি, সংহারের চেষ্টাও আমিই করিতেছি। জীব ভ্রান্ত হইয়া আমার ক্রিয়া তাহাদের নিজের উপরে আরোপ করে, এবং নানা-বিধ দুঃখ পাইয়া থাকে। ইহা তোমায় ক্রমে বলিতেছি। স্ত্রী ও পুরুষের

আভ্যন্তরিক এবং দৈহিক সম্মিলন না হইলে সন্তানোৎপত্তি হইতে পারে না, এজন্য আমিই স্ত্রীপুরুষের প্রণয় সাধন অনুরাগ এবং পরস্পর সংযোগের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা জন্মাইয়া থাকি। এই ক্রিয়া কেবল মনুষ্য মধ্যেই আছে তাহা নহে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এবং উদ্ভিজ্জাদি প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীর মধ্যেই আমি ঐ রূপ ক্রিয়া করিয়া থাকি। পশু প্রভৃতির যখন সন্তানোৎপত্তির সময় হয়, তখনই ঋতু হয়, এবং তখনই তাহাদের স্ত্রী পুরুষের আন্তরিক সম্মিলন এবং দৈহিক সংযোগের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকে। পরে আমার কার্য্য নিষ্পন্ন হইলেই আবার উহারা যথেচ্ছায় বিচরণ করে। কীট পতঙ্গাদির মধ্যেও এইরূপেই করিয়া থাকে। উদ্ভিজ্জের যখন ফল হইবার সময় হয়, তখন পুষ্পোদ্গম হইয়া ঋতু হয় এবং আমিই সেই পুষ্প মধ্যবর্ত্তী স্ত্রী রেণু আর পুংরেণুর সংযোগের নিমিত্ত ক্রিয়া জন্মাইয়া উভয়কে সম্মিলিত করিয়া[illegible] একই নিয়মে, মনুষ্যের মধ্যেও ঐরূপ ঘটনা করিয়া থাকি। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, মনুষ্যজাতীয় স্ত্রীপুরুষের সর্ব্বদাই আন্তরিক সম্মিলন থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়; আন্তরিক সম্মিলনের দ্বারা স্ত্রীর আত্মা আর পুরুষাত্মার ঐক্যভাব হইয়া উভয়েরই আধ্যাত্মিক শক্তি গুলি পরিপুষ্ট লাভ করে এবং একটী পূর্ণ আত্মা হইয়া যায়, এইরূপ সম্বন্ধ ব্যতীত আত্মার পূর্ণতা হইতে পারে না। এই জন্যই আমি যজুর্ব্বেদে বলিয়াছি যে "অর্দ্ধা হবা তাবদ্ভবতি যাবন্নজায়া ন্বিন্দতি, অথ জায়া বিন্দতি পূর্ণোবাবতদা ভবতী"। এজন্য মনুষ্য স্ত্রী পুরুষের আন্তরীক সম্মিলনের নিমিত্ত সব্বদাই ক্রিয়া হইয়া থাকে, যাহাকে সচরাচর অনুরাগ, বা "প্রেম" বলে। কিন্তু পশ্বাদির আত্মা নিতান্ত নীচ, নিতান্ত অসম্পন্ন, তাহার পূর্ণতা হওয়ার সম্ভাবনা নাই; এজন্য সর্ব্বদাই তাহাদের প্রেম প্রীতি, বা আনুরাগের প্রয়োজন নাই, সুতরাং যখন প্রয়োজন তখনই ঐরূপ ভাব ঘটাইয়া দিয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত পুরুষের ভোগের নিমিত্ত স্ত্রী সৃষ্টি, বা স্ত্রীর ভোগের নিমিত্ত পুরুষের সৃষ্টি কখনই করি নাই, ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। এই প্রকৃত তত্ত্বে যাহার বিশ্বাস থাকে, সেই মানব স্ত্রীকে আপনার ভোগ্য বস্তুরূপে দর্শন করিয়া, বেশ্যাবৎ ব্যবহার করেনা, এবং ঐ ভাব হইতে অন্যান্য যে সকল কুপ্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে তদ্দ্বারা ও কলুষিত হয় না, সে সর্ব্বদাই আমার সৃষ্টি তত্ত্ব স্মরণ রাখিয়া যথাকালে ভার্য্যাতে উপগত হয়, অতি পবিত্র ভাবে তাহাকে দর্শন করে ভার্য্যার বশগত ও হয় না, এবং ভার্য্যা সম্বন্ধে কোন প্রকার কুকার্য্যে ও সমাসক্ত হয় না।

ক্রমশঃ—